পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা

ড. কল্পনা হালদার

সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা - ৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৮

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলিকাতা - ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭/এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলিকাতা - ৭০০০০৬

কম্পিউটার টাইপসেটিং : মা দুর্গা লেজার
৩৭ জি. সি. ঘোষ রোড। কলিকাতা - ৭০০০৪৮

উৎসর্গ

বাবা শ্রীঅনন্ত কুমার হালদার

এবং

মা শ্রীমতী চারুবালা হালদার

শুভাশংসনম্

ড. কল্পনা ভৌমিকের 'পাণ্ডুলিপি পঠন সহায়িকা' গ্রন্থটি বাংলাভাষায় পুঁথিবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভারতের পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা এবং আসামের সর্বত্র এই গ্রন্থের সমাদর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে। মূলগ্রন্থটি সর্বত্র এবং সর্বদা সহজলভ্য না হওয়ার কারণে অনেককে এই গ্রন্থের প্রতিলিপি কিংবা প্রতিলিপির প্রতিলিপি ব্যবহার করতে দেখেছি। অনেক সময় ছাত্রদের অনুরোধে গ্রন্থটি যাতে কলকাতায় সহজলভ্য হয় তার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বর্তমানে এর পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ হতে চলেছে। আমি সাধুবাদ জানাই মাওলা ব্রাদার্স-এর কর্ণধারকে, যিনি এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন এবং অন্তর থেকে আশীর্বাদ জানাই স্নেহাস্পদ কল্পনাকে তার এই সারস্বত অবদানের জন্য।

উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠনের রীতি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বহু পূর্বেই। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্বীকৃতি থাকলেও ইংরেজির প্রতি অধিক সম্ভ্রমবোধ এবং ইংরেজি ভাষার ব্যবহারকে সামাজিক প্রতিষ্ঠার এবং মর্যাদার প্রতীকরূপে গণ্য করার মানসিকতা বাংলা ভাষায় উন্নতমানের গবেষণা-গ্রন্থ রচনার প্রতিবন্ধকতা অতীতে সৃষ্টি করেছে, বর্তমানে করছে এবং দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে ভবিষ্যতেও করবে। বিদেশী বাজারের লোভ, নিদেনপক্ষে রচিত গ্রন্থটিকে 'রিসার্চ পাবলিকেশন'-এর সংজ্ঞায় ভূষিত করার ঠুনকো অভিমান (যার জন্য মুদ্রিত গ্রন্থরত্নকে বল্মীকের প্রকৃষ্ট খাদ্যে পরিণত হতে হয় অনেক ক্ষেত্রে) বাংলা-ভাষাভাষী পাঠককুলকে বাঙালি মনীষির ফসল যথেষ্ট পরিমাণে ঘরে তুলতে দিচ্ছে না। ড. কল্পনা ভৌমিক সে পথে পা না বাড়িয়ে পুঁথিবিদ্যার মতো জটিল এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়কে বাংলা ভাষায় উপস্থাপিত করে সর্বসাধারণের মহদুপকার সাধন করেছেন। সেজন্য তিনি আপামর বাঙালি বিদ্বৎসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁর নিষ্ঠা এবং শ্রম বিফলে যায়নি। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় বর্তমানে পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগই সে সাক্ষ্য বহন করছে।

পুঁথিবিদ্যা উচ্চতর শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন শাখায় বর্তমানে অবশ্যপাঠ্য রূপে পরিগণিত। বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি প্রভৃতি বিভাগে এই বিষয়টি পাঠ্য হিসেবে বহু

পূর্বেই নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহনকারী অমূল্য পুঁথিসম্পদ আমাদের অজ্ঞতা এবং উপেক্ষার কারণে বহুকাল ধরে নষ্ট হয়েছে। জ্ঞানরাজ্যের বহু শাখার হয়তবা অবলুপ্তিও ঘটে গেছে এই কারণে। ইদানীং কিছুটা সচেতনতা এসেছে। পুঁথিসংরক্ষণের জন্য কিছু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, সরকারি দপ্তর থেকে সামান্য হলেও আর্থিক বরাদ্দ অনুমোদিত হচ্ছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে পুঁথি সংগ্রহ করে তার প্রতিচিত্র গ্রহণ করে কালগহ্বর থেকে রক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু রক্ষা করাই শেষ কথা নয়। ঐ সব পুঁথির পাঠোদ্ধার করে তা লিপিবদ্ধ করা এবং সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই কর্মটি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। গ্রন্থাগারের পুঁথি শাখার জন্য নির্দিষ্ট অংশ অধিকাংশ সময়ই জনশূন্য অবস্থায় থাকে। তার কারণও আছে। পুঁথিবিদ্যায় নিষ্ণাত না হলে পুঁথি নাড়াচাড়া করা অন্ধের হাতে দর্পণ থাকার মতো হাস্যকর ব্যাপার হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে পাণ্ডুলিপি পাঠ উদ্ধারের সাহায্যকারী যেকোন গ্রন্থই সাদরে বরণীয়।

এই উপমহাদেশে ভাষা এবং লিপির বৈচিত্র্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ব্রাহ্মী লিপি, অশোকলিপি, কুষাণলিপি, গুপ্তলিপি, কুটিললিপি, নাগরীলিপি ইত্যাদি বিচিত্র পথ পেরিয়ে বাংলা লিপির বিবর্তনের ইতিহাস যেমনি কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি আকর্ষণীয় গবেষণার বিষয়। উল্লিখিত লিপিগুলিরও কালানুসারে বিচিত্র রূপ। এইসব লিপিগুলির অন্ততঃ প্রাথমিক পরিচয় না থাকলে পুঁথিপাঠ সম্ভবই নয়। পাঠপ্রবেশ হলে তারপর ক্রমে ক্রমে বিষয় নির্ধারণ ইত্যাদির জ্ঞান এবং যত বেশি সংখ্যক পুঁথির সাহায্যে পাঠান্তর বিবেচনা করে মূল পাঠ স্থিরীকরণ—এভাবেই এগোতে হয়। ব্যাপারটি সহজ নয়— অত্যন্ত জটিল, পরিশ্রমসাধ্য এবং আলোচিত বিষয়ে গভীর জ্ঞান এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শাস্ত্রে সার্বিক পরিচয় না থাকলে এই সম্পাদনা কর্ম সার্থক হয় না। ড. কল্পনা ভৌমিক এই গ্রন্থে লিপির বিবর্তন, পাণ্ডুলিপি পরিচিতি, পাণ্ডুলিপি পরিচায়ন পদ্ধতি, পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠোদ্ধার পদ্ধতি, পাণ্ডুলিপির লিখনরীতি, পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা পদ্ধতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় সন্নিবিষ্ট করেছেন। শুধু তাই নয়। গ্রন্থে বিভিন্ন পুঁথির অংশ-বিশেষের প্রতিচিত্র প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেছেন। ফলে বাংলা লিপির বিবর্তনের ধারার একটি মোটামুটি চিত্র এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যাবে। প্রদত্ত পাণ্ডুলিপিসমূহের লিপিকরদের নামও তিনি প্রদান করেছেন। এসবই গবেষকদের একান্ত উপযোগী বিষয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। অনেকেরই ধারণা এই যে, সম্পাদনা কর্মের প্রাথমিক প্রথাগত কিছু কাজ নবীন শিক্ষার্থীরা করে দিতে পারেন। অতঃপর একটি কাঠামো দাঁড়িয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোন পণ্ডিত তা দেখে দিলেই সম্পাদনা কর্ম হয়ে যায়। এ ধারণা সঠিক মনে হয় না। একাধিক গ্রন্থের সম্পাদনা কর্মের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে—পুঁথির পাঠোদ্ধার কর্মের প্রতিটি পর্বই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন অংশই উপেক্ষণীয় নয়। পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট অক্ষরগুলি পরপর এমনভাবে লেখা থাকে যে,

পদচ্ছেদ কোথায় তা অনেকক্ষেত্রেই সংশয়ের সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ সংস্কৃত পুঁথির ক্ষেত্রে সন্ধির জট ছাড়াতে না পারলে অনর্থের সম্ভাবনা প্রতিপদে। গ্রন্থকার অনেক সময় পূর্বের গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ স্বগ্রন্থে ব্যবহার করেন ঋণ স্বীকৃতি ছাড়াই। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থটি পড়া না থাকলে, তার তাৎপর্য বোঝা কঠিন হয়। কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের পুঁথি হলে অন্যান্য শাস্ত্রের উদ্ধৃতি কোন প্রসঙ্গে করা হচ্ছে তা ধরা না গেলে বিষয়-প্রবেশই হবে না। কোন বিশেষ গ্রন্থের প্রাপ্ত একাধিক পুঁথির তুলনামূলক পাঠান্তর বিচারের পর বিশেষ একটি পাঠ গ্রহণের পক্ষে ঐ গ্রন্থকারের রচিত অন্যান্য গ্রন্থ কিংবা সমকালীন বা পূর্বকালীন সাহিত্যের প্রমাণ দাখিল করতে হবে। সুতরাং বিষয়ের সামগ্রিক পরিচয় না থাকলে সম্পাদনা কর্ম অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। তাই বলেছি যে, সম্পাদনা কর্মের সব পর্বই গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজ করতে পারেন পুঁথিবিদ্যা অধিগত করেছেন এবং গ্রন্থ রচনাকালীন সাহিত্য, শাস্ত্র প্রভৃতির পরিচয় রাখেন এমন ব্যক্তি। কেবলমাত্র ভারত-বাংলাদেশেই যে বিপুল পরিমাণ পুঁথি বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আছে (উল্লেখ যে, অরক্ষিত-অবহেলিত-অজ্ঞাত পুঁথির পরিমাণ তার শতগুণ বেশি—(এটি কোন অতিশয়োক্তি নয়)—সেগুলিকে যথাযথভাবে সম্পাদনা করতে পারলে এতদঞ্চলের সাহিত্য-সংস্কৃতির চিত্র সমৃদ্ধতর হবে সন্দেহ নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিহাসের পরিমার্জন করতে হতে পারে। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ইতিমধ্যে অরক্ষিত পুঁথিগুলি একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে। আমি পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে সংরক্ষিত কিংবা অরক্ষিত পুঁথিসমূহের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। বহু পুঁথি কাগজের পিণ্ডে পরিণত হয়েছে সংরক্ষিত অবস্থায় থেকেও। অন্যগুলির দশাতো বলার নয়। কাগজে-কলমে পুঁথির সংখ্যা এবং ব্যবহারযোগ্য পুঁথির সংখ্যায় আকাশ-জমিন ফারাক। পুঁথির তালিকা (ক্যাটালোগ) তৈরি করার মতো দক্ষ লোক কম।.এমতাবস্থায় আমার মতে যে পুঁথি যে অবস্থায় আছে নির্বিচারে আপাততঃ সবগুলিকে মাইক্রোফিল্মের মাধ্যমে কিংবা অর্থাভাবের প্রশ্ন উঠলে জেরক্স-কপি করে রাখা হোক। জেরক্স কপি বেশিদিন থাকবে না জানি। তবুও সমাসন্ন লুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে এবং তারপর তা থেকে ফিল্মিং করা যাবে। বেশি আড়ম্বর, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ইত্যাদির সরকারি শলা-পরামর্শে যে সময় ব্যয় হবে এবং প্রায়শই পর্বতের মূষিক প্রসবরূপ সামান্য ফল পাওয়া যাবে, তার চেয়ে বড় কাজ হবে যদি প্রথমে খোঁজ পাওয়া পুঁথির কপি করা এবং গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খোঁজ নেওয়া কোথায় আরো পুঁথি আছে এবং তা জেনে সেগুলির কপি (ফিল্ম / জেরক্স) করে রাখা। আমি ভারতের গঙ্গায় (পরিবারস্থ লোকের অবজ্ঞায়) পুঁথি ভেসে যেতে দেখেছি, বাংলাদেশের পদ্মাতেও তা ভাসে না এমনটা নয় এবং এভাবেই একদিন পুঁথিসম্ভারের বৃহদংশ কালসমুদ্রে বিলীন হবে। বাতানুকূল কক্ষ না হলে পুঁথি সংগ্রহ করে কি লাভ ইত্যাদি অবাস্তব ধারণা থেকে সরে এসে দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় যতটুকু সম্ভব ততটুকুর সদ্ব্যবহার করাই প্রাথমিক দায়িত্ব।

ড. কল্পনা ভৌমিক আমার 'ছাত্রী' (আমার প্রথম গবেষক-ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যশস্বী অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিকের স্ত্রী) এবং ছাত্রকন্যা। তাঁর

সাম্প্রতিক ডি.লিট থিসিস 'কবীন্দ্র মহাভারতে'র রচনাপর্বে সে আমার সঙ্গে কোন কোন বিষয় আলোচনা করেছে। আমি তার অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রায় দশ-বারো বছর ধরে পরিচিত আছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিসম্ভারের সঙ্গে তার আত্মিক যোগ। তার হাত দিয়ে প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির গ্রন্থ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আমি তার গ্রন্থের পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের বহুল প্রচার কামনা করি এবং একই সঙ্গে মাওলা ব্রাদার্স-এর স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় আহমেদ মাহমুদুল হককে অনুরোধ করি, গ্রন্থটি যাতে এপার বাংলায় সহজলভ্য হয় সে ব্যাপারে তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শুভমস্তু।

উপক্রমণিকা

প্রাচীন পাণ্ডুলিপির জীর্ণবক্ষে আমাদের যে সাহিত্যকৃতি এবং অতীত ঐতিহ্য ম্রিয়মাণ অবস্থায় আছে, যার সজীবতার মধ্যে আমাদের বর্তমান খুঁজে পেতে পারে তার ঋদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার বহুল জীবনীশক্তি, তাকে জীবন্ত করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস এতদিন দুর্লক্ষ্য ছিল। দীর্ঘদিনের সীমাহীন অবহেলা, ঔদাসীন্য, অনাদর আর অযত্নের অভাবে ইতোমধ্যে অনেক পাণ্ডুলিপি বিলীন হয়ে গেছে। অবশিষ্টাংশও বিলুপ্তির পথে। তবে সাম্প্রতিক কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই অমূল্য সম্পদ রক্ষাকল্পে কিছু কিছু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন-এর অর্থানুকূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে-সকল পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত আছে তাদের পরিচায়ন করা এবং মাইক্রোফিল্ম পদ্ধতির মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখা। এ প্রকল্পের অধীনে আগস্ট ১৯৮৪ থেকে জুন ১৯৮৮ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালা [রামমালা (কুমিল্লা), রংপুর, দিনাজপুর, ঢাকা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রাজশাহী, যশোর] থেকে সংগৃহীত প্রায় ২৪শ'র মতো পাণ্ডুলিপি পরিচায়িত ও মাইক্রোফিল্ম করে রাখা হয়েছে এবং বর্ণানুক্রমিকভাবে সেগুলির ক্যাটালগ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা আনুমানিক ৬০ হাজারের উর্ধ্বে। এই পাণ্ডুলিপিগুলি নিতান্ত অবহেলা ও অযত্নের এবং বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে অবক্ষয়ের শিকার হয়ে আছে। এদের অধিকাংশই অদ্যাবধি অপরিচায়িত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে—যা আমাদের জাতীয় জীবনে কখনই গৌরবের বিষয় নয়। এর পশ্চাতে কারণ অনেক। তন্মধ্যে দু'টি কারণ হলো—এসব প্রাচীন পাণ্ডুলিপির মূল্য সম্পর্কে অনবগতি ও পাণ্ডুলিপি গবেষকের অভাব। অনেকের ধারণা—এসব জীর্ণপত্র ঘেঁটে কি হবে? কিন্তু মুক্তো পেতে হলে কিছু ধুলোবালিতো শরীরে মাখতেই হবে। আর এ জন্যেই প্রয়োজন যথেষ্ট সংখ্যক গবেষকের। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে বাংলাদেশে এ ধরনের পাণ্ডুলিপি গবেষকের কেবল অভাবই নয়, পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা আছে এমন লোকের সংখ্যাও অপ্রতুল।

পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করতে গেলে প্রথমে পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা রাখতে হবে, পরে পরিচায়ন পদ্ধতির সাহায্যে চালাতে হবে গবেষণার কাজ। পাণ্ডুলিপি কি, এর আকার কিরূপ, রঙ কেমন, কিসের উপরই বা লেখা হত, কিসের দ্বারা লেখা হত, কোথায় কিভাবে লেখা হত ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গবেষণা করা সম্ভব নয়। একটা পাণ্ডুলিপির পত্রের সঙ্গে অন্য একটা পাণ্ডুলিপির পত্র মিশে গেলে তাদের পৃথকীকরণে যখন জটিলতার সৃষ্টি হয়, তখন পাণ্ডুলিপির আকার বা পরিমাপ এই পৃথকীকরণে অনেকটা সহায়তা করে। পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন উপাদান (অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি যার উপর লেখা হত, যেমন—ভূর্জপত্র, তালপত্র, তুলটকাগজ ইত্যাদি), কালি, লেখার আকৃতি, লেখার রীতি প্রভৃতি পাণ্ডুলিপির লেখক এবং তার কাল নিরূপণে সহায়তা করে। পাণ্ডুলিপির কোথায় কিভাবে এবং তাতে কি লেখা হত সে সম্পর্কে ধারণা থাকলে তাও পাণ্ডুলিপি পরিচায়নে সহযোগী হয়। কিন্তু আমার জানামতে পাণ্ডুলিপির এই সাধারণ পরিচিতি ও পরিচায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে এ পর্যন্ত এমন কোন গ্রন্থ[১] প্রকাশিত হয়নি যার দ্বারা পাণ্ডুলিপির নতুন কোন গবেষক এ বিষয়ে উপকৃত হতে পারেন। এখানে এতদ্বিষয়েই যথাসাধ্য আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ যাবৎ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির পঠন-পাঠন বিষয়ের উপরও কোন আলোচনা-সমালোচনা গ্রন্থ রচিত হয়নি। এমন কি আমাদের দেশে এ বিষয়ের কোন আলোচনা পর্যন্ত হয়নি। এটা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হলেও নির্মম সত্য। তবে আমাদের সংস্কৃত চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র সংস্কৃত বিভাগগুলি যদি এর উপর দৃষ্টি দেয় তাহলে হয়তো আর বেশি দিন এই অনুতাপের দহনে দগ্ধ হতে হবে না। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার সম্পর্কে আমার এই আলোচনা বিশাল সমুদ্রের এক বিন্দু জলের মতই সংক্ষিপ্ত। তথাপি আশা রাখি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার সম্পর্কে এখানে যা আলোচিত হলো এটুকু অনুসরণ করলেও পাণ্ডুলিপি পাঠের পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাবে।

পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব অপরিসীম। এখনও অসংখ্য পাণ্ডুলিপি রয়ে গেছে পরিচয়ের অন্তরালে। হয়তো এর মধ্যেই সন্ধান পাওয়া যেতে পারে এমন কোন মূল্যবান সৃষ্টি যা সাহিত্যে ও ইতিহাসে উন্মোচিত করতে পারে নতুন অধ্যায়, নতুন দিগন্ত। পাণ্ডুলিপির পরিচায়ন ও শ্রেণীকরণ করতে গিয়ে আমার চার/পাঁচ বছরের স্বল্প অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সম্পূর্ণরূপে অজানার অন্ধকারে বিরাজমান কাব্য, নাটক, প্রহসন, রম্যরচনা, তন্ত্র, স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি এমন সব পাণ্ডুলিপি রয়ে গেছে যেগুলি প্রকাশিত হলে নিঃসন্দেহে সাহিত্যজগতের গৌরব বৃদ্ধি পাবে। অনেকে মনে করেন, একটা পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ অংশ ব্যতীত খণ্ডিত একটি বা দুটি পত্র মূল্যহীন। সাধারণ্যে এরূপ মনে করা স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু একজন গবেষকের কাছে এটা ভুল ধারণা মাত্র। কেবল একটি বা দু'টি

---

১. উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের তিনটি প্রবন্ধ (প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা প্রসঙ্গে, সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা : পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠোদ্ধার পদ্ধতি এবং পাণ্ডুলিপি পরিচিতি ও পরিচায়ন পদ্ধতি) ইতঃপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তা এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পত্রই নয়, একটি পত্রের অর্ধেক এমন কি লিখিত ছোটখাট টুকরা পত্রও যথেষ্ট মূল্যবান। সেগুলিকেও সম্ভবমত পরিচায়িত করে রাখা কর্তব্য। এই খণ্ডিত পত্রগুলি অনেক সময় কোন মূল্যবান গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন অংশও হতে পারে। যেমন—'কপিদূত' নামে একটি দূত কাব্যের একটি পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাওয়া গেছে—যা ছিল সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। এবং দেখা গেছে বর্তমান সময় পর্যন্ত এর অন্য কোন 'কপি' পৃথিবীর কোথাও নেই। এমনি একটা মূল্যবান পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে সমস্যা হলো কাব্যটির প্রথম পত্রের নয়টি শ্লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে সে স্থলে 'ঘটকর্পর' কাব্যের নয়টি শ্লোক সংযুক্ত হয়ে আছে। লিপিকর একই সঙ্গে এই দুটি কাব্য লিপি করতে গিয়ে হয়তো ভুলটি করেছেন। এখন এই 'কপিদূত' কাব্যের প্রথম পত্রটি খণ্ডিত পত্র হিসেবে হয়তো অন্য কোন পাণ্ডুলিপির ভিতর মিশে আছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে এই খণ্ডিত ছোটখাট এক পাতা আধ-পাতার তুচ্ছ পত্রগুলিতে এমন কোন মূল্যবান তথ্য পাওয়া যেতে পারে যার মাধ্যমে কোন বিতর্কিত সমস্যার সমাধান মিলতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ কবি-সাহিত্যকের সঠিক সময় বিচার নিয়ে আজ পর্যন্ত গবেষণা চলছে। অতএব, পাণ্ডুলিপির লিখিত কোন অংশকে কোন প্রকার অবহেলা না করে অতি যত্ন সহকারে যথাসম্ভব পরিচায়িত করে রাখা বাঞ্ছনীয়।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগে ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে 'পাণ্ডুলিপি পাঠ' বিষয়টি সংস্কৃত বিষয়ে এম. এ. শেষ বর্ষের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা বিভাগে পাণ্ডুলিপি বিষয়টি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এবং প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিষয়ে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উক্ত পাঠ্যসূচী অনুসারে এ গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে। পাণ্ডুলিপি বিষয়ে এর দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। পনেরটি অধ্যায়ের সমন্বয়ে গ্রথিত হয়েছে এ গ্রন্থখানি। আলোচিত বিষয় অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে একাধিক উপাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথমাংশের ছোট ছোট উপাধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে লিপি কি, এর উৎপত্তির ইতিহাস কি, এর প্রকারভেদ কিরূপ, লিপির বিবর্তনধারা পৃথিবীর প্রধান প্রধান লিপিসমূহ প্রভৃতি বিষয়। এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপি কি, ব্রাহ্মীলিপির পরিচয় কি, ভারতবর্ষে এ ভাষা প্রচলনের সময়কাল কত, অন্যান্য কোন কোন লিপিতে রয়েছে এ লিপির প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে প্রথম অধ্যায়ের 'ব্রাহ্মীলিপির পরিচয়' অংশে। প্রাচীন ভারতবর্ষের আদি লিপি ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তির ইতিহাস, আর্যগণের আদি সাহিত্য বেদ ও ব্রাহ্মীলিপির মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা এ বিষয়গুলি বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামতের আলোকে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে এ অধ্যায়ের 'ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব' অংশে। প্রথম অধ্যায়ের শেষ উপাধ্যায়টিতে ব্রাহ্মীলিপি থেকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিভাবে অশোকলিপি, কুষাণলিপি, গুপ্তলিপি, কুটিল লিপি এবং পরিশেষে নাগরী লিপি ও আধুনিক বাংলা লিপির উদ্ভব হয়েছে তার ইতিহাস

পর্যালোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মীলিপি থেকে দেবনাগরী ও বাংলা লিপির ক্রমবিবর্তনের দুটি চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে এ অধ্যায়ের শেষে।

চারটি উপাধ্যায়ের সমন্বয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়টি রচিত। প্রথম উপাধ্যায়ে পাণ্ডুলিপির পরিচিতি বর্ণিত হয়েছে বিস্তৃতভাবে। পাণ্ডুলিপি কাকে বলে, পাণ্ডুলিপি শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস, পুথি ও পাণ্ডুলিপি সমার্থক শব্দ কিনা, বর্তমানে পাণ্ডুলিপি শব্দটি কোন কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে প্রভৃতি বিষয় আলোচনায় এসেছে এ উপাধ্যায়ে। পাণ্ডুলিপির আকার কিরূপ, আকারের বিভিন্নতার কারণ, কোন বিষয়ের পাণ্ডুলিপি সাধারণত কোন আকারে লিখিত হত-প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে 'পাণ্ডুলিপির আকার' অংশে। পাণ্ডুলিপি লিখিত হত কি কি উপাদানে, এ উপাদানগুলির প্রস্তুতপ্রণালী, বিভিন্ন উপাদানে কিসের সাহায্যে লিখিত হত, লেখনী তৈরী করা হত কোন উপাদান দ্বারা, লেখনীতে ব্যবহৃত হত কি কালি, এবং এ কালির প্রস্তুতপ্রণালী প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে 'পাণ্ডুলিপির লিখন উপকরণ' উপাধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়টি পূর্ণ হয়েছে দুটি উপাধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ের 'পাণ্ডুলিপির প্রাচীনত্ব' উপাধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম কখন লিখনরীতির প্রচলন হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বৈদিক যুগে যে লিখনরীতির প্রচলন ছিল তা বিভিন্ন মতামতের আলোকে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বৈদিক যুগে লিখনরীতি ছিল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেও ঐ যুগের লিখিত কোন দলিল আমরা অদ্যাবধি পাইনি। আমরা যা পেয়েছি তা অনেক পরবর্তী সময়ের। কোন সময়ে কোন বিষয়ের লিখিত পাণ্ডুলিপি কোথায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে শতাব্দী অনুযায়ী তা দেখানো হয়েছে এ উপাধ্যায়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি শাখায় সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং পুরাণ, মহাভারত, অভিধান, বেদ, ব্রাহ্মণ, নাটক, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রতিটির প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এ উপাধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডুলিপি পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি, অতীতে এর গুরুত্ব কিরূপ ছিল, বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি এবং বর্তমানে এর ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য এ বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে 'পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব ও ব্যবহার' উপাধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায় পূর্ণ হয়েছে পাণ্ডুলিপি পরিচায়ন পদ্ধতির আলোচনায়। একটি অপরিচায়িত পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের ক্ষেত্রে গবেষককে যে-যে বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগী হতে হবে এখানে তার আলোচনা রয়েছে। বিষয় নির্ধারণ ক্ষেত্রে নতুন গবেষকদের সমস্যার সমাধানকল্পের সাধারণ যে বিষয়গুলির উপর বেশি পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যেমন বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ কোষ—এ বিষয়গুলির সংক্ষিপ্তসার এ অংশে বর্ণিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির কোন কোন পত্র অনুসন্ধান করে গবেষক সহজে গ্রন্থের নাম, লেখক, সময়-কাল প্রভৃতি বিষয় নির্ধারণ করতে পারবেন এ অধ্যায়ে রয়েছে তার বিস্তৃত আলোচনা। প্রাচীনকালে বিভিন্ন রীতিতে অব্দ লিখন পদ্ধতির প্রচলন ছিল। এ অধ্যায়ে সে বিষয় সমূহের উপর বিস্তৃত আলোচনা

রয়েছে। পাণ্ডুলিপির সময়-কাল নিরূপণে সাধারণত যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা নিরসনের চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে উদাহরণ এবং ব্যাখ্যাসহ বিশদ আলোচনার মাধ্যমে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে কাল নির্ণয়ে সরাসরি গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার না করে প্রতীকী শব্দের ব্যবহার করা হত। পঞ্চম অধ্যায়ে এই প্রতীকী শব্দ কি এর ব্যবহারের ক্ষেত্র, এর উৎপত্তির ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংখ্যাবাচক শব্দের একটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়টি পূর্ণ হয়েছে 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠোদ্ধার' পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনায়। এ প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে এগারটি উপাধ্যায়ের মাধ্যমে। কোন ভাষা শিখতে হলে প্রথমেই পরিচিত হতে হয় যেমন সেই ভাষার বর্ণমালার সঙ্গে, তেমনি পাণ্ডুলিপি শিখতে হলেও পরিচিত হতে হবে তার সমসাময়িক বর্ণমালার সঙ্গে। এ উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমবিবর্তিত বর্ণমালার একটি তালিকা প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে লিপি পরম্পরায় পাণ্ডুলিপির লিখনরীতিতে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। সাধারণত দেখা যায়, এ পরিবর্তন ঘটেছে শতাব্দী অনুযায়ী। কখনও কখনও একই শতাব্দীর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পরিদৃষ্ট হয় ব্যতিক্রমধর্মী লিখনরীতি। আবার কখনও কখনও একই পাণ্ডুলিপিতে একই বর্ণের বিভিন্ন প্রকার লিখনরীতির পরিচয়ও পরিলক্ষিত হয়। এ মর্মে একই বর্ণের যে সব বিভিন্ন রূপ বা আকৃতি সাধারণত দৃষ্ট হয় সেগুলি 'অ' থেকে 'ক্ষ' পর্যন্ত বর্ণানুক্রমে প্রদর্শিত হয়েছে এ অধ্যায়ে। কেবল আক্ষরিক জ্ঞান নয়, স্বরমাত্রিক জ্ঞানার্জনের সহায়করূপেও প্রতিটি বানান, ফলা-য় যে একাধিক লিখনরীতি পরিদৃষ্ট তা উদাহরণসহ স্থান পেয়েছে 'স্বরমাত্রিক জ্ঞান' উপাধ্যায়ে। যে-কোন পাণ্ডুলিপি সঠিকরূপে পাঠোদ্ধার করতে হলে প্রতিটি বর্ণ যেমন সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে তেমনি প্রতিটি চিহ্নও করতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ। প্রাচীন পাণ্ডুলিপির লিখনরীতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো কৌণিক চিহ্নের () দ্বারা যুক্তব্যঞ্জনে ফলা-র ব্যবহার। অর্থাৎ এই কৌণিক চিহ্নের মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে বিশেষ-বিশেষ ব্যঞ্জনবর্ণ। চিহ্নভিত্তিক এ বর্ণগুলি লিখিত হয়েছে কোনও একটি বর্ণের নিম্নে। এ বিষয়টি এ অধ্যায়ের 'চিহ্নমাত্রিক জ্ঞান' অংশে উদাহরণসহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির লিখনরীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো একই আকৃতির দুটি বর্ণের একটিকে চিহ্ন দ্বারা পৃথক করা। এ পদ্ধতিতে লেখকগণ একই আকৃতির দুটি বর্ণের একটির নীচে, উপরে বা পাশে ছোট্ট একটি বিন্দু চিহ্নের দ্বারা পার্থক্য নির্দেশ করতেন। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এ রীতির ব্যবহার বিভিন্ন বর্ণে বা শব্দে বহুল প্রচলিত। এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে 'চিহ্ন দ্বারা সমাকৃতি বর্ণের পৃথকীকরণ' অংশে। সংস্কৃত ভাষায় 'অনুস্বার' হরফটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পাণ্ডুলিপিতে এই হরফটি প্রথমাবস্থায় একটি ছোট্ট বিন্দু চিহ্নের আকারে স্থাপিত হয়েছে বর্ণের মাথার উপর বা কাঁধ বরাবর। শতাব্দী অনুযায়ী এ হরফটির বিভিন্ন বিবর্তন ঘটেছে। এ বিষয়টি 'অনুস্বার অক্ষরের ব্যবহার' অংশে উদাহরণসহ প্রদর্শিত হয়েছে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধারে যে বিষয়টি পাঠককে সবচেয়ে বেশী

বিভ্রান্তিতে ফেলে তা হল যুক্তবর্ণের ব্যবহার। একটি বর্ণের সঙ্গে একাধিক বর্ণ, ফলা যুক্ত করে অনেক কথা এক সঙ্গে প্রকাশের প্রবণতা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি লেখকদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। পাণ্ডুলিপি পাঠের এই জটিলতার নিরসনকল্পে এ অধ্যায়ের 'যুক্তবর্ণের ব্যবহার' অংশে প্রয়োজনীয় যুক্তবর্ণের একাধিক উদাহরণ প্রদর্শন করা হয়েছে। এ অংশে যুক্তবর্ণের উদাহরণের পূর্বে প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে ব্যবহৃত উ-কার, ঋ-কার, য-ফলা, র-ফলা, ব-ফলা ও ম-ফলার একাধিক উদাহরণ প্রদর্শিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে একই পাণ্ডুলিপিতে একই বর্ণ বা শব্দের ভিন্ন লিখনরীতি পরিদৃষ্ট হয়। আবার কখনও কখনও পরিলক্ষিত হয় একই আকৃতির ভিন্নার্থক বর্ণ বা শব্দের ব্যবহার। এ বিষয় দুটি উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিশেষ করে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধারে ভাষার উপর যথার্থ দক্ষতা না থাকলে পাণ্ডুলিপি পাঠের চিন্তা করাই উচিত নয়। এর কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ের শেষ উপাধ্যায়টিতে।

সপ্তম অধ্যায়টি দুটি উপাধ্যায়ে বিভক্ত। লিপিকৃত অধিকাংশ বাংলা পাণ্ডুলিপি এবং কোনও কোনও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতেও বানান ভুলের আধিক্য লক্ষ্যযোগ্য। এর পিছনে সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে সাধ্যানুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে 'পাণ্ডুলিপির বানান ভুল প্রসঙ্গ' উপাধ্যায়ে। সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা ভাষা পৃথক হলেও অধিকাংশ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি লিখিত হয়েছে বাংলা লিপিতে। এই উভয় ভাষার পাণ্ডুলিপি একই লিপিতে লিখিত হলেও লিখনরীতিতে কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। উদাহরণসহ এ পার্থক্যগুলি প্রদর্শন করা হয়েছে এ অধ্যায়ের শেষ উপাধ্যায়ে।

অষ্টম অধ্যায়টি পূর্ণ হয়েছে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা পদ্ধতির আলোচনায়। একটি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করতে যে বিষয়গুলি গবেষকগণের জানা অত্যাবশ্যকীয়, সে বিষয়গুলির বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

যাঁদের দ্বারা প্রাচীন সাহিত্য যুগ পরম্পরায় লিপিকৃত হয়েছে তারাই লিপিকর। নবম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে এ লিপিকরদের আলোচনা। লিপিকরের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, লিপিকরের প্রয়োজনীয়তা, লিপিকর প্রমাদ প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে এ অধ্যায়ে।

দশম অধ্যায়টি পূর্ণ হয়েছে পাণ্ডুলিপির পাঠবিকৃতি সম্পর্কিত আলোচনায়। পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতিটি পুথিই কিছু না কিছু পাঠবিকৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কি কি কারণে, কত ভাবে এবং কার দ্বারা পাণ্ডুলিপিতে এই পাঠ বিকৃতি সংঘটিত হত তার উপর বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে এ অধ্যায়ে।

সম্পাদনা পদ্ধতি, সম্পাদনা পদ্ধতির প্রকারভেদ সম্পাদনায় সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে পাণ্ডুলিপির ভুল সংশোধন পদ্ধতির উপর সার্বিক আলোচনা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পর্যায়ক্রমে বাদ রেখে যাওয়া বর্ণ বা শব্দের সংশোধন, চিহ্ন মাত্রিক সংশোধন, চিহ্ন ব্যতীত সাধারণ সংশোধন, এক শব্দের স্থলে

অন্য শব্দ লিখন প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক সংশোধন পদ্ধতিগুলি উদাহরণসহ আলোচিত হয়েছে।

বাংলা লিপিতে লিখিত সংস্কৃত ও মুসলিম পুথির লিখন রীতিতে নানা প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। বাংলা লিপির বিবর্তন ইতিহাসে এ প্রভেদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বাদশ অধ্যায়ে এ বিষয়ের উপর রয়েছে নানা পর্যালোচনা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিত হয়েছে পাণ্ডুলিপির পাঠান্তর সমস্যা। চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রক্ষিপ্ত পাঠ এবং পাঠান্তরের সংজ্ঞা এবং তুলনামূলক আলোচনা লিখিত হয়েছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে পাণ্ডুলিপির পাঠ সমালোচনার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে।

ষোড়শ অধ্যায়টি পূর্ণ হয়েছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনায়। এখানে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির রচনাকাল সমস্যার সমাধান করা হয়েছে পাণ্ডুলিপির দৃষ্টান্তসহ।

গ্রন্থের শেষ দিকে সন্নিবেশিত হয়েছে সাতটি পরিশিষ্ট। এই পরিশিষ্টগুলিতে যথাক্রমে টীকা, নমুনাচিত্র, গ্রন্থে ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিসমূহের সংখ্যানুক্রমিক তালিকা, গ্রন্থে উল্লিখিত লেখকদের বর্ণানুক্রমিক নাম, গ্রন্থে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির লিপিকরদের বর্ণানুক্রমিক নাম, গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের নাম, গ্রন্থে উল্লিখিত লিপির তালিকা এবং সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী প্রদত্ত হয়েছে। পরিশেষে দেয়া হয়েছে সংকেতার্থ।

সংকেতার্থ

ক. ঢা. বি. আ. সং—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবদুল করিম সংগ্রহ
খ. ঢা. বি. পা. শা. সং—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি শাখা সংগ্রহ
গ. ঢা. বি. পা. সং—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডুলিপি সংখ্যা
ঘ. বা. এ. পা. সং—বাংলা একাডেমী পাণ্ডুলিপি সংখ্যা
ঙ. রা. পা. সং—রামমালা গ্রন্থাগার পাণ্ডুলিপি সংখ্যা
চ. ঢা. বি. পু. সং—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি সংখ্যা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

লিপি ৩৩—৫৭

ক. লিপি পরিচয় ৩৩
খ. লিপির বিবর্তন ৩৫
গ. পৃথিবীর প্রধান প্রধান লিপিসমূহ ৩৭
ঘ. ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব ও নামকরণ ৩৯
ঙ. ব্রাহ্মীলিপি থেকে দেবনাগরী ও বাংলা লিপির উদ্ভব ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাণ্ডুলিপির পরিচিতি ৫৮—৭০

ক. পরিচিতি ৫৮
খ. পাণ্ডুলিপির আকার ৬০
গ. পাণ্ডুলিপির লিখন উপকরণ ৬৩
ঘ. পাণ্ডুলিপির লিখন পদ্ধতি ৬৬

তৃতীয় অধ্যায়

পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব ৭১—৮০

ক. পাণ্ডুলিপির প্রাচীনত্ব ৭১
খ. পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব ও ব্যবহার ৭৬

চতুর্থ অধ্যায়

পাণ্ডুলিপি পরিচায়ন পদ্ধতি ৮১—১১৬

ক. পরিচায়ন কি ৮১
খ. পাণ্ডুলিপি পরিচায়ন পদ্ধতি ৮১

গ. পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের কতিপয় সহজ নিয়ম ৮২
১. বিষয় নির্ধারণ ৮২
২. নাম নির্ধারণ ৮৫
৩. পত্রসংখ্যা ৮৮
৪. সম্পূর্ণ/অসম্পূর্ণ নির্ধারণ ৯০
৫. লেখক/লিপিকর নির্ধারণ ৯০
৬. পুষ্পিকা ৯৪
৭. ভণিতা ৯৮
৮. কালাঙ্ক ১০০
ঘ. প্রাচীন অব্দ লিখন পদ্ধতি ১০৫
ঙ. আবজাদ রীতি ১১১

পঞ্চম অধ্যায়
সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দ ১১৭—১২৯
ক. সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দের সংজ্ঞা ১১৭
খ. প্রতীকী শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্র ১১৭
১. ছন্দশাস্ত্রে ১১৭
২. অলঙ্কার-শাস্ত্রে ১১৮
৩. অঙ্কাভিধানে, সংখ্যাকোষে, অমরকোষে ১১৮
৪. জ্যোতিষে ১১৮
৫. মন্ত্র-তন্ত্রে ১১৯
৬. কালাঙ্কনির্দেশে ১২০
গ. প্রতীকী শব্দের উৎপত্তি কাল ১২০
ঘ. সংখ্যাবাচক শব্দের তালিকা ১২৪
ঙ. প্রতীকে মাস, বার ও নক্ষত্র ১২৮

ষষ্ঠ অধ্যায়
পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠোদ্ধার পদ্ধতি ১৩০—২২৭
ক. পাণ্ডুলিপি পাঠ ১৩০
খ. পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধার পদ্ধতি (আক্ষরিক জ্ঞান) ১৩২
গ. স্বরমাত্রিক জ্ঞান ১৬৩
ঘ. চিহ্নমাত্রিক জ্ঞান ১৬৯
ঙ. কৌণিক চিহ্নের ব্যবহার ১৭১
চ. চিহ্নদ্বারা সমাকৃতি বর্ণের পৃথকীকরণ ১৭৩
ছ. অনুস্বার অক্ষরের ব্যবহার ১৭৮
জ. যুক্তবর্ণের ব্যবহার ১৮০
ঝ. একই পাণ্ডুলিপিতে একই বর্ণ বা শব্দের ভিন্নরীতি ২১৫
ঞ. একই আকৃতির ভিন্নার্থক বর্ণ ও শব্দ ২১৮
ট. পাঠশিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ২২৬

সপ্তম অধ্যায়

পাণ্ডুলিপির লিখন রীতি ২২৮–২৩৬

ক. পাণ্ডুলিপির বানান ভুল প্রসঙ্গ ২২৮
১. লিপিকরের অজ্ঞতাজনিত ভুল ২৩০
২. লিপিকরের বোঝার ভুল ২৩১
৩. অনুমানগত ভুল ২৩১
৪. নিজস্ব জ্ঞান ২৩১
খ. সংস্কৃত ও বাংলা পাণ্ডুলিপির লিখনরীতির পার্থক্য ২৩৩
১. ' ্য ' (য-ফলা) নির্দেশক অতিরিক্ত ' / ' চিহ্ন ২৩৩
২. দ্বিত্ব নির্দেশক ' ́ ' রেফ-এর ব্যবহার ২৩৪
৩. দ্বিত্ব বোঝাতে ডানপার্শ্বে অতিরিক্ত চিহ্নের ব্যবহার ২৩৪

অষ্টম অধ্যায়

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা পদ্ধতি ২৩৭–২৪৮

ক. সম্পাদনা পদ্ধতি ২৩৭
১. আক্ষরিক সম্পাদনা পদ্ধতি ২৩৭
২. সংশোধিত সম্পাদনা পদ্ধতি ২৩৮
৩. সমন্বিত সম্পাদনা পদ্ধতি ২৩৮
৪. আদর্শ পুথি ভিত্তিক সম্পাদনা পদ্ধতি ২৩৯
খ. পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২৩৯
i. সম্পাদনার বহিরঙ্গ বিষয় ২৩৯
১. পুথি নির্বাচন ২৩৯
২. নির্বাচিত পুথির প্রতিলিপি অনুসন্ধান ২৩৯
৩. নির্বাচিত পুথির প্রতিলিপি সংগ্রহ ২৪০
৪. সংগৃহীত পুথির কালানুক্রমিক বিন্যস্তকরণ ২৪০
৫. আদর্শ পুথি নির্বাচন ২৪০
৬. আদর্শ পুথির পাঠোদ্ধার ২৪০
ii. সম্পাদনার আভ্যন্তরীণ বিষয় ২৪১
১. পুথির পরিচিতি ২৪১
২. পুথির গুরুত্ব আলোচনা ২৪১
৩. কবি পরিচিতি ২৪১
৪. ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ২৪১
৫. সাহিত্যিক মূল্যায়ন ২৪২
৬. সমাজচিত্র ২৪২
৭. কালাঙ্ক নির্ণয় ২৪২
৮. লিখনরীতি ২৪২
৯. ভাষাতাত্ত্বিক ও লিপিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ২৪৩
১০. বিষয়বস্তু ২৪৩
১১. নির্বাচিত পুথিসমূহের লিপিকর পরিচিতি ২৪৩
১২. সম্পাদনায় অনুসৃত পদ্ধতি আলোচনা ২৪৩

১৩. *নির্বাচিত প্রতিলিপির তুলনামূলক আলোচনা* ২৪৩
১৪. *নির্বাচিত পুথিসমূহের বর্ণনামূলক পরিচিতি* ২৪৪
১৫. ভণিতা ও পুষ্পিকা বিশ্লেষণ ২৪৪
১৬. সংশোধিত শব্দের তালিকা ২৪৪
গ. সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কতিপয় অনুশাসন ২৪৫

নবম অধ্যায়

লিপিকর ২৪৮—২৫৪

ক. লিপিকরের সংজ্ঞা ২৪৮
খ. লিপিকরের প্রকারভেদ ২৪৯
গ. লিপিকরের প্রয়োজনীয়তা ২৫১
ঘ. লিপিকর প্রমাদ ২৫২

দশম অধ্যায়

পাণ্ডুলিপির পাঠবিকৃতি ২৫৫—২৫৯

ক. পাঠ বিকৃতির সংজ্ঞা ২৫৫
খ. পাঠ বিকৃতির কারণ ২৫৫
১. লিপিকরের ইচ্ছাকৃত ভুল ২৫৬
২. লিপিকরের অনিচ্ছাকৃত ভুল ২৫৬
৩. লিপিকরের বোঝার ভুল ২৫৭
৪. বর্ণের স্থান বিপর্যয়ে বিভ্রান্তি ২৫৮
৫. প্রক্ষেপণ বা সংযোজন জাত ভুল / বিভ্রান্তি ২৫৮
৬. সাদৃশ্যজাত ভুল / বিভ্রান্তি ২৫৯

একাদশ অধ্যায়

পাঠ সংশোধন পদ্ধতি ২৬০—২৬৯

ক. পাঠ সংশোধন পদ্ধতি ২৬০
খ. পাঠ সংশোধন পদ্ধতির প্রকারভেদ ২৬০
১. বাদ রেখে যাওয়া বর্ণের বা শব্দের সংশোধন ২৬০
২. চিহ্ন মাত্রিক সংশোধন ২৬১
৩. চিহ্ন ব্যতীত সাধারণ সংশোধন ২৬৪
৪. একই বর্ণ, শব্দ বা শব্দাবলি দুবার লিখে তার সংশোধন ২৬৪
৫. এক শব্দের স্থলে অন্য শব্দ লিখন ২৬৫
৬. অতিরিক্ত বর্ণ, শব্দ বা শব্দাবলি লিখন ২৬৭

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলা লিপির বিবর্তনে সংস্কৃত ও মুসলিম পুথির গুরুত্ব ২৭০—২৭৪

ক. সংস্কৃত পুথি ২৭০
খ. মুসলিম পুথি ২৭০

গ. তুলনামূলক আলোচনা ২৭০
ঘ. পুথির লিপিবিকৃতির কারণ ২৭৩
১. লিপিকরের অজ্ঞতা ২৭৩
২. দেবনাগরী লিপির প্রভাব ২৭৩
৩. ঔপভাষিক প্রভাব ও আঞ্চলিক প্রভাব ২৭৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়
পাণ্ডুলিপির পাঠান্তর সমস্যা ২৭৫–২৭৮
ক. পাঠান্তরের সংজ্ঞা ২৭৫
খ. পাঠান্তরের শ্রেণীবিভাগ ২৭৫

চতুর্দশ অধ্যায়
পাণ্ডুলিপির প্রক্ষিপ্ত পাঠ ২৭৯–২৮৪
ক. প্রক্ষিপ্ত পাঠের সংজ্ঞা ২৭৯
খ. প্রক্ষেপণ ও পাঠান্তরের মধ্যে পার্থক্য ২৭৯
গ. প্রক্ষিপ্ত পাঠ সমস্যা ২৭৯

পঞ্চদশ অধ্যায়
পাঠ সমালোচনা ২৮৫–২৮৭
ক. পাঠ সমালোচনার সংজ্ঞা ২৮৫
খ. পাঠ সমালোচনার পদ্ধতি ২৮৫

ষোড়শ অধ্যায়
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির রচনাকাল সংক্রান্ত সমস্যা ও তার সমাধান ২৮৮–৩০৪
পুথিভিত্তিক পর্যালোচনা ২৮৮

পরিশিষ্ট ৩০৫
ক. নমুনা চিত্র ৩০৫
খ. টীকা ৩১৯
গ. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৩২৫
ঘ. গ্রন্থে ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিসমূহের সংখ্যানুক্রমিক তালিকা ৩২৭
ঙ. গ্রন্থে উল্লিখিত লেখকদের বর্ণানুক্রমিক নাম
চ. গ্রন্থে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির লিপিকরদের নাম
ছ. গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের বর্ণানুক্রমিক তালিকা
জ. গ্রন্থে উল্লিখিত লিপির বর্ণানুক্রমিক তালিকা

প্রথম অধ্যায়

লিপি

ক. লিপি পরিচয়

মানুষের মনোভাব প্রকাশের জন্য লিখিত, খোদিত বা অঙ্কিত সাঙ্কেতিক চিহ্নসমূহকে বলা হয় লিপি। লিপির মাধ্যমেই মানব মনের ভাষা পায় তার বাহ্যিক কাঠামো, অর্থাৎ লিপির সাহায্যেই প্রকাশিত হয় নিগূঢ়মানব মনের বিচিত্র ভাব।

লিপি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে লিপ্ ধাতুর সঙ্গে ইন্ প্রত্যয় যোগে (প্ল লিপ্ + ই = লিপি)। লিপি শব্দের উৎপত্তি এবং প্রথম প্রয়োগ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছেন।

ভারতীয় ব্যাকরণবিদগণ মনে করেন 'লেপন করা' থেকে 'লিপি' শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকগণের ধারণা 'দিপি' শব্দই 'লিপি' শব্দের জনক বা ভ্রাতা। দিপি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দো + তিক্ কর্তৃবা—ছেদন, খণ্ডন। প্রাচীন 'ব্রাহ্মী' অক্ষরে লিখিত অশোক লিপিতে যেখানে 'লিপি' শব্দের প্রয়োগ আছে, খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত লিপিতে সেখানে দৃষ্ট হয় 'দিপি' শব্দের ব্যবহার। তাছাড়া প্রাচীন পারসীয় শিলালেখেও 'দিপি' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত অশোক লিপিগুলিতে যেখানে 'লিখিত', 'লেখিত', 'লেখাপিত' শব্দের উল্লেখ আছে, খরোষ্ঠী লিপিতে সেখানে 'নিপিসৃত', 'নিপেস্সিত', 'নিপেসসিত' শব্দের উল্লেখ আছে কোথাও কোথাও। এ হেতু কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক মনে করেন, শেষোক্ত এই তিনটি শব্দ প্রাচীন পারসীয় 'নি-পিষ' (= লেখা) শব্দ হতে নিষ্পন্ন।

লিপি শব্দের অনেক সমার্থক বা সমপর্যায়ভুক্ত শব্দ পাওয়া যায়, যেমন—লিবি, লিপী, লিবী, লিপিকা, লেখা, অক্ষরসংস্থান, অক্ষরবিন্যাস, অক্ষর-রচনা প্রভৃতি। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতেও লিপি শব্দের লিবি, লেখনী, মসি, বর্ণ, অক্ষর, যবনানী (যবনদিগের লিপি) প্রভৃতি সমার্থক বা সমপর্যায়ভুক্ত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। দেশ,

কাল ও যুগপ্রভাবে এক এক সময়ে এক এক দেশে ব্যবহৃত হয়েছে লিপির এক এক নাম।

লিপির একাধিক প্রকারভেদ লক্ষণীয়। এ সম্পর্কে বারাহী তন্ত্রে বলা হয়েছে,—

> "মুদ্রালিপিঃ শিল্পলিপির্লিপির্লেখনীসম্ভবা।
> গুণ্ডিকা-ঘুণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চধাস্মৃতাঃ।"

এ শ্লোকে পাঁচ প্রকার লিপির কথা উল্লিখিত। যথা :

১. মুদ্রালিপি—অঙ্গুরীয়, টাকা প্রভৃতিতে ছাপ জাতীয় লিপি।
২. শিল্পলিপি—চিত্রকার্যের দ্বারা যে লিপি লিখিত।
৩. লেখনীসম্ভবালিপি—কলম দ্বারা লিখিত লিপি।
৪. গুণ্ডিকালিপি—তণ্ডুলাদির গুঁড়া দ্বারা লিখিত হয় যে লিপি।
৫. ঘুণাক্ষরলিপি—ঘুণ কীট দ্বারা যে লিপির সৃষ্টি তা ঘুণাক্ষর লিপি নামে পরিচিত। ঘুণ নামক এক প্রকার পোকা কাঠের উপর বিভিন্ন প্রকার রেখা টানে; কখনও কখনও তার কোন কোনটি নানা অক্ষর সদৃশ হয়ে থাকে।

এছাড়াও তাম্রলিপি, শিলালিপি, রৌপ্যলিপি, স্বর্ণলিপি প্রভৃতি লিপির নিদর্শন পাওয়া যায়।

মানুষের বহু চেষ্টা ও গবেষণার ফলে বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা প্রকার লিপি। দেখা গেছে লিপির নামকরণ হয়ে থাকে সাধারণত কোন সভ্যতা, দেশ, রাজা, ভাষা, বস্তু প্রভৃতির নামানুসারে। যেমন—বৈদিকলিপি, সিন্ধুলিপি, ব্রাহ্মীলিপি, অশোকলিপি, মৌর্যলিপি, কুষাণলিপি, গুপ্তলিপি, কুটিললিপি, দ্রাবিড়ী ও দাক্ষিণাত্যলিপি, খরোষ্ঠীলিপি, নাগরীলিপি, বাংলালিপি ইত্যাদি। 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থে চৌষট্টি প্রকার লিপির নাম জানা যায়। যেমন—(১) ব্রাহ্মী, (২) খরোষ্ঠী, (৩) পুষ্করশারী, (৪) অঙ্গলিপি, (৫) বঙ্গলিপি, (৬) মগধলিপি, (৭) মাঙ্গল্যলিপি (৮) মনুষ্যলিপি, (৯) কিন্নারিলিপি, (১০) দক্ষিণলিপি (১১) উগ্রলিপি, (১২) সংখ্যালিপি, (১৩) অনুলোম, (১৪) অর্ধধনু, (১৫) দরদ, (১৬) খাস্য, (১৭) চীন, (১৮) হূন, (১৯)মধ্যাক্ষরবিস্তর, (২০) পুষ্প, (২১) দেব, (২২) নাগ, (২৩) যক্ষ, (২৪) গন্ধর্ব, (২৫) কিন্নর, (২৬) মহোরগ, (২৭) অসুর, (২৮) গরুড়, (২৯) মৃগচক্র, (৩০) চক্র, (৩১) বায়ুরুৎম, (৩২) ভৌমদেব, (৩৩) অন্তরীক্ষদেব, (৩৪) উত্তর কুরুদ্বীপ, (৩৫) অপরগৌড়, (৩৬) পূর্ববিদেহ, (৩৭) উৎক্ষেপ, (৩৮) নিক্ষেপ, (৩৯) বিক্ষেপ, (৪০) প্রক্ষেপ, (৪১) সাগর, (৪২) বজ্র, (৪৩) লেখপ্রতিলেখ, (৪৪) অনুদ্রুত, (৪৫) শাস্ত্রাবর্ত, (৪৬) গণনাবর্ত, (৪৭) উৎক্ষেপাবর্ত, (৪৮) নিক্ষেপাবর্ত, (৪৯) পাদলিখিত, (৫০) দ্বিরুত্তরপদসন্ধি, (৫১) দশোত্তরপদসন্ধি, (৫২) অধ্যাহারিণী, (৫৩) সর্বরুতসংগ্রণী, (৫৪) বিদ্যানুলোমা, (৫৫) বিমিশ্রিত, (৫৬) ঋষিতপস্তপ্তা, (৫৭) রোচমানা ধরণীপ্রেক্ষণ, (৫৮) সর্বৌষধিনিষ্যন্দা, (৫৯) সর্বসার সংগ্রহণী, (৬০) সর্বভূতরুতগ্রহণী, (৬১) অঙ্গুরীয় লিপি, (৬২) শিকারী লিপি, (৬৩) ব্রহ্মাবলী লিপি এবং (৬৪) দ্রাবিড় লিপি (ললিত বিস্তর, ১০ম অধ্যায়)।

এ সবের মধ্যে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠীলিপি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলে গবেষকদের ধারণা। এ দুটি লিপি ব্যতীত অন্য কোন লিপির নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি।

খ. লিপির বিবর্তন

বর্তমানে আমরা যে পূর্ণাঙ্গ লিপি দেখছি তার জন্ম হঠাৎ করে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে হয় নি। যুগ যুগ ধরে বিবর্তন-পরিবর্তন আর মানুষের হাজারো ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে আজ তা বর্তমান অবস্থায় পৌছেছে। তবে কখন কোথায় কিরূপে প্রথম লিপির উদ্ভব হয়েছিল সে তত্ত্ব এখনও অনুদ্ঘাটিত। যা কিছু উদ্ঘাটিত হয়েছে তার অধিকাংশই অনুমান নির্ভর। গবেষকগণ অনলস গবেষণার পর অনুমান করেছেন, আজ থেকে প্রায় দশ সহস্র বৎসরেরও অধিক প্রাচীন যুগে মানুষ প্রস্তর ফলক ও গুহার গাত্রে নানা চিত্র অঙ্কিত বা খোদিত করে রাখত। কোনো বস্তু বা ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার ইচ্ছা থেকেই আবিষ্কার হয়েছে লিপির। গবেষকদের লিপি আবিষ্কারের প্রথম নমুনা এই নানা প্রকার চিত্রাঙ্কিত গুহালিপি ও প্রস্তরলিপি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অঙ্কিত এরূপ চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন স্থানে। যেমন 'কুইপু' (Quipu) নামে এক আশ্চর্যজনক 'গ্রন্থিলিপি'—পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু প্রদেশে—যা সেই যুগের লিপির স্মারক হিসেবে একটি মূল্যবান দলিল। এ 'গ্রন্থিলিপি'-পদ্ধতিতে কোন বস্তু বা ভাবকে প্রকাশ করার মাধ্যম ছিল রজ্জুতে গ্রন্থি বা গিঁট রচনা। সেই সময়ে কোন ঘটনা বা রাজার আদেশকে লিপিবদ্ধ করে রাখা হত রজ্জু বা দড়িতে গ্রন্থির সংখ্যা, অবস্থান, সূক্ষ্মতা প্রভৃতির মাধ্যমে। রজ্জুর উপাদানভেদে ভাবেরও বিভিন্নতা ঘটত। যেমন—বস্তু নিরপেক্ষ ভাব প্রকাশের মাধ্যম ছিল নানা প্রকার রঙীন সুতার গ্রন্থি। লাল সূতার দ্বারা বোঝাত 'যুদ্ধ' বা 'সোনা' এবং সাদা সূতার দ্বারা বোঝাত 'শান্তি' বা 'রূপা'। কিন্তু বস্তুবাচক ভাব প্রকাশের জন্য কোন রঙীন সূতা ব্যবহৃত হত না।

লিপিকে বর্ণমালা বা বর্ণলিপির পর্যায়ে পৌছতে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেকগুলি স্তর। এ স্তরগুলি গুহাগাত্র ও প্রস্তর-ফলক লিপি, চিত্রলিপি, ভাবলিপি, শব্দলিপি, স্বরলিপি, বর্ণলিপি নামে পরিচিত। শিশু যেমন ক্রমে ক্রমে নানা স্তর পেরিয়ে পূর্ণরূপে কথা বলতে শেখে, লিপিও তেমনি প্রাথমিক দুর্বল ও অসম্পূর্ণ অবস্থা থেকে ক্রমশ স্থিতি পেয়েছে নির্দিষ্ট ও পরিণত বর্ণলিপিতে। এ স্তরগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচিত হল।

(i) গুহা ও প্রস্তর লিপি বা প্রথম পর্যায়ের লিপি—লিপির প্রথম পর্যায়ে মানুষ গুহাগাত্রে বা প্রস্তর-ফলকে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করত। এ পদ্ধতিতে একটি চিত্রের দ্বারা তারা প্রকাশ করত একটি পূর্ণ বাক্য। কিন্তু একটি চিত্রের দ্বারা একটি সম্পূর্ণ বাক্য প্রকাশ করা কঠিন। ফলে খুব কম চিত্রেই প্রকাশিত হত একটি পূর্ণ বাক্য। অনেক ক্ষেত্রে যে বাক্য প্রকাশের জন্য যে চিত্র অঙ্কিত হত তা ব্যক্তিভেদে হত বিভিন্নার্থবোধক। এভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত চিত্রাঙ্কনের মূল উদ্দেশ্য।

(ii) চিত্রলিপি (Pictogram)—একটি চিত্রে একটি পূর্ণ বাক্য বোঝাতে নানা সমস্যা দেখা দিলে মানুষ তার সমাধানের জন্য উদ্ভাবন করল 'চিত্রলিপি'র। এ পদ্ধতিতে একটি পূর্ণ বাক্যকে বোঝাতে একটি চিত্রের স্থলে অঙ্কন করত অনেকগুলি চিত্র। প্রতিটি চিত্রের দ্বারা বোঝানো হত একটি করে বস্তু। এভাবে পরপর অনেকগুলি বস্তুচিত্রের দ্বারা প্রকাশিত হত একটি সম্পূর্ণ বাক্য। কিন্তু এরূপ বাক্য-প্রকাশক বস্তুচিত্র দ্বারা কোন সূক্ষ্মভাব ব্যক্ত করা সম্ভব ছিল না। শুধু স্থূল বস্তু প্রকাশেরই মাধ্যম ছিল এই বস্তুচিত্রগুলি। ফলে ধীরে ধীরে এ পদ্ধতিতে মানুষ হতে থাকল নানা অসুবিধার সম্মুখীন। এ থেকেই মানুষের মনে আবির্ভূত হয় নতুন কিছু আবিষ্কারের পরিকল্পনা। এমনি করেই এক সময় আবিষ্কৃত হয় তৃতীয় পর্যায়ের 'ভাবলিপি'।

(iii) ভাবলিপি (Ideogram)—এ প্রণালীতেও চিত্রলিপির ন্যায় অনেকগুলি বস্তু দ্বারাই বাক্য প্রকাশ করা হত। কিন্তু 'ভাবলিপি'-র বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল অঙ্কিত বস্তু যে ভাব সূচনা করে তা জ্ঞাপন করা। অর্থাৎ এখানে চিত্রলিপির মতো শুধুমাত্র স্থূল বস্তু-চিত্রই ব্যক্ত হত না, ব্যক্ত হত বস্তু চিত্রের সূক্ষ্মভাবও। যেমন—দিন ও রাত্রি বোঝাতে তারা অঙ্কন করত যথাক্রমে সূর্য ও তারকার চিত্র। অর্থাৎ অর্ধবৃত্তের নীচে তারকা চিহ্নের দ্বারা জ্ঞাপিত হত রাত্রি এবং দিন বোঝাতে অঙ্কিত হত অর্ধবৃত্তের নীচে সূর্যের চিহ্ন। কিন্তু এ পদ্ধতিটিও দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল না। কারণ সব চিত্রে সঠিক অর্থ প্রকাশ পেত না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বক্তব্য হত দুর্বোধ্য। অনেক সময় একই চিত্রের অর্থবোধেরও বিভিন্নতা ঘটত বিভিন্ন জনের কাছে। এভাবে সৃষ্টি হতে থাকল না।। অসুবিধার। এ কারণে অর্থের এই দুর্বোধ্যতাকে সহজ করার জন্য তারা তাদের চিন্তার প্রসার ঘটাল।

(iv) শব্দলিপি (Logogram)—ভাবলিপিতে অর্থের এই দুর্বোধ্যতা দূরীকরণের উপায়রূপে তারা উদ্ভাবন করে শব্দলিপি। নাম বা শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত সাঙ্কেতিক চিহ্নকে বলা হয় 'শব্দলিপি'। এ পদ্ধতিতে পূর্বেকার বস্তু চিত্রকে সংক্ষিপ্ত করে রূপান্তরিত করা হল একটি বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্নে। এ সাঙ্কেতিক চিহ্নের দ্বারা বস্তুকে বোঝাত না, বোঝাত বস্তুর নামকে। দ্বিতীয় পর্যায়ের 'চিত্রলিপি'তে যেমন পশু বোঝাতে অঙ্কিত হত পশুর চিত্র; শব্দলিপিতে তেমন কোন বস্তুর চিত্র অর্থাৎ পশু বোঝাতে পশুর ছবি অঙ্কিত হত না। এ ক্ষেত্রে পশুর চিত্রের পরিবর্তে ব্যবহৃত হত বিশেষ কোন চিহ্ন, যার সঙ্গে পশুর চিত্রের থাকত না কোন সাদৃশ্য।

'ভাবলিপি' পদ্ধতির অর্থবোধের কাঠিন্যকে সহজ করার নিমিত্ত 'শব্দলিপি' পদ্ধতির আবিষ্কার হলেও ধীরে ধীরে এ পদ্ধতিতেও অর্থবোধ হয়ে পড়ল কঠিনতর। এখানে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হত তাতে একটি চিহ্নের দ্বারা একটি শব্দের সকল অর্থ বোঝাত (অনেক ক্ষেত্রে একটি শব্দের থাকত অনেক অর্থ)। অর্থাৎ একাধিক অর্থসম্বলিত কোন শব্দের ক্ষেত্রে একটি চিহ্নের দ্বারা ঐ শব্দের কোন বিশেষ একটি অর্থকে না বুঝিয়ে বোঝাত সবগুলি অর্থকে। যেমন—অজ শব্দটি। অজ শব্দের অর্থ—ছাগল, ঈশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, জীবাত্মা, দশরথের পিতা, শ্রেষ্ঠ নর, মেষরাশি—কন্দর্প বা মন্মথ, চন্দ্র,

ধাতুবিশেষ, জন্মরহিত। যে কোন একটি চিহ্নের দ্বারা এই অজ এবং অজ শব্দের এই সবকয়টি অর্থকেই বোঝান হত। শুধু অজ শব্দ বা এর কোন বিশেষ অর্থকে বোঝাত না। এভাবে প্রতিটি শব্দের জন্য নির্দিষ্ট করতে হত একটি করে সাঙ্কেতিক চিহ্ন। কিন্তু বিরাট বিশ্বের অনন্ত শব্দরাশিকে এভাবে চিহ্ন দ্বারা বোঝানোও এক বিরাট সমস্যা বা অতীব কষ্টের বিষয়। এবং একজন মানুষের পক্ষে এতগুলি চিহ্নের অর্থ মনে রাখা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফলে এ পদ্ধতিও কালক্রমে হয়ে পড়ল অচল।

(v) স্বরলিপি (Syllabogram)—শব্দলিপির অসংখ্য চিহ্ন মনে রাখার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি হেতু পঞ্চম পর্যায়ে আবিষ্কৃত হল 'স্বরলিপি' পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে 'স্বর' অনুযায়ী সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার বিবেচিত হল। এ সাঙ্কেতিক চিহ্ন কোন শব্দের স্বরসমূহের সমষ্টিগতভাবে নয়, দেওয়া হত স্বরের সংখ্যানুযায়ী পৃথকভাবে। একটি পদ বা শব্দের মধ্যে যতগুলি স্বরই থাকুক না কেন প্রত্যেক স্বরের জন্য আলাদাভাবে একটি করে সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হত। যেমন—সূর্য। এ শব্দটিতে 'সূর্' স্বরের জন্য একটি এবং 'য' স্বরের জন্য আর একটি—মোট দু'টি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হত। তেমনি আকাশ শব্দে 'আ' একটি স্বর, 'কা' একটি স্বর ও 'শ' একটি স্বর—এই তিনটি স্বরের জন্য তিনটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন নির্দিষ্ট ছিল। এভাবে স্বরের সংখ্যানুযায়ী সাঙ্কেতিক চিহ্ন হল নির্ধারিত।

(vi) বর্ণলিপি (Alphabetic Writing)—বর্তমান সময় পর্যন্ত লিপির বিবর্তনের ইতিহাসে বর্ণলিপিই শেষ পর্যায়। অর্থাৎ গুহালিপি থেকে বিবর্তিত হতে হতে লিপি শেষ পর্যন্ত বর্ণলিপিতে এসে স্থিতি লাভ করেছে। এ পদ্ধতিতে যে সাঙ্কেতিক চিহ্ন উদ্ভাবিত হল তা ধ্বনি-নির্ভর। এ সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি দ্বারা ধ্বনি বর্ণিত হয় বলে এগুলিকে বলা হয় 'বর্ণ।'। ধ্বনির বৈচিত্র্যানুসারে যে-সব সাঙ্কেতিক চিহ্ন উদ্ভাবিত হল তা 'বর্ণমালা' এবং এর লিখন পদ্ধতি 'বর্ণলিপি' নামে আখ্যায়িত হলো।

গ. পৃথিবীর প্রধান প্রধান লিপিসমূহ

১. সিন্ধুলিপি
২. সেমিটিকলিপি
৩. সুমেরীয়লিপি
৪. মিসরীয়লিপি
৫. ব্রাহ্মীলিপি

১. সিন্ধুলিপি

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতাকে কেন্দ্র করে যে লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে সিন্ধু লিপি বলা হয়। এ লিপি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপিরূপে বিবেচিত।

১৯২১ ও ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপ খনন করে যে নগর আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে এ পর্যন্ত আড়াই হাজার শিলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে কোন শিল্যালিপি, স্তম্ভলিপি, প্রাচীরলিপি আবিষ্কৃত হয় নি। এই শীলমোহরগুলি চিত্রমূলক

হলেও তা চিহ্ন ভিত্তিক। পণ্ডিত গ্যাডলিক এই চিহ্ন আবিষ্কার করেন। তিনি শীলমোহরসমূহ গবেষণা করে তিনশত ছিয়ানব্বইটি নানাপ্রকার চিহ্নের আবিষ্কার করেছেন। এ লিপি নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিস্তর গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। অনুতাপের বিষয় এ লিপির সঠিক পাঠোদ্ধার এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। সিন্ধু লিপির আবিষ্কারের পূর্বে ধারণা করা হত ইরাণীয়, আরামীয়, ফিনিশীয় প্রভৃতি লিপি খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম-দশক শতকে ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছিল এবং এ থেকেই পঞ্চম শতকের দিকে ভারতের স্বীয় বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু সিন্ধু লিপির আবিষ্কারের ফলে এ ধারণার বিনাশ ঘটেছে। এখন নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করা যায়, ব্রাহ্মীলিপি কিংবা ফিনিশীয় লিপি থেকে নয়, এই সিন্ধু লিপি থেকেই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে লিপির উদ্ভব হয়েছে। অধ্যাপক ল্যাডন উৎপন্ন স্বরের ধ্বনিগত মূল্য প্রয়োগ করে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন সিন্ধুলিপি থেকেই ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছে।

২. সেমিটিক লিপি

সিন্ধু লিপির আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত সেমিটিক লিপি প্রাচীনতম লিপিরূপে প্রসিদ্ধ ছিল। 'নূহ' এর পুত্র শেম এর নামানুসারে তার বংশধরগণের ভাষা ও লিপির নাম রাখা হয়েছিল সেমিটিক লিপি। এর অন্য আর এক মত হল ফণিক রাজ সমতিকাস্ হতে সমিতিক বা সেমিটিক লিপির উদ্ভব হয়েছিল। সেমিটিক বর্ণ লিপির প্রথম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় ৪ হাজার বছর পূর্বে। এই লিপি দক্ষিণ হতে উত্তর বা বাম দিকে লিখিত হয়।

৩. সুমেরীয় লিপি

কীলকাকার লিপিকে সুমেরীয় লিপি বলা হয়। এই লিপি দেখতে কীলকের বা গোজের মত বলে এর এরূপ নামকরণ হয়েছে। এই লিপি মৃত্তিকা ফলকে উৎকীর্ণ করে অগ্নিতে দগ্ধ করে ইষ্টকে পরিণত করা হত। এই লিপির ক্রমবিবর্তন চিত্রলিপি থেকে স্বরলিপি পর্যন্ত লক্ষণীয়। এ লিপিতে বর্ণ লিপির কোন নিদর্শন নেই।

৪. মিসরীয় লিপি

হায়রোগ্লিফিক এবং ডেমোটিক লিপিকে মিসরীয় লিপি বলা হয়। প্রায় ৪ হাজার বছর পূর্বে মিসরে একই সঙ্গে দুই প্রকারের লিপি প্রচলিত ছিল। শিক্ষিত পুরোহিতগণের মধ্যে হায়রোগ্লিফিক লিপির প্রচলন ছিল এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ডেমোটিক লিপি প্রচলিত ছিল। মিসরীয় চিত্র লিপির পূর্বে প্রায় সব চিত্রলিপিতেই বস্তুর পরিপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হত। কিন্তু মিসরীয় চিত্রলিপিতে বস্তুর একাংশের চিত্র অঙ্কন করে সমগ্র বস্তুকে বোঝানো হত। যেমন—শুধুমাত্র মাথা অঙ্কন করে বোঝানো হত সম্পূর্ণ মানুষ।

৫. ব্রাহ্মীলিপি

অদ্যাবধি আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতবর্ষের আদি লিপি হচ্ছে ব্রাহ্মীলিপি। ব্রাহ্মীলিপি সম্পর্কে জৈনদিগের 'প্রজ্ঞাপনাসূত্র' নামক উপাঙ্গে বলা হয়েছে যে যার মাধ্যমে

অর্ধমাগধী ভাষা প্রকাশ করা যায় তা ব্রাহ্মীলিপি। যতদূর জানা গেছে এ লিপি ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সময় থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। শুধু প্রাচীন ভারতবর্ষের নয়, বর্তমানে প্রচলিত ভারতের প্রায় সব লিপিই ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত। এছাড়াও বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ (বার্মা) প্রভৃতি দেশে বর্তমানে যে-সব লিপি প্রচলিত সে-সবের প্রায় সবকটিই উদ্ভূত হয়েছে ব্রাহ্মীলিপি থেকে। আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহের পর্যালোচনায় জানা যায়, প্রাচীন লিচ্ছবিবংশ, নন্দবংশ, মৌর্যবংশ, চেতবংশ এবং শুঙ্গমিত্রবংশের শাসনামলে ব্রাহ্মীলিপিই প্রচলিত ছিল। মথুরা, সুরাষ্ট্র (সৌরাষ্ট্র) থেকে যে 'শকলিপি' আবিষ্কৃত হয়েছে তাও ব্রাহ্মীলিপির প্রকারভেদ। মোটকথা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমস্ত লিপিকেই ব্রাহ্মী সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। এবং এই ব্রাহ্মী লিপিই বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে নানা দেশীয় লিপিতে বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতীয় প্রায় সমস্ত লিপিতে পর্যবসিত হয়েছে। শুধু বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশ, স্থান ও পাত্র বিশেষে বিভিন্ন নামে হয়েছে পরিচিত। যেমন—অশোক লিপি, কুষাণলিপি, গুপ্তলিপি, কুটিল লিপি, উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় লিপি, বাংলালিপি, দেবনাগরীলিপি, অরৌরালিপি (সিন্ধু প্রদেশ), আসামীলিপি, উড়িয়ালিপি, ওঝালিপি (বিহারের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত), কণাড়ীলিপি, করাঢ়ীলিপি, কায়থীলিপি, গুজরাটিলিপি, গুরুমুখী লিপি (পাঞ্জাবে শিখদিগের মধ্যে প্রচলিত), গ্রন্থমলিপি (তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত), তামিল লিপি, তিব্বতলিপি, তুলুলিপি (মঙ্গলুরে), তেলেগু লিপি, থল (পাঞ্জাবের দেরাজাতে), দোগরীলিপি (কাশ্মীরে), নিমারী লিপি (মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত), নেপালী লিপি, পরাচীলিপি (ভেরায় প্রচলিত), পাহাড়ী লিপি (কুমাউন ও গড়বালে প্রচলিত), বনিয়া লিপি (শির্ষা ও হিসারে প্রচলিত) বহবলপুরী লিপি, বিশাতি লিপি, বড়িয়া লিপি, মণিপুরী লিপি, মলয়ালম (মালয়ালসম) লিপি, মারাঠী লিপি, মারবাড়ী লিপি, মূলতানী লিপি, মৈথিলীলিপি, মোড়ীলিপি, রোরীলিপি, লামাবাসী লিপি, লুণ্ডী লিপি (শিয়ালকোটে প্রচলিত), সরাফী বা শ্রাবকী লিপি (পশ্চিমা বণিয়ার মধ্যে প্রচলিত), সারিকা লিপি, সইসীলিপি, সিংহলী লিপি, শিকারপুরী লিপি, সিন্ধীলিপি ইত্যাদি।

ঘ. ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব ও নামকরণ

কোন সুদূর অতীতে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছিল তা আজ নিশ্চিতরূপে বলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। পিপ্রাবার স্তূপ এবং বলী গ্রাম থেকে এ লিপির দুটি নিদর্শন অর্থাৎ দুটি ছোট লেখ আবিষ্কৃত হওয়ার পর এ লিপি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে চলছে নানা গবেষণা। আবিষ্কৃত লিপি দুটি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর কোন এক সময়ে উৎকীর্ণ হয়েছে বলে গবেষকগণ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বহু গবেষণা করেও ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি বিষয়ে পণ্ডিত—গবেষকগণ ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেন নি।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, সম্ভবত প্রাচীন সেমিটিকলিপি থেকে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছিল। আবার কারো কারো মতে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছিল।

সিন্ধুলিপি থেকে। তাঁদের এরূপ মনে করার কারণ মৌর্যশিল্পকলার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার সাদৃশ্য। মৌর্যলিপি ব্রাহ্মীলিপির প্রথম বিবর্তিত রূপ। তাই এরূপ অনুমান অসমীচীন নয় যে পূর্বতন সিন্ধুলিপি থেকে অর্বাক্তন ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছিল। প্রাচীন সেমিটিক লিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছিল—এ মতের প্রবক্তা যাঁরা তাঁদের যুক্তি, সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থানের প্রাচীন লিপিও হয়েছিল বিলুপ্ত এবং পরবর্তী যুগে সেমিটিক প্রভাবে উদ্ভব হয় প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি ও খরোষ্ঠী লিপির। সিন্ধু লিপির মতো ব্রাহ্মীলিপিও চিত্রমূলক। বহু পণ্ডিত নানা গবেষণা করেও অদ্যাবধি সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার করতে সমর্থ হন নি। তা সত্ত্বেও অনেকের বিশ্বাস, এ লিপি চিত্রমূলক হলেও এতে নির্দশন আছে স্বরলিপির, এবং এরই ক্রমবিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই উদ্ভব হয়েছে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির। "অধ্যাপক ল্যাংডন সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন চিত্রলিপি হইতে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং উৎপন্ন স্বরের (অর্থাৎ এককালীন উচ্চারিত পদাংশের) বর্ণগুলিতে ধ্বনিগত মূল্য আরোপ করিয়াছেন।"[১] তিনি (ল্যাংডন) 'মহেঞ্জোদড়ো ও সিন্ধু সভ্যতা' নামক গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, সিন্ধুলিপির বর্ণমালা থেকেই অ, ই, ঈ, ও, ক, গ, ঘ, চ, জ, ট, ত, থ, প, ফ, ব, ম, য, ল, ব প্রভৃতি ব্রাহ্মী বর্ণের উদ্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত জেম্স্ প্রিন্সেপ নানা গবেষণার দ্বারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, গ্রীক লিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব হয়েছে। উইলিয়ম জোনস্ সাহেবের গবেষণা থেকে জানা যায়, ফিনিশীয়লিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব। দক্ষিণ সেমিটিক লিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি, এ মত রেখেছেন টেলর সাহেব এবং বেবর ও বুহ্লার সাহেব গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে উত্তর সেমিটিকলিপি থেকেই উৎপত্তি হয়েছে ব্রাহ্মীলিপির।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই মতগুলি খণ্ডন করে কেউ কেউ বলেছেন মূলত ব্রাহ্মীলিপির অক্ষরগুলি গ্রীক, ফিনিশীয়, সেমিটিক এ সবের কোনটি থেকেই উদ্ভূত নয়। "ফিনিশীয় বা গ্রীক্লিপির দুই একটি বর্ণের সহিত ব্রাহ্মীলিপির দুই-একটি বর্ণের আকস্মিক মিল দেখিয়া জেমস্ প্রিন্সেপ ও উইলিয়মস্ জোনস্ ব্রাহ্মীলিপির যেরূপ উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন তাহা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রাচীন ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইরাকের সেমিটিক জাতীয় বণিকগণ বাণিজ্য করিতে আসিত। ইহাতে বুহ্লার সাহেব মনে করেন যে, কালক্রমে উত্তর সেমিটিক লিপির ২২টি বর্ণের সহিত অন্যান্য লিপি হইতে প্রয়োজনীয় কতকগুলি বর্ণ যোগ করিয়া ব্রাহ্মী বর্ণমালার সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু বুহ্লার সাহেব তাঁহার 'ভারতীয় লিপিতত্ত্ব' (Indian Falacography) নামক পুস্তকে ফিনিশীয় লিপির ব্রাহ্মীলিপি পর্যন্ত যে ক্রমপরিবর্তন দেখাইয়াছেন উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং মধ্যবর্তী পরিবর্তনের স্তরগুলি তাঁহার নিজেরই অংকিত চিত্র, কোন প্রাচীন লিপি হইতে উদ্ধৃত নয়। এরূপভাবে নবীন ইংরেজী বর্ণমালা হইতেও কাল্পনিক পরিবর্তনের কয়েকটি চিত্র অংকিত করিয়া ব্রাহ্মীবর্ণমালার উৎপত্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে।"[২] সুতরাং ফিনিশীয়লিপির সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই। তাছাড়া ব্রাহ্মীলিপির বাম দিক থেকে ডান দিকে লেখার প্রণালীও অন্য কোন লিপির অনুকরণে প্রবর্তিত হয়নি। মূলত

এটা প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণের নিজস্ব সৃষ্টি এবং এক আশ্চর্য সুন্দর আবিষ্কার। সম্ভবত এর (ব্রাহ্মীলিপির) পরিপূর্ণতা এবং প্রাচীনতার জন্যই সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ব্রহ্মাকেই এর স্রষ্টা মনে করে একে বলা হয় ব্রাহ্মী। কিংবা শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণের ব্যবহৃত লিপি বলে একে বলা হয়েছে ব্রাহ্মীলিপি। এ মন্তব্যের সত্যতা আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রাচীন লিপি হল ব্রাহ্মীলিপি। এবং এ লিপি খ্রি. পূ. পঞ্চম শতাব্দী থেকেই প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যের আদি নিদর্শন বেদের রচনাকাল খ্রি. পূ. ৬০০০ বলে অনুমিত।[৩] যদিও খ্রি. পূ. ৫ম শতাব্দীর পূর্বের কোন ব্রাহ্মীলিপির নির্দশন এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তথাপি কেউ কেউ মনে করেন সেই খ্রি. পূ. ৬০০০ বৎসর পূর্বে যে বেদ লিখিত হয়েছিল তা হয়েছিল ব্রাহ্মী লিপিতেই।

বৈদিক যুগে যে সুসংবদ্ধ লিপি পদ্ধতির প্রচলন ছিল এবং শিক্ষাব্যবস্থাও যথার্থ উন্নত পর্যায়ে ছিল তার প্রমাণ দেয় বৈদিক সাহিত্যই। বেদের সূক্তগুলিতে সাহিত্যকৃতির যে নিদর্শন আছে তা শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে সম্ভব নয়।

বেদের বিভিন্ন সূক্ত থেকে জানা যায়, তখন জ্যোতিঃশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, সংখ্যালিপি প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। আর এইসব শাস্ত্রের ব্যবহার যে শুধু মুখে মুখে সম্ভব নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ বেদের যে ছয়টি অঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ)—বর্ণলিপি ছাড়া তার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অসম্ভব। বিশেষ করে বর্ণলিপি ব্যতীত ব্যাকরণ একেবারেই অকল্পনীয়।

কাজেই বেদ, সংহিতা ও তদন্তর্গত জ্যোতিষসিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করার জন্য অন্ততঃপক্ষে ৫০০০ বর্ষ পূর্বে বৈদিক বর্ণমালা ও কোন প্রকার লিপিপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এর পক্ষে "ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাস-লেখক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ শংকর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত জ্যোতিষিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে এখন হইতে প্রায় ৫ হাজার বর্ষ পূর্বের জ্যোতিষিক বিবরণ রহিয়াছে। সুতরাং শতপথ ব্রাহ্মণের কতকাংশ যে ঐ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শতপথ ব্রাহ্মণেরও বহু পূর্বে যজুঃসংহিতা এবং তাহারও বহু পূর্বে ঋক্ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রপণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক তৈত্তিরীয় সংহিতা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, বাসন্ত বিষুবদিন মৃগশিরা নক্ষত্র সংক্রমিত হইবার পূর্বে অর্থাৎ ৪০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ভারতীয় আর্যজাতির জ্যোতিষিক আলোচনা করিতেন এবং ঋক্‌সংহিতার প্রাচীনতর জ্যোতিষাংশ গণনা করিয়া দেখিলে স্থির হইবে যে, ৬০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কেবল মহামতি তিলক বলিয়া নহে, প্রসিদ্ধ জর্মন জ্যোতিষী ও পুরাতত্ত্ববিদ জ্যাকোবি (Jacobi) বেদের জ্যোতিষাংশ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুগণ ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে বা এখন হইতে প্রায় ৫০০০ বর্ষ পূর্বে ধ্রুব নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন" (বিশ্বকোষ)।[৪]

ঋগ্‌বেদে নানা প্রকার ছন্দের নাম ও প্রয়োগ আছে, যেমন—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী। এছাড়া ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ও বেদ সংহিতায় যে সব ছন্দের নাম ও প্রয়োগ দেখা যায় তা থেকে পরিচয় পাওয়া যায় অতি উন্নতমানের

লিখন পদ্ধতির। ঋগ্‌বেদে একাধিক বার অক্ষর শব্দের প্রয়োগ আছে। শুক্লযজুর্বেদেও অক্ষর শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন—'অক্ষরপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ পদপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো বিষ্টারপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ ক্ষুরভ্রশ্ছন্দোঃ' (১৫/৪)। ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও পরিষ্কারভাবে অক্ষর শব্দের উল্লেখ আছে। যেমন—"সেই অপর দুইটি ছন্দ (ত্রিষ্টুভ্‌ ও জগতী) গায়ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা যে যাহা পাইয়াছ তাহা আমাদের; সেই অক্ষর কয়টি আমাদের নিকট ফিরিয়া আসুক। গায়ত্রী বলিলেন—না, আমরা যে যাহা পাইয়াছি, তাহাই তাহার থাকুক। তখন তাঁহারা দেবগণের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। সেই দেবগণও বলিলেন—তোমাদের যে যাহা পাইয়াছ, তাহার তাহাই থাকুক। তখন গায়ত্রী আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের তিন অক্ষর ও জগতীর এক অক্ষর হইল ...।" ছান্দোগ্যোপনিষদ ও তৈত্তিরীয়োপনিষদেও অক্ষর, স্বর, স্বরের সম্বন্ধ, বর্ণ ও মাত্রার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "শতপথ ব্রাহ্মণের অগ্নিচয়ন প্রকরণে (১/৪/২/২২-২৫) ঋক্‌, যজুঃ ও সামবেদের ছন্দঃ ও অক্ষরের এবং সময়বিভাগে বর্ষ হইতে প্রাণ (= সেকেণ্ড) পর্যন্ত যেরূপ হিসাব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ছন্দ, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র ও লিখন কলায় পারদর্শী না হইলে কাহারও পক্ষে উহা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ইহা হইতে আরও প্রতীয়মান হয়, যিনি তিন বেদের অক্ষরসমষ্টির সংখ্যা এবং উহা হইতে গঠিত বৃহতী ও পঙ্‌ক্তি ছন্দের সংখ্যা বলিয়াছেন তাঁহার নিকটে অন্ততঃ সেই সময়ে উক্ত তিন বেদের লিখিত গ্রন্থ অবশ্যই ছিল এবং তিনি ছন্দঃশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্র ভালরূপেই জানিতেন।"৫ বেদের প্রাতিশাখ্যে লোপ-এর উল্লেখ আছে, যেমন—"লোপ উদঃ স্থাস্তম্ভোঃ সকারস্য" (অথর্ব প্রাতিশাখ্য ২/১/১, বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য ৪/৯৫, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ৫/১৪)। "অন্তস্থোষ্মাসু লোপঃ" (অথর্ব প্রাতিশাখ্য ৩/৩২, ঋক্‌ প্রাতিশাখ্য ৪/৫, বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য ৪/১, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ১৩/২)। বর্ণ যদি না থাকত তাহলে এই বর্ণলোপের প্রশ্নই উঠত না।

অতএব, সেই বৈদিক যুগে ছন্দ, অক্ষর, বর্ণ, মাত্রা, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতির চর্চা ছিল এবং এসব বিষয়ে অনেকেই পারদর্শী ছিলেন। যাঁরা সেই সময়ে এরূপ নানা বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন তাঁরা লিখতে পারতেন না কিংবা তাঁদেব লিপিজ্ঞান ছিল না এটা ভাবতে আমাদের যেন কেমন লাগে।

বৈদিক মন্ত্রপাঠের সঠিক উচ্চারণ বিষয়ে কঠিন বিধিনিষেধ ছিল, যার সামান্য ভুলে মন্ত্রের অর্থ বা ফল হত বিপরীত। এ প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি স্মর্তব্য ॥

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগবজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাৎ ॥

অর্থাৎ মন্ত্রের স্বর কিংবা বর্ণবিষয়ে যদি ত্রুটি থাকে তাহলে যথার্থ অর্থ জ্ঞাপনে অপারগতা হেতু তার প্রয়োগ হয় ব্যর্থ। সেই মন্ত্র বাক্যরূপ বজ্র হয়ে যজমানেরই ক্ষতির কারণ হয়।

অতএব লিপি না জেনে ব্রাহ্মণসাহিত্যের মত বড় বড় গদ্যগ্রন্থ রচনা এবং তা যুগ যুগ ধরে অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ রাখা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই বেদ শুধু শ্রুতিই নয়, তা গ্রন্থ হিসেবে লিখিত হত এবং এই লিখিত বেদই সামনে রেখে লিখিত হয়েছে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ।

বৈদিক যুগে এই লিখন পদ্ধতির যেমন প্রমাণ মেলে তেমনি তা কোন লিপিতে লিখিত হত প্রাচীন পণ্ডিতদের উক্তি—প্রত্যুক্তি থেকে তাও কিছুটা অনুমান করা যায়।

জ্যোতিস্তত্ত্বে বৃহস্পতির একটি উক্তি থেকে জানা যায়—

> ষান্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
> ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়াণ্যতঃ পুরা।

অর্থাৎ মানুষ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ভুলে যায়, তাই বিধাতা (ব্রহ্মা) পুরাকালে অক্ষর সৃষ্টি করে পত্রনিবন্ধ করেছিলেন। নারদ স্মৃতি থেকেও জানা যায়—

> নাকরিষ্যদ্ যদি ব্রহ্মা লিখিতং চক্ষুরুত্তমম্।
> তত্রেয়মস্য লোকস্য নাভবিষ্যৎ শুভা গতিঃ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা যদি লিখন সৃষ্টি না করতেন তাহলে লোকের গতি শুভ হত না। অতএব ব্রহ্মা কর্তৃক ব্যক্ত বলে সেই বর্ণমালা বা লিপির নাম হয়েছে ব্রাহ্মী। কথিত হয় বেদ সংকলনকালে বেদব্যাস এই ব্রাহ্মী লিপিই ব্যবহার করেছিলেন। এ হেতু বেদব্যাসকে ব্রাহ্মী লিপির প্রচারকও বলা হয়। ব্রহ্মাবর্তে প্রথম এই লিপি আবিষ্কৃত হয়, এ জন্যেও এ লিপির নাম হতে পারে ব্রাহ্মীলিপি। ব্রাহ্মীলিপি সম্পর্কে "অল্-বেরুনী ভারতীয় পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছিলেন যে, পরাশরপুত্র বেদব্যাসই বর্ণ লিপির উদ্ভাবয়িতা; জৈনদিগের মতে ঋষভদেব দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ১৮ প্রকার লিপি শিক্ষা দেন; তন্মধ্যে আদি লিপির নাম ব্রাহ্মী। ভাগবতের মতে ঋষভদেব ভগবানের অষ্টম অবতার (১/৩/১৩)। তিনি লোক, বেদ, ব্রাহ্মণ এবং গোসকলের পরমগুরু, তিনি সকল ধর্মের মূল গুহ্য ব্রাহ্মধর্ম (বেদ-রহস্য) ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রদর্শিত মার্গানুসারে শাখাদি উপায় অবলম্বন-পূর্বক সাধারণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। রাজর্ষি ভরত এই ঋষভদেবের পুত্র। তাঁহা হইতেই ভারতবর্ষের নামকরণ। তিনি ব্রহ্মাক্ষর জপ করিতেন (৫/৮/১১)" (বিশ্বকোষ)৬। মহাভারতের শান্তিপর্বের ১৮৮তম অধ্যায়ের পনের সংখ্যক শ্লোকে আছে ব্রাহ্মণ থেকেই বর্ণান্তর প্রাপ্ত চারি বর্ণেরই ব্রাহ্মীভাষা পূর্বকালে ব্রহ্মাকর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছে—

> চতুরশ্চত্বারঃ ব্রাহ্মী বেদময়ী চতুর্ণা—
> মপি বর্ণানাং ব্রহ্মণা পুর্ব্বং বিহিতা।
> লোভদোষেণতৃজ্ঞানতায় তমোভাবং গতাঃ
> শূদ্রা অনধিকারিণো বেদে জাতা ইত্যর্থঃ ॥

উপর্যুক্ত শ্লোক থেকে অনুমিত হয় যে, 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বেদ, আর ব্রাহ্মী শব্দের অর্থ বৈদিকী। সম্ভবত ঋষভদেবই ব্রহ্মবিদ্যার জন্য লিপি কৌশল উদ্ভাবন করেন।

বৈদিক যুগে যজ্ঞ কর্মে হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা ও ব্রাহ্মণ নামে ৪ জন পুরোহিতের প্রয়োজন হত। তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণই ছিলেন প্রধান। তাই কারো কারো মতে এই ব্রাহ্মণ

পুরোহিত কর্তৃক লিপি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে বলে তার নাম হয়েছে ব্রাহ্মী। তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, এ সকল যজ্ঞীয় প্রধান পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের কাছ থেকে শুনে ছাত্র ও শিষ্যগণ বেদের মন্ত্র বা অনুষ্ঠানের যে-সব ব্যাখ্যা লিখেছিলেন তাই আজ সবচেয়ে প্রাচীন ও সুসংবদ্ধ গদ্য বা ব্রাহ্মণসাহিত্য-রূপে সারা জগতে পরিচিত।

অতএব উক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরাকালে ব্রাহ্মীলিপি বলতে বৈদিক লিপিকেই বোঝাত।

ভারতীয় আর্যগণের আদি গ্রন্থ বেদ এবং আদি লিপি ব্রাহ্মীলিপি। এ দু'এর মধ্যে যোগসূত্র থাকাটাই স্বাভাবিক। অবশ্য লিপির ইতিহাসে অনির্ণীত প্রাচীন কাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত সময়টা অন্ধকার যুগ-রূপেই আমাদের কাছে পরিচিত। কেননা এই সময়ের কোন লিপিই আজ পর্যন্ত আমাদের হস্তগত হয়নি। তবুও আমরা নিরাশ হব না, হয়ত কোন মুহূর্তে আবিষ্কৃত হতে পারে কোন নতুন তথ্য, যা সমাধান আনবে মানুষের কৌতূহলী প্রশ্নের। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সমর্থনকারী অনেক প্রাচ্য পণ্ডিতের আশাব্যঞ্জক দৃষ্টি সিন্ধু লিপির প্রতি। সিন্ধুর চিত্রলিপি থেকে ব্রাহ্মীলিপি পর্যন্ত বিবর্তনের সময় কয়েক হাজার বৎসর। আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ মধ্যবর্তী সময়েরও কোন লিপির নিদর্শন যেমন আবিষ্কৃত হয়নি তেমনি সম্ভব হয়নি সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধারও। তাই আশা করা যায় সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে হয়ত সমাধান হবে লিপি সংক্রান্ত অনেক সমস্যার এবং অবসান ঘটবে এই অন্ধকার যুগের।

ঙ. ব্রাহ্মীলিপি থেকে দেবনাগরী ও বাংলা লিপির উদ্ভব

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে বাংলাসহ ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় সব লিপিই ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই ব্রাহ্মীলিপির ক্রমবিবর্তনের মধ্যদিয়ে কেমন করে নাগরী/দেবনাগরী ও বাংলা লিপিতে রূপান্তরিত হল তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি অনির্ণীত সুদূর প্রাচীনকালে হলেও খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেকার ব্রাহ্মীলিপির কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এই লিপির প্রথম বিবর্তন পরিলক্ষিত হয় অশোকলিপি বা মৌর্যলিপিতে। মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে সর্বত্র এই ব্রাহ্মীলিপির প্রচলন ছিল।

অশোকলিপি যে ব্রাহ্মীলিপির পরবর্তী স্তর বা ব্রাহ্মীলিপি থেকেই অশোকলিপির উদ্ভব তার প্রমাণ অশোকের পূর্ববর্তী সময়ের প্রাপ্ত পিপ্রাবার ও বলী নামক দু'টি ব্রাহ্মীলিপি। এ দু'টি লিপির সঙ্গে অশোকের লিপির কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। শুধু বলীর লেখায় যে ঈ-কারের মাত্রা চিহ্নের ব্যবহার আছে তা অশোক লিপিতে নেই, এবং পিপ্রাবার লেখায় দীর্ঘস্বরের কোন মাত্রা দেখা যায় না। এ ব্যতীত অশোকলিপি ও ব্রাহ্মীলিপির বর্ণ প্রায় একই রূপ। তাছাড়া "অশোকের পূর্ববর্তী জৈনদের সমবায়াঙ্গসূত্রে এবং পরবর্তী ললিত-বিস্তর গ্রন্থে ব্রাহ্মীলিপি ছাড়াও অনেক অনেক লিপির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ সকল লিপির কোনটির নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ইহার কারণ, প্রাচীনকালেই ব্রাহ্মীলিপির ক্রমোৎকর্ষে এই সকল লিপি একের পর এক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং অশোকের সময়কার ব্রাহ্মীলিপি উহাদের স্থান অধিকার করিয়া

লইয়াছে বলিয়া মনে হয়।"[৭] ভারতীয় লিপি-বিশারদ বুহ্লার সাহেব তাঁর Indian Palacography নামক পুস্তকে লিপি সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—"এত স্থানীয় ভেদ, এত অসংখ্য দ্রুত লিখিত হস্তলিপি দ্বারা যে-কোন ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় যে, অশোকের সময় লিপির একটি দীর্ঘ ইতিহাস ছিল এবং সেই সময় ভারতীয় বর্ণমালা একটি পরিবর্তনের অবস্থায় ছিল।"[৮] তাছাড়া ব্রাহ্মীলিপির যে প্রাচীনতম নিদর্শন পিপ্রাবারলিপি তা অশোকলিপি অপেক্ষা প্রাচীনতর। যাহোক এই ব্রাহ্মীলিপি খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০ অব্দের নিকটবর্তী সময় থেকে ১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিতই ছিল এবং এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এটি 'অশোকলিপি' বা 'মৌর্যলিপি' নামে পরিচিত ছিল।

ভারতবর্ষে দুই প্রকার অশোকলিপি পাওয়া গেছে। এক প্রকার লিপি লিখিত হত দক্ষিণ দিক থেকে বাম দিকে এবং অপর প্রকার লিপি লিখিত হত বাম দিক থেকে দক্ষিণ দিকে। এ সময়ের মধ্যে (৩৫০-১০০ খ্রি. পূ.) লিখিত ২৬ (ছাব্বিশ)-টি লিপি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি মৌর্যবংশীয় সম্রাট অশোকের ধর্ম প্রচার ও অনুশাসন সংক্রান্ত লিপি। এই লিপিগুলি অশোক-প্রাকৃত, অশোকব্রাহ্মী, মৌর্যলিপি, লাটলিপি বা অশোক লিপি নামেও আখ্যায়িত।

অশোক বা মৌর্য লিপিকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—প্রাচীন মৌর্যলিপি ও অর্বাচীন মৌর্যলিপি।

বুহ্লার সাহেব প্রথমে প্রাচীন মৌর্যলিপিকে উত্তরী ও দক্ষিণী এ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে বলেছেন—এলাহাবাদ, পডেরিয়া, রামপুর্‌বা, রাধিয়া, মাথিয়া প্রভৃতি স্থানের স্তম্ভে এবং কালসি, বৈরাট, সহস্রাম প্রভৃতি স্থানের পর্বত গাত্রে বা চটানে, বরাবর গুহায়, সাঁচী ও সারনাথের স্তম্ভে খোদিত রাজার অনুশাসন বিষয়ক লিপিগুলি উত্তরী বর্ণমালার এবং গিরনার, ধৌলি, জৌগড় প্রভৃতি স্থানের প্রস্তর গাত্রে খোদিত লিপিগুলি দক্ষিণী বর্ণমালার নিদর্শন। পরে তিনি উত্তরাঞ্চলীয় প্রাচীন মৌর্যলিপির প্রকারভেদ লক্ষ্য করে 'প্রাচীন উত্তরী' লিপিকে পুনরায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—(১) উত্তর পূর্বাঞ্চলীয়, (২) উত্তর মধ্যাঞ্চলীয় ও (৩) উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয়। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অনুশাসনলিপিগুলি হচ্ছে—এলাহাবাদ, রামপুরা, নিগলিবা, পডোরিয়া, রাধিয়া, মাথিয়া ও সারনাথে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পাটনায় আবিষ্কৃত মৃত্তিকা নির্মিত শিলমোহর, বৈরাট ও সহস্রামের অনুশাসন-বিষয়ক শিলালিপি, সাঁচী ও মিরাটের স্তম্ভলিপি এবং বরাবরের গুহালিপি। তৃতীয় শ্রেণীর লিপিগুলি হচ্ছে—কালসির শিলালিপি এবং অগথোকলস্‌ ও লন্টালিয়ন নামক গ্রীকদেশীয় রাজার মুদ্রালিপি।

অর্বাচীন মৌর্য লিপিকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা—(১) খ্রিস্টপূর্ব ২০০ অব্দের দশরথের নাগার্জুনী গুহালিপি, (২) খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দের ভারহুৎ স্তূপের তোরণ, প্রাচীর-স্তম্ভ ও দরজার চৌকাঠে খোদিত লিপি, (৩) উত্তর প্রদেশের খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দের পভোস লিপি, (৪) মথুরার প্রাচীনতম খোদিত লিপি, (৫) খ্রিস্টপূর্ব ১৬০ অব্দের কলিঙ্গের খারবেলের হাতীগুম্‌ফা-লিপি, (৬) অন্ধ্র প্রদেশের খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ অব্দের নানাঘাট লিপি এবং (৭) বুদ্ধ-গয়ার মহামন্দিরের প্রাচীর স্তম্ভের উপর খোদিত লিপি।

দশরথের নাগার্জুনী গুহালিপি থেকে বুদ্ধ-গয়ার লিপি প্রায় ৫০ বৎসরের পরবর্তী সময়ের বলে বিবেচিত। মূল বাংলা লিপির উদ্ভবের সূচনা এই গুহালিপিগুলির বিশেষত্ব থেকেই।

ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে যে লিপির নাম পাওয়া যায় তা কুষাণলিপি। খ্রিস্টাব্দ ১০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই লিপির সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে। এই তিন শত বৎসরের মধ্যে লিখিত যে-সব লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে সে সবের অধিকাংশ এবং প্রধান প্রধান লিপিগুলিই কুষাণ বা কুষানবংশীয় কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি রাজগণের। এ হেতু এই সময়ের ব্রাহ্মীলিপিকে বলা হয় কুষাণলিপি। কুষাণলিপিতে খোদিত তারিখ সাধারণত শকাব্দ বলে গণ্য। তবে এই সন তারিখ সম্বন্ধে দুটি মত প্রচলিত। এক—কুষাণলিপির তারিখ সূচনা করে খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ অব্দে রাজা কণিষ্ক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মালব বিক্রমাব্দের। দুই—কুষাণলিপির তারিখ বলতে বুঝতে হবে ৭৮ খ্রিস্টাব্দের রাজা কণিষ্ক কৃর্তক প্রতিষ্ঠিত শকাব্দ বলে। খ্রিস্টপূর্ব ১ম ও ২য় শতাব্দীর কুষাণলিপি অধিকাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে। পরবর্তীকালে এ যুগের অনেক খোদিত লিপি পাওয়া গেছে উত্তর পূর্বাঞ্চলে।

কুষাণ যুগের শেষ অধ্যায়ের পূর্বাঞ্চলীয় বর্ণমালার কোন নিদর্শন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কুষাণ লিপির কতগুলি বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে নাগরীলিপির সাদৃশ্য লাভ করেছে, যেমন—উ, ব, এ, প, ল, ষ, ঐ, য। এই লিপির চ ও ঢ বাংলা বর্ণের চ ও ঢ এর অনুরূপ। কুষাণ লিপির কতকগুলি বর্ণের বিভিন্ন রূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত, যেমন—'ই' বর্ণের তিনটি বিন্দুর স্থলে তিনটি সমান্তরাল রেখা (= —) সৃষ্টি হয়েছে এবং অপর প্রকার 'ই' বর্ণের স্থানে দুটি সমান্তরাল রেখার ডানপাশে একটি লম্বা রেখা (=।) ব্যবহৃত হয়েছে। মূর্ধণ্য 'ণ'—বর্ণের পরস্পর বিভিন্ন পাঁচটি রূপ ব্যবহার করা হয়েছে। 'ন'—বর্ণের দ্বিতীয় রূপে মধ্যভাগে একটি গোলাকার গ্রন্থি উৎপন্ন হয়েছে। কোন কোন স্বরযুক্ত বর্ণে 'আ'-কারের মাত্রা সমান্তরালভাব পরিবর্তন করে ধারণ করেছে ঊর্ধ্বদিকে তির্যক্ ও ডানদিকে বক্রভাব। 'ই-কার ও 'ঈ'-কারের মাত্রার মূল চিহ্ন হেলে পড়েছে বাম দিকে বক্র হয়ে। কুষাণ লিপিতে কতকগুলি বর্ণ অবিকল রূপে ব্রাহ্মী বর্ণের সাদৃশ্য রক্ষা করেছে, যেমন—ছ, জ, থ, ধ, ট, ঠ প্রভৃতি বর্ণ। আবার কতকগুলি বর্ণের মাত্রা সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করেছে, যেমন—ক, চ, ঝ, ড, দ, ন, প, য, ষ প্রভৃতি বর্ণ।

প্রাচীন মৌর্যলিপির উত্তরী ও দক্ষিণী লিপির প্রকারভেদ কুষাণ বংশীয় রাজাদের সময় থেকে অধিকতর প্রকট হওয়ার জন্য ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তনে কুষাণ লিপির পরে এর স্থান হয়েছে। ৩৫০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে উত্তরী লিপির ধারা ৪০০ খ্রিস্টাব্দে গুপ্তলিপিতে বিবর্তিত হয়েছে। এবং একই সময় থেকে (৩৫০ খ্রি.) দক্ষিণী লিপি বিবর্তিত হয়েছে পশ্চিমী (৫০০-৯০০ খ্রি.) মধ্য প্রদেশী (৫০০-৯০০ খ্রি.), তেলেগু কনড়ী (৫ম খ্রি. থেকে), গ্রন্থমলিপি (৭ম খ্রি. থেকে), কলিঙ্গলিপি (৭ম থেকে ১১শ খ্রি.), তামিল লিপি (৭ম খ্রি. থেকে), বট্টেলুত্তুলিপি (৭ম খ্রি. থেকে), নন্দী নাগরী (৭ম খ্রি. থেকে) প্রভৃতি লিপিতে।

উত্তরীলিপির পরবর্তী গুপ্তলিপি ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্টীয় ৪র্থ থেকে ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। গুপ্তবংশীয় রাজগণকর্তৃক এ লিপি প্রচারিত হওয়ায় এর

নাম হয়েছে গুপ্তলিপি। গুপ্তযুগের পূর্ব থেকে শুরু করে ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতে প্রচলিত পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় নামক বর্ণমালার দুটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। Dr. Buhler S Prof. Bhanderkar-এর মতে এ দুটি প্রকারভেদের মূলসূত্র ম, শ, স, ল এবং হ এই পাঁচটি বর্ণের পার্থক্য। মনে করা হয়, উত্তর ভারতে প্রচলিত এই পূর্বাঞ্চলীয় বর্ণমালায় খোদিতলিপি থেকে বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি হয়েছে। এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় শাখা ও মধ্যভারতীয় বর্ণমালা থেকে উৎপত্তি হয়েছে নাগরীলিপির।

গুপ্তযুগের আগেই পশ্চিমাঞ্চলীয় বর্ণমালার প্রভাবে পূর্বাঞ্চলীয় বর্ণমালার পার্থক্য বিলীন হয়ে গিয়েছিল। শেষে পঞ্চম খ্রিস্টাব্দের ৪র্থ দশক থেকে শুরু করে ষষ্ঠ খ্রিষ্ট্যাব্দের পূর্বে পশ্চিমাঞ্চলীয় বর্ণমালা পূর্বাঞ্চলীয় বর্ণমালাকে পরাভূত করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

গুপ্ত যুগের উল্লেখযোগ্য লিপিগুলি হচ্ছে গুপবংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদের স্তম্ভলিপি, উদয়গিরি, মিহরোলী, বিলসদ, করগাগ্রা ও কুডার শিলালিপি এবং মহারাজ লক্ষ্মণ ও জয়নাথের দানপত্র। এ সব লিপির কোন কোন অক্ষর ব্রাহ্মীলিপির আকৃতি থেকে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান নাগরী ও বাংলা অক্ষরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অক্ষরের শিরচিহ্নগুলি ক্ষুদ্রাকৃতির পরিবর্তে হয়েছে লম্বাকৃতি। স্বরের প্রাচীন মাত্রাচিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে এবং এই প্রাচীন মাত্রাচিহ্নের স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে নতুন রূপ।

নাগরীবর্ণের আকৃতি-ধারণকৃত বর্ণগুলি হচ্ছে ড, ঢ, ত, দ, প, ভ, ষ, স, গ ইত্যাদি এবং বাংলা বর্ণের আকৃতির ন্যায় বর্ণ হচ্ছে জয়নাথের দানপত্রের ই ও গ বর্ণ।

বুহলার সাহেব গুপ্ত যুগে উত্তর ভারতে তিন প্রকার বর্ণমালার প্রচলনের কথা বলেছেন। যেমন—

১. পূর্বাঞ্চলীয় বর্ণমালা—ল, হ, ষ ও স বর্ণের বিশেষ আকৃতিগত বর্ণ।
২. পশ্চিমাঞ্চলীয় বর্ণমালা—এর অক্ষরগুলি গোলাকৃতি ও দ্রুত একটানা লেখা।
৩. পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রকারভেদ—এ শ্রেণীর অক্ষরগুলি কোণবিশিষ্ট ও লম্বভাবের।

ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তনের ইতিহাসে এর পরবর্তী অর্থাৎ পঞ্চম স্তরে যে লিপির নাম পাওয়া যায় তা হল কুটিল লিপি। কুটিললিপি কোন রাজবংশের দ্বারা প্রভাবিত নয়। রাজবংশের প্রভাব ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ৬ষ্ঠ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে যে বিভিন্ন লিপির উদ্ভব হয়েছে সামগ্রিকভাবে সে সবই কুটিল নামে অভিহিত। এই লিপির অক্ষর ও স্বরের মাত্রা অনেকটা কুটিলাকৃতির। এ জন্য এই লিপির নাম কুটিল লিপি রাখা হয়েছে বলে অনুমিত। ৬ষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ থেকে নবম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে এই কুটিল লিপির প্রচলন ছিল।

উত্তর ভারতীয় যে পূর্বাঞ্চলীয় লিপি গুপ্তযুগে গুপ্তলিপিতে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল ৬ষ্ঠ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে কুটিল লিপিতে তা পুনরায় স্বাধীনভাবে আত্মবিকাশ লাভ করতে থাকে। পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রকারভেদ আর কখনও এই পূর্বাঞ্চলীয় প্রকারভেদের বিকাশকে সংকুচিত বা স্তিমিত করতে পারেনি। "পরবর্তীকালে গুর্জ্জর প্রতিহার রাজগণের সময় পূর্বাঞ্চলীয় প্রকারভেদের উপর পশ্চিমাঞ্চলীয় নাগরী বর্ণমালার প্রভাব বর্ধিত হইতে থাকিলে পূর্বাঞ্চলীয় বর্ণমালা পুনরায় পূর্ব ও পশ্চিমী নামক দুইটি শাখায় বিভক্ত হয় এবং

কালক্রমে এই পশ্চিমী শাখার বর্ণমালা নাগরীলিপির সহিত মিশিয়া যায়। এই পূর্বী শাখার বর্ণমালা প্রাচীন যুগের পূর্বাঞ্চলীয় বর্ণমালা হইতে পৃথক এবং ইহাই স্বাধীনভাবে বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়া কালক্রমে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মূল বাঙলা বর্ণমালায় পরিণত হয়।"৯

ব্রাহ্মীলিপি থেকে নাগরী ও বাংলা লিপির উদ্ভব প্রক্রিয়ায় কুটিল লিপি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এ লিপির অধিকাংশ অক্ষর, স্বরের মাত্রা আধুনিক নাগরী ও বাংলা লিপির আকারে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ এই লিপিই একাধিক শাখায় বিবর্তিত হয়ে নাগরী ও বাংলা লিপির উৎপত্তি ঘটিয়েছে।

নাগরী লিপির কোন কোন বর্ণের সঙ্গে পূর্ববর্তী কুষাণ লিপির কোন কোন বর্ণের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তবে নাগরী লিপির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় গুপ্তযুগে (খ্রিস্টীয় ৪র্থ কিংবা ৫ম শতাব্দী) নান্দী-সূত্রে। এর পরে কুটিল লিপির সময়ে অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দীতেও নাগরী লিপির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী থেকে নাগরী লিপির উল্লেখযোগ্য বিকাশ লক্ষণীয় এবং খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে নাগরী লিপি মোটামুটিভাবে একটি পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করে। দশম শতাব্দীর নাগরী লিপিতে কুটিল লিপির মতো অ, আ, ঘ, প, ম, য, ষ, স-বর্ণগুলির ঊর্ধ্বাংশ দুইভাবে বিভক্তরূপে দৃষ্ট হয় এবং একাদশ খ্রিস্টাব্দ থেকে দেখা যায়, নাগরী লিপির এই বিভক্ত দুই অংশ মিলিত হয়ে অক্ষরগুলির মাথায় সৃষ্টি করেছে একটি সমতল রেখা বা মাত্রা। নাগরী লিপির এই মাত্রাত্মক বৈশিষ্ট্য বর্তমান সময় পর্যন্তও সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয়ে আসছে। অতএব, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নাগরীলিপির বিবর্তনকে সীমাবদ্ধ করা যায়। কারণ এই সময় নাগরীলিপি যে আকার ধারণ করেছে বর্তমান সময়েও আমরা প্রায় সেই আকারই দেখছি। অর্থাৎ খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর নাগরীলিপি বর্তমান নাগরীলিপির সঙ্গে বেশীর ভাগই সামঞ্জস্যপূর্ণ। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পূর্ণরূপে বর্তমান নাগরীলিপির উদ্ভব হয়েছে বলে ধরা হয়। শুধু 'ই' ও 'ধ' বর্ণের ব্যবহারে প্রাচীন রীতিই দৃষ্ট হয় এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে এ, ঐ, ও, ঔ বর্ণের ব্যবহারে প্রাচীন রীতিই দৃষ্ট হয় এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে এ, ঐ, ও, ঔ বর্ণের মাত্রা যুক্ত করতে কখনও তির্যকরেখা কখনও বা ঊর্ধ্বদিকে লম্বরেখা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিলালেখাদিতে এবং খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত হস্তলিখিত গ্রন্থে এ চারটি স্বরের মাত্রার এই প্রকার রীতি বা রূপ পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত নাগরীলিপি প্রায় একইরূপে চলে এলেও লিখন পদ্ধতিতে অর্থাৎ অক্ষর ও মাত্রার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এ পার্থক্য ঘটেছে দেশ বা স্থান ভেদে বিভিন্ন লেখকের হাতে বা খোদকের অভিরুচিক্রমে। তবে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে মুদ্রা যন্ত্র প্রচলিত হওয়া পর্যন্ত নাগরীলিপির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নি।

উত্তর ভারতীয় বর্ণমালার পূর্বাঞ্চলীয় প্রকারভেদের পূর্বী বিভাগের বর্ণমালা থেকে অর্থাৎ কুটিললিপি থেকে উৎপত্তি হয়েছে মূল বাংলা বর্ণলিপির। খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে

নবম শতাব্দী পর্যন্ত এই কুটিললিপি প্রসার লাভ করেছিল স্বাধীনভাবেই। কিন্তু খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে দেবনাগরী বর্ণমালার প্রভাবে কিছুটা পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। এই পরিবর্তিত বর্ণমালা আত্মপ্রকাশ করেছে বিনায়ক পালের তাম্রফলকে খোদিত দান পত্রে। এভাবে এটা গুর্জ্জরপ্রতিহার শাসনামলে প্রবেশ লাভ করে তদানীন্তন বাংলাদেশে। পরবর্তী সময়ে প্রথম মহীপালের সময় থেকে শুরু করে দেবনাগরী বর্ণমালার প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং দশম শতাব্দীর শেষপর্বে মূল বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব হয়। এই বর্ণমালার প্রথম নিদর্শন দেখা যায় কম্বোজের রাজা নয়পালদেবের ইর্দার দানপত্রে এবং প্রথম মহীপালের বাণগড়ের দানপত্রে। এই লিপির প্রসার শুরু হয় খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। বিজয় সেনের দেবপাড়ার খোদিত লিপিতে এই বর্ণমালার অধিক প্রসার দৃষ্ট হয়। এর পরে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বাংলা বর্ণমালা আরও প্রসার লাভ করে প্রায় বর্তমান বর্ণমালার স্তরে উন্নীত হয়েছে। এই সময় উত্তর ভারতে মুসলিম রাজত্ব শুরু হওয়ার পর পূর্বাঞ্চলীয় সকল বর্ণই আধুনিক বাংলা বর্ণমালার আকারে রূপান্তরিত হয়। পূর্বভারতে মুসলমান বিজয়ের ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা কিছুকাল (খ্রি. ১৩শ-১৪শ শতক) ব্যাহত হয়। সঙ্গত কারণেই লিপির ব্যবহারও যায় স্তিমিত হয়ে। এর পরে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে স্বাধীন সুলতানদের অনুপ্রেরণা এবং বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বা বৈষ্ণবধর্মে উদ্দীপ্ত কবি-সাহিত্যিকরা অসংখ্য অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে বাংলার বর্ণমালার তেমন কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এর পরে খ্রিস্টীয় ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা বর্ণমালার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। অতএব, খ্রিস্টীয় দ্বাদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা লিপির উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মীলিপি, অশোকলিপি, কুষাণলিপি, গুপ্তলিপি ও কুটিললিপির নমুনা-চিত্র এবং কুটিললিপি থেকে নাগরী ও বাংলালিপির ক্রম-বিবর্তনের ধারা প্রদর্শিত হল।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর : সংস্কৃত বর্ণমালার ইতিহাস, পৃ. ৪৫।
২. রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর : প্রাগুক্ত পৃ. ৭১।
৩. বেদের রচনাকাল নিয়ে নানা মতভেদ আছে। সে সবের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন হচ্ছে— খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ এবং খ্রী পূঃ ৫০০ অব্দ। তবে ডঃ যোগীরাজ বসু বিস্তৃত গবেষণার পর খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ অব্দ বেদের রচনা কাল বলে মত প্রকাশ করেছেন। অতএব, তাঁর সিদ্ধান্তটিই এখানে গৃহীত হল।
৪. শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু (সংকলিত), সপ্তদশ ভাগ, কলিকাতা,১ ৩১৩, পৃ. ৫৮৬-৫৮৭।
৫ রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।
৬ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪-৫৯৫।
৭ রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।
৮ ঐ. পৃ. ১১৬।
৯ রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর, প্রাগুক্ত, প. ১৩৪

ব্রাহ্মীলিপি (অনির্ণীত কাল)	অশোকলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৩৫০-১০০)	কুষাণলিপি (খ্রীঃ ১০০-৩০০)	গুপ্তলিপি (খ্রীঃ ৪০০-৫০০)	কুটিললিপি (খ্রীঃ ৬০০-৯০০)

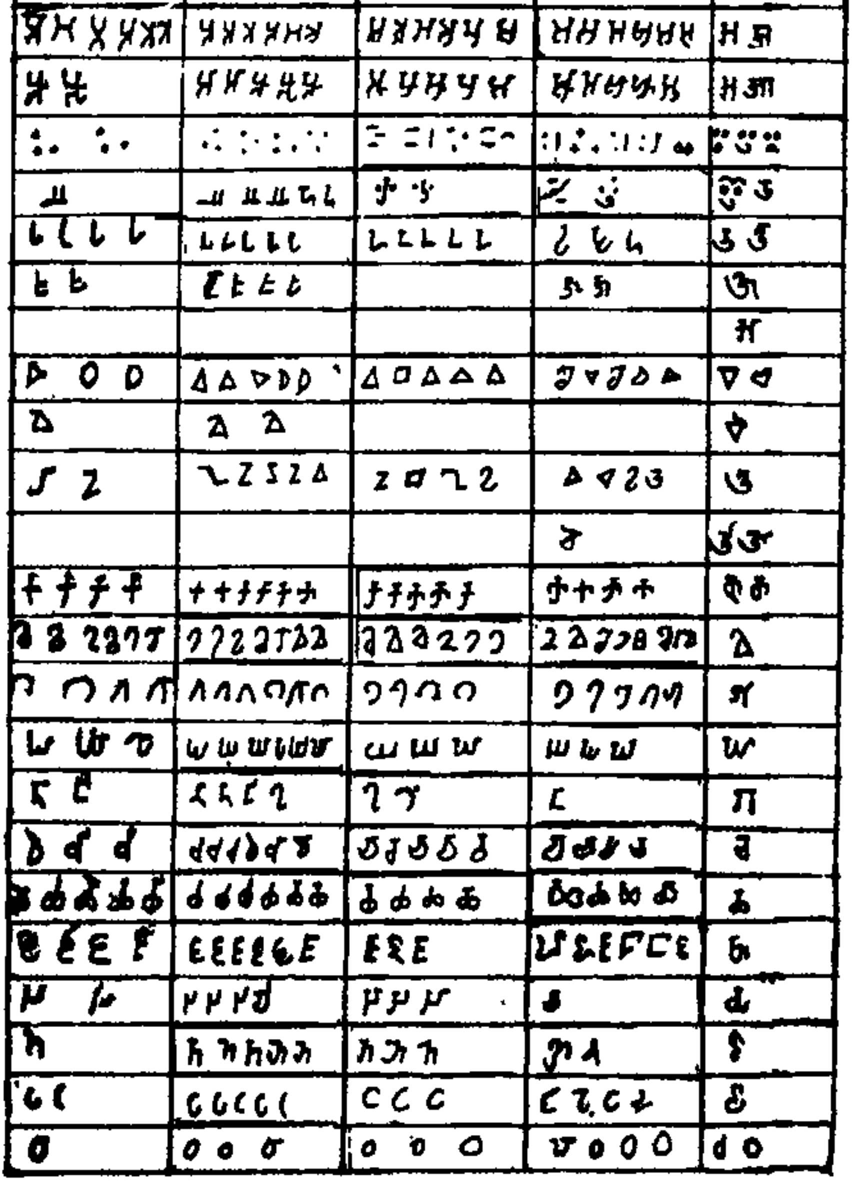

দশম খ্রীঃ
একাদশ খ্রীঃ
দ্বাদশ খ্রীঃ
ত্রয়োদশ খ্রীঃ
চতুর্দশ খ্রীঃ
পঞ্চদশ খ্রীঃ
ষোড়শ খ্রীঃ
সপ্তদশ খ্রীঃ
বর্তমান নাগরী
अ, अ
इ
ई
उ
ऊ
ऋ
ए
ऐ
ओ, ओ
औ, औ
क
ख
ग
घ
ङ
च
छ
ञ
झ
ट
ठ

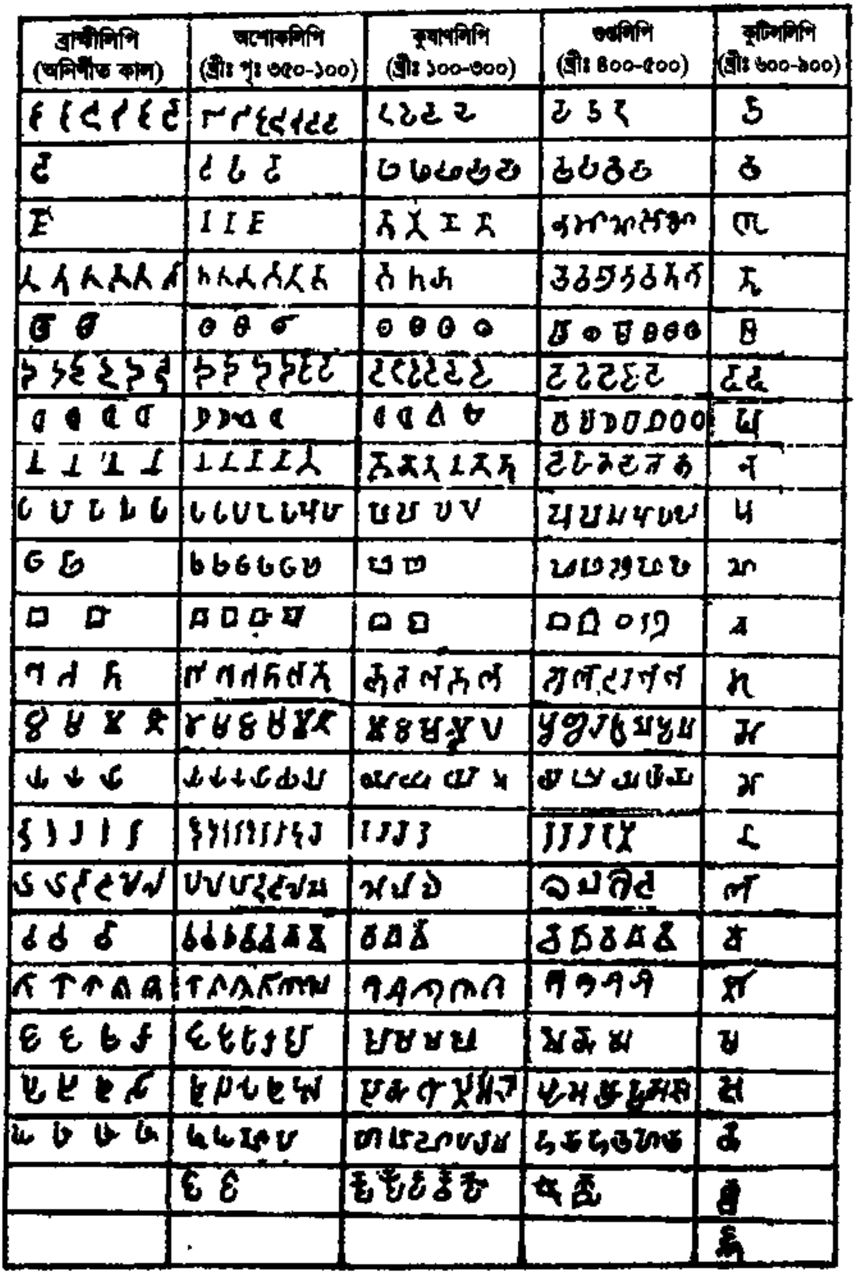
ব্রাহ্মীলিপি (অনির্ণীত কাল)
অশোকলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৩৫০-১০০)
কুষাণলিপি (খ্রীঃ ১০০-৩০০)
গুপ্তলিপি (খ্রীঃ ৪০০-৫০০)
কুটিললিপি (খ্রীঃ ৬০০-৯০০)

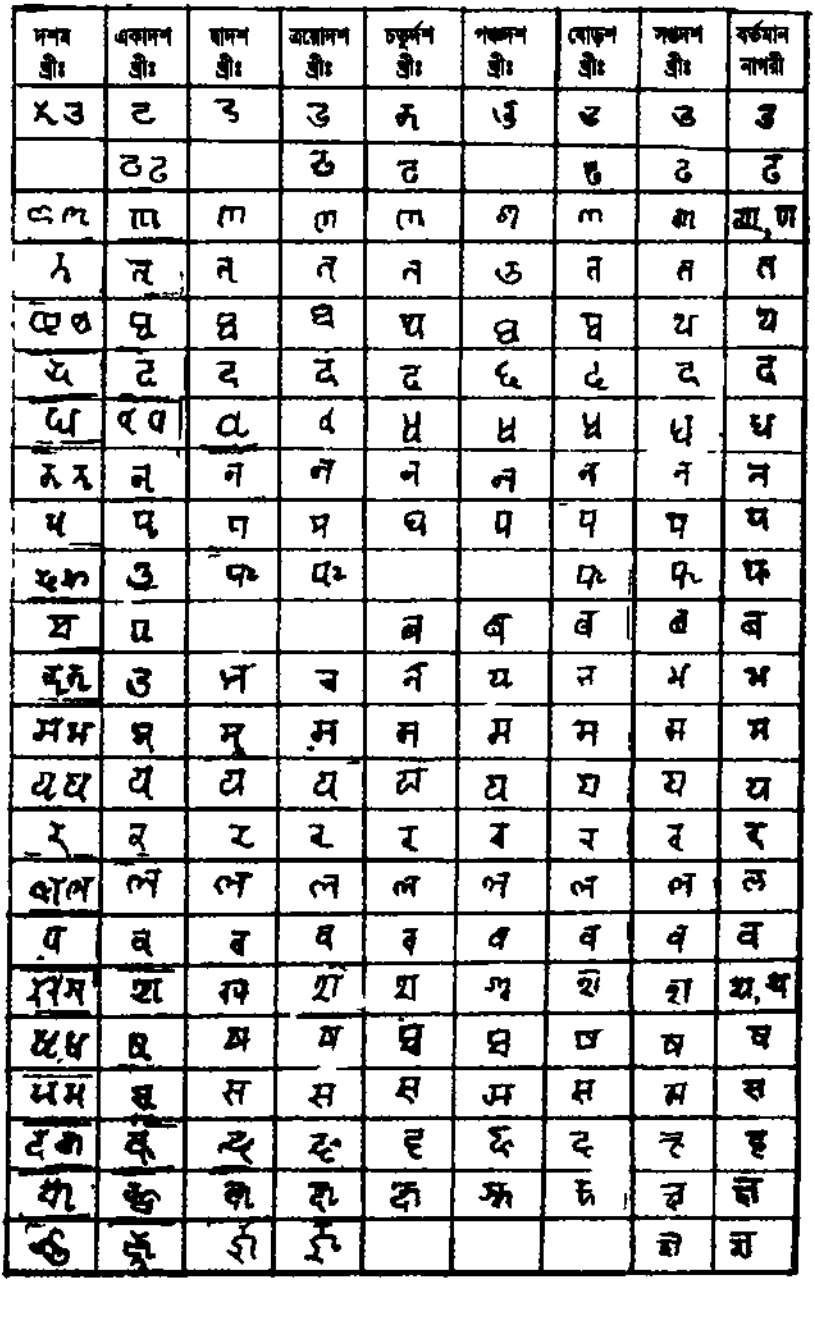
দশম খ্রীঃ
একাদশ খ্রীঃ
দ্বাদশ খ্রীঃ
ত্রয়োদশ খ্রীঃ
চতুর্দশ খ্রীঃ
পঞ্চদশ খ্রীঃ
ষোড়শ খ্রীঃ
সপ্তদশ খ্রীঃ
বর্তমান নাগরী

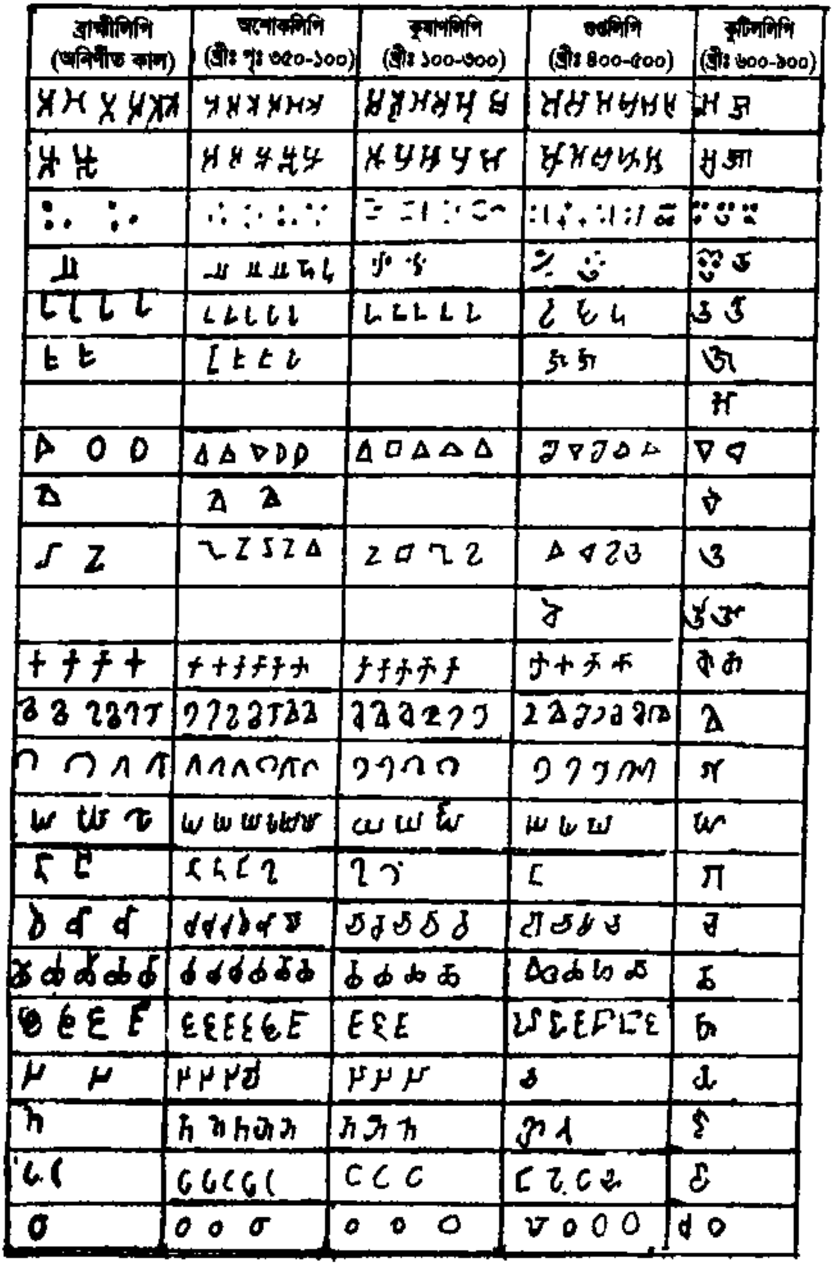
ব্রাহ্মীলিপি (অনির্ণীত কাল)
অশোকলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৩৫০-১০০)
কুষাণলিপি (খ্রীঃ ১০০-৩০০)
গুপ্তলিপি (খ্রীঃ ৪০০-৫০০)
কুটিললিপি (খ্রীঃ ৬০০-৯০০)

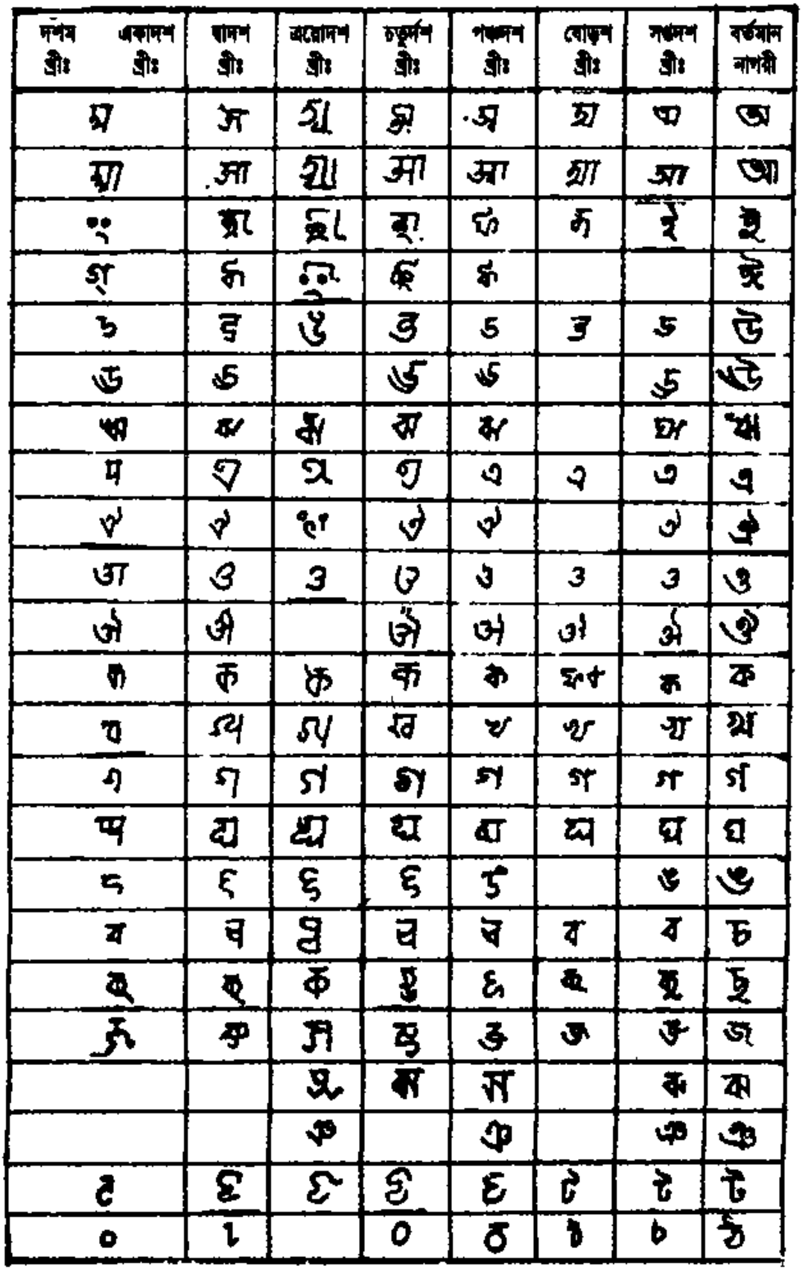
দশম খ্রীঃ
একাদশ খ্রীঃ
দ্বাদশ খ্রীঃ
ত্রয়োদশ খ্রীঃ
চতুর্দশ খ্রীঃ
পঞ্চদশ খ্রীঃ
ষোড়শ খ্রীঃ
সপ্তদশ খ্রীঃ
বর্তমান নাগরী
অ
আ
ই
ঈ
উ
ঊ
ঋ
এ
ঐ
ও
ঔ
ক
খ
গ
ঘ
ঙ
চ
ছ
জ
ঝ
ঞ
ট
ঠ

ব্রাহ্মীলিপি (অনির্ণীত কাল)	অশোকলিপি (খ্রীঃ পূঃ ৩৫০-১০০)	কুষাণলিপি (খ্রীঃ ১০০-৩০০)	গুপ্তলিপি (খ্রীঃ ৪০০-৫০০)	কুটিললিপি (খ্রীঃ ৬০০-৯০০)

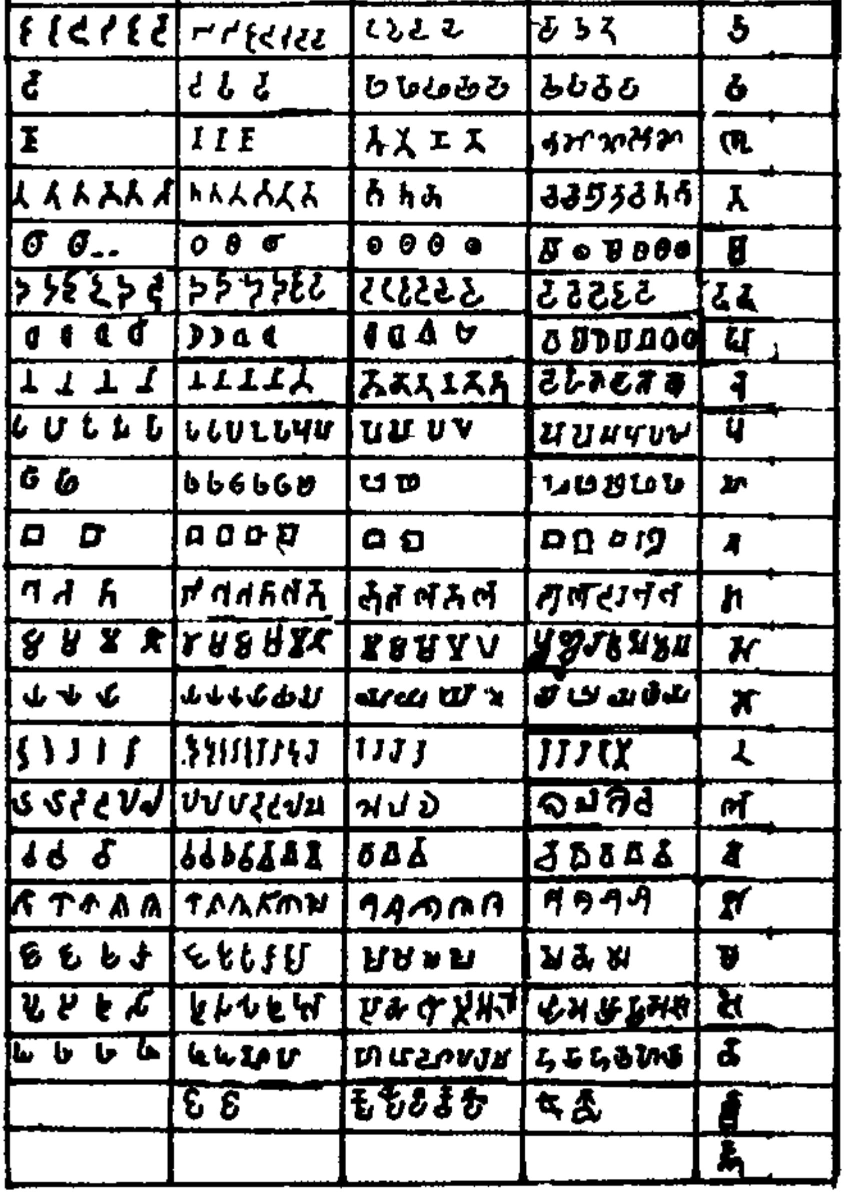

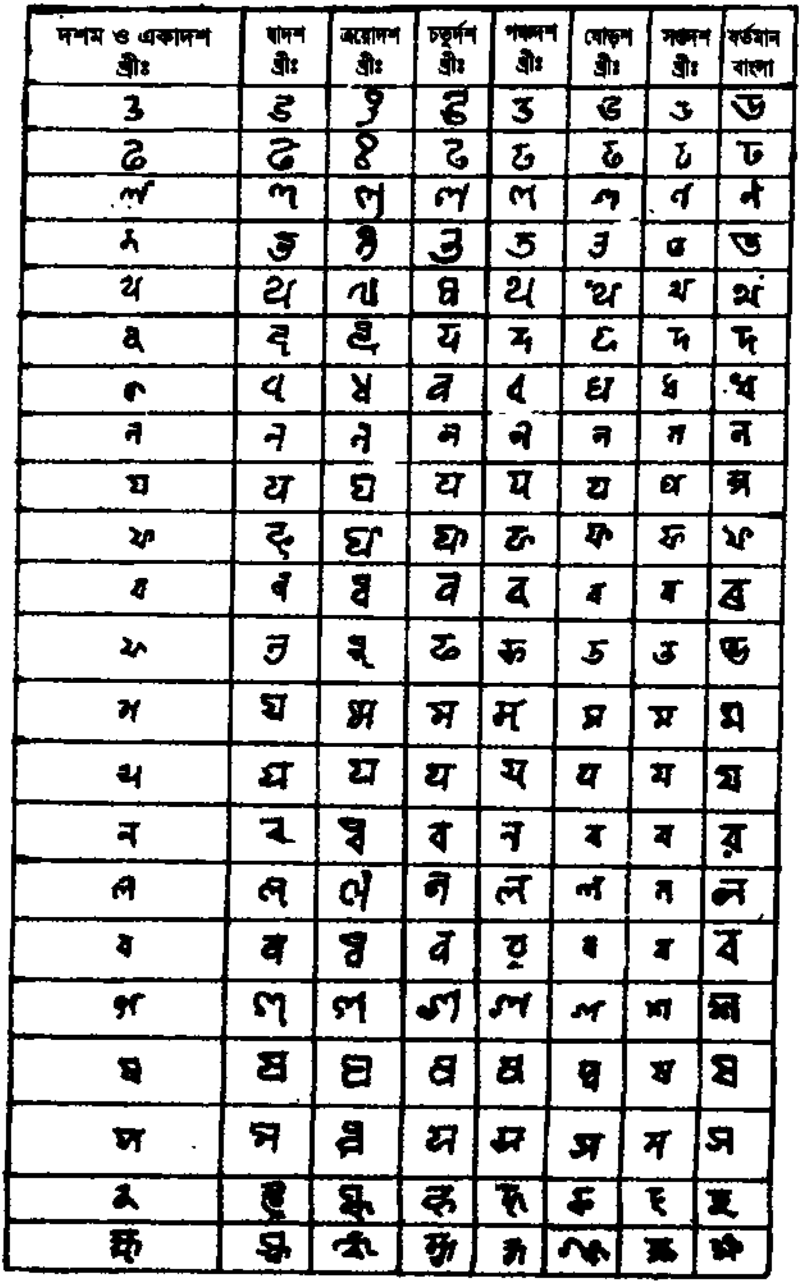
দশম ও একাদশ খ্রীঃ
দ্বাদশ খ্রীঃ
ত্রয়োদশ খ্রীঃ
চতুর্দশ খ্রীঃ
পঞ্চদশ খ্রীঃ
ষোড়শ খ্রীঃ
সপ্তদশ খ্রীঃ
বর্তমান বাংলা

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

ক. পরিচিতি

লিপির উদ্ভবের পর থেকে প্রাচীন সাহিত্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায় তা সবই হাতে লেখা। হস্তলিখিত এই সাহিত্যকৃতি যুগানুসারে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন যুগে একে বলা হত পুস্তক। পুস্তক শব্দ এসেছে পোস্ত বা পুস্ত শব্দ থেকে। পোস্ত শব্দের অর্থ চামড়া। চামড়া অর্থাৎ পোস্ত-এর উপর প্রথম লেখা হত বলে প্রাচীন যুগে সাহিত্যকৃতিকে বলা হত পুস্তক। পুস্তক সংস্কৃত শব্দ। এই পুস্তক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয় 'পুথি' শব্দ।

প্রাচীন যুগের পুস্তককেই মধ্যযুগে বলা হত পুথি। অর্থাৎ পুথি এবং পুস্তক শব্দ সমার্থক। মধ্যযুগের শুরুতে বেদ থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যকৃতিকে পুথি বলা হত। এই সময় পুস্তককে গ্রন্থ নামেও অভিহিত করা হত। গ্রন্থ শব্দটি এসেছে গ্রন্থি থেকে। পুথির মাঝখানে ছিদ্র করে রজ্জুদ্বারা একে গ্রন্থিবদ্ধ করে আঁটসাঁটভাবে বাঁধা হত বলে একে বলা হত গ্রন্থ। মধ্যযুগে পুথি শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে এ শব্দটিরও প্রচুর ব্যবহার ছিল।

মধ্যযুগের শেষ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে পুথি শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সময় বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের রচিত কাব্যগ্রন্থ, যেমন—রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান জাতীয় কাব্য : ইউসুফ—জোলেখা, সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল, লায়লী—মজনু, গুলে বকাউলি ইত্যাদি; যুদ্ধ সম্পর্কিত কাব্য : জঙ্গনামা, আমীর হামজা, সোনাভান, কারবালার যুদ্ধ ইত্যাদি; পীর পাঁচালী : গাজী-কালু-চম্পাবতী, সত্য পীরের পাঁচালী প্রভৃতি পুথি সাহিত্য নামে পরিচিত। এই সময় বঙ্গদেশে বিভিন্ন ভিনদেশী রাজনৈতিক উত্থান পতনের ফলে বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাংলা ভাষায় হয় অনুপ্রবিষ্ট। বিশেষ করে মুসলিম শাসনামলে অধিকাংশ শিক্ষিত জন এবং চাকুরীজীবী ফার্সী ভাষা অভ্যাস করে। এরই প্রভাবে এই সময় রচিত গ্রন্থসমূহে আরবী, ফার্সী প্রভৃতি

ভাষার শব্দের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ফলে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রচুর ব্যবহারের জন্য এই শ্রেণীর কাব্যকে কেউ কেউ দোভাষী পুথি নামেও অভিহিত করেছেন। মাহ্‌বুবুল আলম তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—"অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরবী-ফারসী শব্দ মিশ্রিত এক ধরনের বিশেষ ভাষারীতিতে যে-সব কাব্য রচিত হয়েছিল তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পুথি সাহিত্য নামে চিহ্নিত হয়েছে। এই পুথি সাহিত্যের ভাষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : আরবী, ফার্সী, হিন্দী শব্দের বাহুল্যপূর্ণ ব্যবহার, আরবী, ফার্সী শব্দের নাম ধাতুরূপে ব্যবহার এবং হিন্দী ধাতুর প্রয়োগ, অনুসর্গ ও উপসর্গরূপে বাংলা ও আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের প্রয়োগ, ফারসী বহুবচনে ব্যবহার, পুলিঙ্গে বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি।" কাজেই দেখা যাচ্ছে, পুথি শব্দের মূল যে-অর্থ 'হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ' তা থেকে মধ্যযুগের শেষভাগে ব্যবহৃত 'পুথি' শব্দের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। পুথি শব্দের এরূপ দ্যোতনা অষ্টাদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ হস্তলিখিত যে কোন প্রাচীন গ্রন্থই পুথি-এ অর্থে 'পুথি' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

'পাণ্ডুলিপি' পুথি শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত। 'পাণ্ডুলিপি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল [পাণ্ডু (পণ্ড্‌ + উ—কর্মবা)—শুক্লপীতবর্ণ বা ধূসর বর্ণ লিপি (লিপ্‌ + ই কর্মবা) লিখিত পত্রাদি] ধূসর বর্ণের লিখিত পত্রাদি। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দেখা যায় অধিকাংশ বস্তুই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে পাণ্ডুর বা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। সেই সুদূর প্রাচীন যুগে পশুচর্ম, ভূর্জপত্র, তালপত্র, গাছের বাকল প্রভৃতি বস্তু সাহিত্যকৃতির বা লেখার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হত। অনুমান করা হয়, এই সব উপাদানকে লেখার উপযোগী হিসেবে তৈরী করতে প্রথমে কিছুটা শুকিয়ে নিতে হত। আর তখন তা দেখতে হত অনেকটা তামাটে বর্ণের। পরে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে এই সব উপাদান সম্পূর্ণরূপেই ধারণ করত পাণ্ডুবর্ণ। সম্ভবত পরবর্তী সময়ে এই সব পাণ্ডুবর্ণের গ্রন্থের অনুকরণ বা প্রভাবে লেখার উপাদান হিসেবে হাতে তৈরি তুলট কাগজের রঙও করা হত পাণ্ডু বর্ণের। প্রাচীন গ্রন্থাদি এরূপ পাণ্ডু বর্ণের উপাদানে লিখিত হত বলেই একে বলা হয় পাণ্ডুলিপি।

পাণ্ডুলিপি শব্দটি কোন সময় থেকে প্রথম ব্যবহৃত হয়ে আসছে তা নির্দিষ্ট করে বলা দুষ্কর। তবে অনুমিত হয়, এ শব্দটির প্রচলন হয়েছে এদেশে ইংরেজদের আগমনের পরে। ইংরেজী Manuscript শব্দের অর্থ হস্তলিখিত গ্রন্থ বা দলিল অথবা ছাপানোর জন্য হস্তলিখিত বা টাইপ করা লিপি, অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি। এখানে (ইংরেজী Manuscript-এর ক্ষেত্রে) থাকে না রঙের কোন বাধ্যবাধকতা। অর্থাৎ ভারতীয় পাণ্ডুলিপির যে বৈশিষ্ট্য এবং যার জন্য এগুলোকে বলা হয় পাণ্ডুলিপি সেই পাণ্ডুবর্ণের উপাদানের লেখা না হলেও তা পাণ্ডুলিপি নামে আখ্যায়িত। এ অর্থের সাদৃশ্যে ভারতীয় সব প্রাচীন হাতে লেখা গ্রন্থ হয়ে গেছে পাণ্ডুলিপি। অর্থাৎ বাংলা পাণ্ডুলিপি ও ইংরেজী Manuscript এ দুটো শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই আধুনিক যুগে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে একই সঙ্গে পাণ্ডুলিপি শব্দটিকে যে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় তা নিম্নরূপ :

১. পাণ্ডুবর্ণের উপাদানে লিখিত গ্রন্থকে পাণ্ডুলিপি বলা হয়।
২. কলের কাগজ প্রবর্তনের পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাদা কলের কাগজে অনেক গ্রন্থ হাতে লিখিত হয়েছে। তাও পাণ্ডুলিপি নামে পরিচিত।
৩. ইংরেজী Manuscript শব্দের অর্থানুসারে ছাপানোর উপযোগী করে তৈরি করা লেখকের হাতে লেখা অথবা টাইপ করা খসড়াকেও পাণ্ডুলিপি বলা হয়।
৪. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বাংলায় মুদ্রণযন্ত্র প্রবর্তনের পর থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত যে-সব গ্রন্থ পাণ্ডুলিপির আকারে ছাপা হয়েছে বর্তমানে সেগুলিকেও পাণ্ডুলিপি মনে করা হয়।[১]
৫. যে-কোন প্রাচীন গ্রন্থ, দলিল-পত্রাদি সবই পাণ্ডুলিপি নামে পরিচিত।

এসব পাণ্ডুলিপি যে-কোন উপাদানে লিখিত হতে পারে। চামড়া, ভূর্জপত্র, তালপত্র, কদলীপত্র, গাছের বাকল, পাণ্ডুবর্ণের তুলটকাগজ, পাণ্ডুবর্ণের মিলের কাগজ, সাদা বর্ণের মিলের কাগজ, নীল ও হলুদ বর্ণের মিলের কাগজ ইত্যাদি উপাদানে উনবিংশ শতাব্দীতে হাতে লেখা অথবা টাইপ করা অথবা ছাপানো গ্রন্থ বা তার প্রতিলিপি প্রভৃতি সবই পাণ্ডুলিপি নামে অভিহিত। আর এ সবের সংরক্ষণ-স্থানকে বলা হয় পাণ্ডুলিপি শাখা বা বিভাগ।

প্রাচীন কালে ব্যবহৃত সংস্কৃত 'পুস্তক' শব্দটি 'বই' অর্থে বর্তমানেও প্রচলিত। মধ্যযুগের 'গ্রন্থ' শব্দটিও 'বই' অর্থে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু 'পুথি' ও 'পাণ্ডুলিপি' শব্দ দুটি মধ্যযুগে যে অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাক না কেন, বর্তমানে তা ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'পুথি' শব্দের মূল অর্থ 'হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক' আর পাণ্ডুলিপি শব্দের অর্থ 'পাণ্ডু বা ধূসর বর্ণের উপাদানে হস্ত লিখিত লিপি।' এ দুটি শব্দের মূল অর্থের মধ্যে ব্যবধান থাকলেও বর্তমানে দুটি শব্দ একই অর্থে বা প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ হাতে লেখা যে-কোন প্রাচীন গ্রন্থকেই এখন পুথি বা পাণ্ডুলিপি বলে ধরা হয়।

খ. পাণ্ডুলিপির আকার

বিধিবদ্ধ কোন নিয়মে পাণ্ডুলিপির আকৃতি কিংবা প্রকৃতি নির্ণীত না হওয়ায় এর আকার নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট কোন রূপরেখার বিন্যাস ঘটানো কখনোই সহজসাধ্য নয়। যুগে যুগে এক শতাব্দ থেকে অন্য শতাব্দে কালের বিবর্তনে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রুচি, উপকরণের প্রাপ্তি ইত্যাদি ভেদে পাণ্ডুলিপির আকারে-প্রকারে ঘটেছে বিভিন্নতা। কেবল বহুকালের ব্যাপক পরীক্ষা আর গভীর নিরীক্ষার সরণি অতিক্রম করে এ বিষয়ে হয়তো কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

আকৃতির দিক থেকে পাণ্ডুলিপিসমূহকে মোটামুটিভাবে বৃহৎ, মধ্যম ও ক্ষুদ্র এ তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। বৃহৎ আকারের পাণ্ডুলিপির পরিমাপ

সাধারণত ৭৮.৫ × ৪ সে.মি.[২] থেকে ৫২ × ১৩.৫ সে.মি.[৩]। মধ্যম আকারের পাণ্ডুলিপির পরিমাপ ৪৮.৫ × ১৯ সে.মি.[৪] থেকে ২০ × ১৩.৫ সে.মি.[৫] এবং ক্ষুদ্র আকারের পাণ্ডুলিপির পরিমাপ ১৭.৫ × ৬.৫ সে.মি.[৬] থেকে ৫.৫ × ২.৫ সে.মি.[৭]-এর মধ্যে হয়ে থাকে। পাণ্ডুলিপির আকারের এই তারতম্যের কারণ কিন্তু একাধিক। এ কারণগুলিকে নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে—

(i) লেখার উপকরণ বা উপাদানভেদে ঘটেছে পাণ্ডুলিপির আকারের তারতম্য। যেমন—তালপত্র, কদলীপত্র (কলাপাতা), তেরেটপত্র ও ভূর্জপত্রে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলি সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতির হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক কারণেই তাল-পত্রের প্রশস্ততা কম হওয়ায় পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে এর দৈর্ঘ্যকেও রাখতে হয়েছে স্বল্প। কারণ তালপত্রে প্রণীত পাণ্ডুলিপি বেশি লম্বা হলে ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা ও সম্ভাবনা থাকে বেশি। তাই বুদ্ধি ও রুচির ভিন্নতায় এর আকারও হয়েছে বিভিন্ন। কদলীপত্রে ও ভূর্জপত্রে লেখা পাণ্ডুলিপির আকৃতি সর্বাধিক ক্ষুদ্র। কদলীপত্র যেমন পাতলা তেমন এর দৈর্ঘও কম। এজন্য ইচ্ছে করলেও লেখার এই উপাদানটিকে বড় করা সম্ভব হয় নি। তেরটপত্র তালপত্রের প্রায় সদৃশ হলেও তালপত্র থেকে তেরেটপত্রের প্রশস্ততা একটু বেশি। ফলে তেরেট-পত্রে প্রণীত পাণ্ডুলিপির আকারও হয়েছে কিছুটা প্রশস্ত।

বিভিন্ন গাছের বাকল এবং সুপারী গাছের খোলে লেখা পাণ্ডুলিপি উপরিউক্ত বিভিন্ন পত্র থেকে সাধারণত বৃহৎ আকৃতির। এগুলি প্রাকৃতিক কারণেই বৃহৎ ও সুদৃঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী। ফলে এই পাণ্ডুলিপির আকৃতিও হয়েছে কিছুটা বৃহৎ এবং প্রশস্ত।

তবে বৃহৎ ও অধিকতর প্রশস্ত আকৃতির যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তার প্রায় সবই লেখা তুলট কাগজে। এর কারণটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। অর্থাৎ উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন উপাদানের মতো তুলট কাগজ কোন প্রকৃতি-নির্ভর উপাদান নয়। নানা প্রকারে দেশীয় উপাদানের সাহায্যে এগুলি তৈরি হত মানুষের হাতেই। যে কারণে সৃষ্টিশীল মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী এগুলি বড় ছোট করতে পেরেছে। তাই বলা চলে যে আকৃতিগত দিক থেকে বিভিন্ন পত্রে প্রণীত পাণ্ডুলিপি থেকে গাছের বাকলে প্রণীত পাণ্ডুলিপি কিছুটা বৃহৎ এবং বৃহত্তর তুলট কাগজের পাণ্ডুলিপি। এ আলোচনায় উদাহরণে প্রতিফলিত নিয়মের ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে মোটামুটিভাবে এরূপ একটি সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

(ii) বিষয় ভেদেও পাণ্ডুলিপির আকারের তারতম্য ঘটেছে। একই উপকরণ হওয়া সত্ত্বেও কেবল বিষয়ের বিভিন্নতায় পাণ্ডুলিপির আকারের যে তারতম্য হত তার দৃষ্টান্তও অপ্রতুল নয়। একই তুলট কাগজে কোন সুদীর্ঘ বিষয় অবলম্বনে লিখিত হয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির পাণ্ডুলিপি। যেমন—রামায়ণ, পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত পাণ্ডুলিপি বৃহদায়তন বিশিষ্ট, পরিমাপ ৫২ × ১৩.৫

সে.মি.[৮]; অপরদিকে মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত পাণ্ডুলিপি ক্ষুদ্র অবয়বী, পরিমাপ ১০.৫ × ৯.৫ সে.মি.[৯]। বিষয়ভেদে পাণ্ডুলিপির আকারের এই তারতম্য সব উপকরণেই কিছুনা-কিছু পরিদৃষ্ট, তবে তুলট কাগজের ক্ষেত্রে এর কিছুটা আধিক্য। এর কারণ হল, তুলট কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপির সংখ্যা বেশি এবং প্রাচীন সাহিত্যের সব ধরণের বিষয়ই লেখা হয়েছে এই উপকরণে। সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় হলো তালপত্রের পাণ্ডুলিপি। এখানে উল্লেখ্য, গবেষণালব্ধ তথ্যে দেখা যায়, খ্রিস্টীয় ১৭ শতকের পরবর্তী পাণ্ডুলিপিগুলি সাধারণত বৃহদাকৃতির হয়েছে। এর কারণ নির্দিষ্টভাবে বলা সহজসাধ্য না হলেও এটুকু বলা যায় যে লিপিকরদের রুচি ও মানসিকতার পরিবর্তন'এ ক্ষেত্রে অনেকখানি ক্রিয়াশীল।

(iii) লেখার আকৃতি ভেদেও পাণ্ডুলিপির আকারের তারতম্য পরিলক্ষিত। ক্ষুদ্র আকৃতির অক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপির আকার তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রতর; অপরদিকে লেখার অক্ষর বড় হলে পাণ্ডুলিপির আকারও হয়েছে বড়। অর্থাৎ বৃহৎ আকারের যে-সমস্ত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার হাতের লেখার অক্ষরগুলিও সাধারণত বৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট। একই শতকের বিভিন্ন লেখার মধ্যেও পাণ্ডুলিপির আকারের এই পার্থক্য পরিদৃষ্ট। উদাহরণ হিসেবে পনের শতকের তিনটি পাণ্ডুলিপির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—'মহাভারত'[১০]-এর পাণ্ডুলিপিটিতে লিখিত অক্ষরগুলি এবং এর বিষয় বৃহৎ হওয়ায় পাণ্ডুলিপির আকারও হয়েছে বৃহৎ। 'সারদাতিলক'[১১] পুথিটির বিষয় তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র হওয়ায় লিখিত অক্ষরগুলিও ক্ষুদ্র এবং এ কারণে এর আকৃতিও ক্ষুদ্র। এবং উল্লেখ্য, অন্য আর একটি পাণ্ডুলিপি 'অমরকোষ'[১২] যার অক্ষর এবং আকার খুবই ক্ষুদ্র। সুতরাং বলা চলে যে বিষয় এবং অক্ষর অনুযায়ী পাণ্ডুলিপির আকারের তারতম্য ঘটেছে।

এতক্ষণ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি সাহিত্যের বিষয় সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির আকৃতি আলোচিত হল। এবার বিভিন্ন দলিলপত্রের আকার সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক। এটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত যে সেই প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দলিলের শ্রেণীতে রয়েছে একটা স্বাতন্ত্র্য। প্রাচীন থেকে প্রাচীনতর পাণ্ডুলিপির পাতা আমরা যত পেছনের দিকে ওলটাতে থাকি ততই দেখা যায় যে এর আকৃতি হয়েছে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, এবং এ কথা প্রযোজ্য দলিল-পত্রের ক্ষেত্রেও। অবশ্য আমার এ বক্তব্যের ভিত্তি কেবল জ্ঞাত তথ্য, সুপ্রাচীন কালের অনেক নিদর্শন এখনও আমার অপরিজ্ঞাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-সংগ্রহে গাছের বাকলে লিখিত খ্রি. সতের শতকের যে দলিল পাওয়া গেছে তা আকারে ক্ষুদ্র। সতের শতকের দলিল গাছের বাকল থেকে তুলট কাগজেই বেশি লেখা হত বলে ধারণা করা যায়। তবে দলিলের আকার হত ক্ষুদ্র। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ও বেশির ভাগ দলিল তুলট কাগজে লেখা হত এবং তা আকারে হয়েছে ক্ষুদ্র। আওরঙ্গজেবের সময়ের একটি

দলিলের আকার ১৬ × ১৫ সে.মি[১৩]। এর পরবর্তীকালে তুলট কাগজের দলিল ক্রমে বৃহদাকৃতির হতে থাকে। এবং এর আকার ৪০ × ২০ সেন্টিমিটারে এসে স্থিতি লাভ করে। উনিশ শতকে ব্রিটিশ আমলে লেখা দলিল-পত্র তুলট কাগজ ছেড়ে মিলকাগজে রূপ পরিগ্রহ করে, যা বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচলিত।

গ. পাণ্ডুলিপির লিখন উপকরণ

ভারতবর্ষের লিখন পদ্ধতির ক্রম-বিবর্তন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সীলমোহর, তাম্রফলক, ধাতবপাত, পাথর, পশুচর্ম, কাষ্ঠফলক, ইট, কার্পাসকাপড় প্রভৃতি উপকরণে লিখন প্রচলিত ছিল। তবে বর্তমানে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলি দেখা যায় তালপত্র, ভূর্জপত্র, তেরেটপত্র, কদলীপত্র, বৃক্ষবল্কল, তুলটকাগজ, হাতে তৈরি পাতলা কাগজ প্রভৃতি উপাদানে প্রস্তুত। পরবর্তী সময়ের এই সমস্ত পাণ্ডুলিপিই এখানে আলোচনার বিষয়। এ নিয়ে চলছে সমগ্র বিশ্বে বিস্তর আলোচনা ও গবেষণা।

১. লেখপত্র

লেখপত্র সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে ছ হাজার বছরেরও আগে। চীন দেশে খ্রিস্টপূর্ব ১০৪ অব্দে সাইলিনু নামে একব্যক্তি সর্বপ্রথম লেখপত্র তৈরি করেন। তিনি লেখপত্র তৈরি করেছিলেন বাঁশ ও মালবেরী থেকে। বাঁশ ও মালবেরী গাছের বাকল থেকে মণ্ড তৈরি করে সেই মণ্ডকে সম্ভবত চালুনীর উপর পাতলা করে বিছিয়ে কাগজ তৈরী করেছিলেন। পরবর্তীসময়ে এই চালুনী ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে আরম্ভ করে। তবে পদ্ধতির তেমন কোন পরিবর্তন খুব সহজে আসে নি। মূলত বাঁশ ও মালবেরীর পরিবর্তে অন্য প্রকার প্রাকৃতিক সামগ্রী উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। চীন দেশের এই পদ্ধতি প্রথমে গ্রহণ করে আরবরা। ক্রমান্বয়ে লেখপত্র তৈরির এ কৌশল ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উপমহাদেশে। ঐ সময় স্পেনে যে কাগজ তৈরি হত তাতে ব্যবহৃত হত পুরাতন কাপড় ও তুলা। পদ্ধতি অবশ্য একই ছিল। প্রথমে মণ্ড তৈরি করে মণ্ডকে তরল করে চালুনির উপর বিছিয়ে পাতলা শিট তৈরি করা হত। পাশ্চাত্যের এ প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতবর্ষেও লেখপত্র তৈরি আরম্ভ হয়।

পাণ্ডুলিপি লেখার উপকরণের মধ্যে তালপত্র, তেরেটপত্র, কদলীপত্র, ভূর্জপত্র, বৃক্ষবল্কল প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদান। এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলি বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে লেখার উপযোগী রূপে তৈরি করে নেয়া হত। যেমন—

তালপত্র : প্রথমে কাঁচা তালপত্র কিছুদিন জলে ভিজিয়ে রেখে পরে রৌদ্রে শুকানোর পরে যখন তামাটে বর্ণ ধারণ করত তখন তা লেখার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হত। তেরেটপত্র তালপত্র সদৃশ। ফলে একই নিয়মে লেখার উপাদানরূপে তৈরি করা হত। কদলীপত্র, ভূর্জপত্র শুকিয়ে তামাটে বর্ণের করে তা লেখার উপযোগী করা হত।

বৃক্ষবল্কল অর্থাৎ গাছের ছাল : প্রথমে গাছের কাঁচা পুরু ছাল চেঁচে মসৃণ ও পাতলা করা হত। পরে তা উত্তম রূপে শুকিয়ে লেখার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হত। শুকানোর পরে এ উপাদানটিও ধারণ করত তামাটে বর্ণ।

তুলট কাগজ : দেশীয় বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা মানুষের হাতেই তৈরি হত এ উপাদানটি। এ কাগজ তৈরিতে প্রথমে শন, তুলা ও তিসির তন্তু একত্রে ঢেঁকিতে পেষণ করে মণ্ড তৈরি করা হত। পরে তা সম্ভবত কাপড়ে পাতলা করে বিছিয়ে রোদে শুকানো হত। তুলট কাগজে তৈরিতে যে মণ্ড ব্যবহৃত হত তাতে তুলার পরিমাণ বেশি থাকত বলে একে বলা হত তুলট কাগজ। কাগজ তৈরির মণ্ডের সঙ্গে অনেক সময় চুন মেশানো হত। এই চুন মেশানো কাগজ দীর্ঘস্থায়ী হত না। কারণ চুন ক্ষার জাতীয় দ্রব্য। ক্ষার কাগজকে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করলেও একে করে তোলে ক্ষণভঙ্গুর। পোকার আক্রমণ থেকে কাগজকে রক্ষাকল্পে অনেক সময় কাগজ তৈরির মণ্ডের সঙ্গে হলুদ মেশানো হতো। এই হলুদ মিশ্রিত তুলট কাগজের রঙ হত হলুদ। আবার অনেক সময় কাগজ তৈরির মণ্ডের সঙ্গে চুন ও হলুদ এক সঙ্গে মিশ্রিত করে কাগজের রঙ করা হত মেরুন। নীল বর্ণের কিছু কিছু কাগজও দৃষ্টিগোচর হয়। সম্ভবত কাগজ তৈরির মণ্ডের সঙ্গে নীলের মিশ্রণে কাগজের রঙ করা হত নীল। কোন রকম রঙের মিশ্রণ ব্যতীত শুধু মণ্ডের দ্বারা যে কাগজ তৈরি করা হতো তার বর্ণ হত ধূসর বা তামাটে। এ জাতীয় তুলট কাগজের ব্যবহারই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

২. লেখনী

বর্তমান যুগে যেমন যন্ত্রের তৈরি সুন্দর কলম দিয়ে আমরা লিখি, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। সে কারণে পাণ্ডুলিপির লেখপত্র, লেখনী, কালি থেকে শুরু করে সকল উপাদান ও উপকণ তৈরি হত হাতে। দেশীয় বিভিন্ন উপাদান থেকেই লেখার জন্য প্রস্তুত করা হত প্রয়োজনীয় লেখনী। যেমন—বাঁশের কঞ্চি, পাখির পালক, নল (শর জাতীয়), মোটা ঘাস প্রভৃতি উপাদানের অগ্রভাগ সরু করে বা সূচালো করে কিংবা লোহার পেরেক ঘসে কলম তৈরি করা হত। এ সমস্ত কলম, দেখতে যেমনই হোক না কেন সেগুলি দিয়ে যা লেখা হয়েছে তা যে অতীব সৌন্দর্যবর্ধক এবং প্রশংসনীয় এটা অবশ্যই স্বীকার্য। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির পত্রে ও ছত্রে দৃষ্টি-নন্দন লেখাই বহন করে এর প্রমাণ। লেখনীসমূহের মধ্যে আবার পাখির পালক দিয়ে লেখা পাণ্ডুলিপিগুলিই অধিক আকর্ষণীয় এবং সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ীও।

৩. কালি

এখন পাণ্ডুলিপি সম্পর্কিত আলোচনায় লেখ্যকালি বিষয়ক বক্তব্যও খুবই প্রাসঙ্গিক। সাধারণত পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত হত কালো বর্ণের কালি। তবে লাল এবং তাম্রবর্ণের কালির ব্যবহারও পরিদৃষ্ট। একই সঙ্গে দুই বর্ণের কালির ব্যবহারও ছিল প্রচলিত।

অনেক পাণ্ডুলিপিতে লাল ও কালো কালির ব্যবহার একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকালে এই দুই কালিতে কিংবা দুই কালির সংমিশ্রণে লেখা বোধ হয় একটা বহু ব্যবহৃত নিয়মে পরিণত হয়েছিল। বিশেষত কালো কালি দিয়ে পংক্তি লিখে লাল কালিতে দেয়া হত বিরাম চিহ্ন। কোন কোন প্যাণ্ডুলিপিতে তামাটে কালি দিয়ে চিত্র এঁকে কালো বা লাল কালি দিয়ে মন্ত্র বা শ্লোক লেখা হত। আবার কোন কোন পুথিতে মাঝখানের দুই/এক লাইন বা পংক্তি লাল কালি দিয়ে লিখে বাকীটা লেখা হয়েছে কালো কালিতে। সাধারণত বৈষ্ণবকাব্য এবং তন্ত্র শ্রেণীর পাণ্ডুলিপিতে এই দুইকালির মিশ্রণ অধিক পরিদৃষ্ট। তবে অন্যান্য বেশ কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতেও দুই কালির সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়।

পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে ব্যবহৃত কালি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া আবশ্যক। কারণ প্যাণ্ডুলিপি গবেষণার ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি লেখার কালি অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণের মতো একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। প্রাচীন যুগে দেশীয় বিভিন্ন উপাদানদ্বারা নানা প্রকার কালি তৈরি করা হত। উপাদানের গুণাগুণের উপর নির্ভর করত কালির ঘনত্ব বা তরলত্ব এবং তার স্থায়িত্বও। কালি তৈরি করার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হত শিমুল গাছের ছাল, ছাগলের দুধ, তেল, লোধ্র, লাক্ষা, লোহার গুঁড়া, মাদার কাঠের কয়লা, জবার কুঁড়ি, গাবের ফল, হরীতকী, আমলকী, বাবলা গাছেল ছাল, জাটির রস, ডালিমের রস (কচি ডালিম), অর্জুন গাছের ছাল প্রভৃতি। কয়েক প্রকার উপকরণের সংমিশ্রণেই তৈরি হত কালি। এর মধ্যে যে কালি তৈরিতে উপাদান হিসেবে লোহার গুঁড়া ব্যবহৃত হত তার রঙ তুলনামূলকভাবে বেশি উজ্জ্বল হত। এজন্যে সমকালে ঐ কালি ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হত অনেক লেখক, লিপিকর এবং টীকাকার। কিন্তু এই কালির মধ্যেই আবার নিহিত থাকত তার নিষ্প্রভ হওয়ার বীজ। কালিতে মিশ্রিত লৌহ কণিকা ধীরে ধীরে ক্ষয় করে ফেলে লিপিপত্রকে। ফলে লোহার গুঁড়া মিশ্রিত কালিতে লেখা পাণ্ডুলিপির স্থায়িত্ব অনেক কমে যায়। এমন কি উক্ত কালিতে লেখা পাণ্ডুলিপির অংশ ছিন্ন ও চূর্ণ হয়ে ঝরে পড়তে দেখা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পুথিশালায় এরূপ কালিতে লেখা বিনষ্ট পুথির বহু নিদর্শন পরিদৃষ্ট। অতএব পুথির স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে কালিরও যে একটা বিশেষ প্রভাব ছিল তা যথার্থরূপেই বলা চলে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে না পড়েও কেবল কালির গুণাগুণেই ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে গেছে পাণ্ডুলিপির অতীতের সাক্ষ্যবাহী দুর্লভ পত্রাবলী। অর্থাৎ ঝড়-বৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ড, পোকা-মাকড়, আর্দ্রতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থা থেকে পাণ্ডুলিপি সযত্নে সংরক্ষিত হলেও লৌহ মিশ্রিত কালির কারণেই হয়তো আমাদের বিস্মৃত অতীতের পৃষ্ঠাগুলি হত বিনষ্ট অথবা বিনষ্টপ্রায়। পঞ্চাশ/ষাট বছর পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় সংরক্ষিত লৌহমিশ্রিত কালিতে লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি ভাল অবস্থায় সংগৃহীত হলেও বর্তমানে তার অধিকাংশই অস্পষ্ট, ক্ষয়িষ্ণু, চূর্ণীভূত, ছিন্ন অথবা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। অন্য যেগুলি এখনও ব্যবহারোপযোগী তার আয়ুও হয়ে এসেছে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। পাণ্ডুলিপিগুলি

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে কাপড়ে সুন্দরভাবে মুড়ে রাখা সত্ত্বেও কেবল কালির কারণেই বিনষ্টপ্রায় তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাই বিশেষ নিরীক্ষায় এই কালিতে লেখা মূল্যবান পুথিগুলি বেছে বের করে অব্যবহার্য হওয়ার আগে সেগুলি অবশ্যই লেমিনেশন[১৪] (Lamination) করা এখনই প্রয়োজন। অন্যথায় যেগুলির অবস্থা কিছুটা ভাল, সেগুলি এখনই লেমিনেশন না করলে দিনান্তরে যে মূল্যহীন হয়ে ঝরে পড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাচীন কালিতে অন্যতম যে উপাদানটি ছিল তার নাম হরীতকী। উপাদান হিসেবে হরীতকী কালিকে প্রদান করেছে দীর্ঘস্থায়িত্ব। এই কালি লৌহ মিশ্রিত কালি অপেক্ষা কিছুটা হালকা এবং মসৃণ। হরীতকী মিশ্রিত কালিতে লেখা ৫০০ (পাঁচশত) বছর পূর্বের পাণ্ডুলিপিও অদ্যাবধি অবিকৃত ও উজ্জ্বল। প্রমাণিত হয়েছে যে হরীতকী কাগজেরও কোনরূপ ক্ষতিসাধন করে না। এই কালিতে লেখা পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে লেখা সংগ্রহকালে যেরূপ ছিল এখনও তার অবস্থা তদ্রূপ।

শিমুল গাছের ছালের রস মিশ্রিত কালিতে লেখা পাণ্ডুলিপিও দীর্ঘস্থায়ী। আমরা যে কালের কথা বলছি সে কালে কালি তৈরি ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। হয়তো সে কারণেই তখন স্বল্প ব্যয়ে সহজ উপায়ে অন্য এক প্রকার কালি তৈরির প্রচলন ছিল। এ প্রকার কালি প্রস্তুত করা হত আতপ চাল মাটির হাড়িতে ভেজে গুঁড়া করে লাউয়ের ডগার রস ও জল মিশ্রিত করে। তবে এই কালি কোন প্রকার দীর্ঘস্থায়ী লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত না। হরীতকী বা শিমুলের ছালের তৈরি কালি থেকে এই কালি অনেকটা হালকা বা পাতলা। সাধারণত শিশু শিক্ষার কাজে বা অনুশীলনে ব্যবহৃত হত এই কালি। কলাপাতায় এবং তালপাতায় এই কালির ব্যবহার বেশি ছিল বলে প্রমাণিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় এই কালিতে লেখা বেশ কিছু নিদর্শন রয়েছে।

ঘ. পাণ্ডুলিপির লিখন পদ্ধতি

এটা লক্ষ করা যায় যে প্রাচীনকাল থেকে পাণ্ডুলিপি লেখার ক্ষেত্রে কতগুলি নিয়মকানুন মেনে চলা হত। প্রথমত পত্রের চারপাশে কিছুটা স্থান মুক্ত রেখে মাঝখানে নির্দিষ্ট একটা অংশে বিষয়বস্তু লেখা হত। সাধারণত প্রশস্ত দিকে এই মুক্ত স্থানটি ১ থেকে ৪ সে.মি. এবং লম্বিত দিকে এর স্থান বা পরিমাণ ৩ থেকে ৭ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। মধ্যবর্তী স্থানের যে অংশটুকু পাণ্ডুলিপি লেখার জন্য নির্ধারিত হত সেখানে কোনপ্রকার মার্জিন ছাড়াই অনেকটা অলিখিতভাবেই যেন একটা নিয়মের সূত্র বেঁধে দেয়া হয়েছিল। প্রথম লাইনের প্রথম বর্ণটি যেখান থেকে শুরু হত এবং শেষ বর্ণটি যেখানে শেষ হত— পরবর্তী লাইনগুলিও ঠিক একই জায়গা থেকে শুরু ও একই জায়গায় শেষ হত। একটুও এদিক-ওদিক হত না। এই নিয়মাবদ্ধ হয়ে শব্দে-শব্দে বা বাক্যে-বাক্যে কোন ফাঁক না রেখে ক্রমানুযায়ী পত্রগুলো লেখা হত। অর্থাৎ পাণ্ডুলিপিতে শব্দ থেকে শব্দ কিংবা বাক্য

থেকে বাক্যে পার্থক্যবোধক কোন ফাঁক দেখা যায় না। ফাঁক না রেখে লেখার এই রীতি প্রাচীন থেকে প্রাচীনতর পাণ্ডুলিপিতে অধিক দৃষ্ট হয়। প্রাচীনকালে শব্দ এবং বাক্যে পার্থক্যবোধক কোন ফাঁক না রেখে পাণ্ডুলিপি লেখার যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাতে দেখা যায় যে, পত্রের নির্দিষ্ট লেখার স্থানে কোন পঙ্‌ক্তিতে পূর্ণ বক্তব্য বা বাক্যশেষে অল্পকিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলেও এবং সেখানে স্থানের স্বল্পতা সত্ত্বেও তারপর থেকেই পরবর্তী পঙ্‌ক্তি শুরু করা হত। আবার পত্রের লেখার নির্দেশিত স্থানে লেখা শেষ না হলে নীচের পঙ্‌ক্তিতে লেখা হত। একটা শব্দের অর্ধেক লেখার পরে যদি নির্দেশিত স্থান শেষ হয়ে যেত তাহলেও পরবর্তী শব্দ নীচের লাইনে লেখা হত। এক্ষেত্রে যদি একটা মাত্র বর্ণও অবশিষ্ট থেকে যেত তাহলে সেটাও লেখা হত পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে। এমন কি একটা বর্ণ লেখা সম্ভব নয় এরূপ পরিমাণ স্থান আছে অথচ তা ফাঁকা থেকে যাচ্ছে, তখন উক্ত পঙ্‌ক্তি পূরণার্থে এবং সৌন্দর্যের হানি না ঘটিয়ে কোন চিহ্ন দ্বারা সেই স্থান পূরণ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংগ্রহে কয়েকটি পুথিতে এসব ক্ষেত্রে +, ঃ ঃ, ৮ এরূপ বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে যে '৮' চিহ্নটি দেখানো হল তা সংখ্যাবাচক আট (৮) নয়, পঙ্‌ক্তি পূরণার্থে একটি অর্থহীন চিহ্ন মাত্র। লেখার সময় শেষ পঙ্‌ক্তিটি যদি পত্রের অর্দ্ধেকেই শেষ হয়ে যেত তাহলে পঙ্‌ক্তির অবশিষ্টাংশটুকু বিভিন্ন চিহ্ন বা ফুল এঁকে পূর্ববর্তী পঙ্‌ক্তির সঙ্গে সমতা রক্ষা করা হত। এ বিষয়ের উপর নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রদান করা হল।

পাণ্ডুলিপির মধ্যাংশ বা ছাড়-এর সমতাবিধায়ক চিহ্ন বা লিখন রীতি।

(ক)

ঢা.বি. পা.শা. মা. সংগ্রহ সং—২৯ পৃ. ১৯৯ক

(খ)

ঢা. বি. পা. সং-১৪ পৃ. ১৫২খ

পঙ্‌ক্তির অন্তসাম্য বিধায়ক চিহ্ন।

(ক)

ঢা. বি. পা. শা. মা. সংগ্রহ-স—২৯ পৃ. ১৯৯

(খ)

বা. এ. পা. সং-২৭৬ পৃ. ১৪খ

এভাবে সমগ্র পাণ্ডুলিপিতে সৃষ্টি করা হয়েছে সমতা ও সৌন্দর্যের এক অপূর্ব সমন্বয়। আর এর মাধ্যমে আমাদের মননে যুক্ত হয় পাণ্ডুলিপি-লেখক এবং লিপিকরদের অসীম ধৈর্য, সৌন্দর্য ও পরিশীলিত রুচিবোধের ঈর্ষণীয় পরিচয়। পঙ্‌ক্তিতে সাম্যবিধায়ক এ চিহ্নগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বা ধারণা না থাকলে যে-কোন পাণ্ডুলিপি পাঠক ও গবেষকের পক্ষে বিভ্রান্তিতে দিশেহারা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত পাণ্ডুলিপি পাঠক ও গবেষকের পক্ষে বিভ্রান্তিতে দিশেহারা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত পাণ্ডুলিপির কোন চিহ্নই যুক্তিহীন কিংবা অপ্রয়োজনীয় নয়, তাই সঠিকভাবে পাঠোদ্ধার করতে হলে সকল প্রকার বিষয়ের উপরই রাখতে হবে সতর্ক দৃষ্টি ও সম্যক ধারণা।

পাণ্ডুলিপির এই চারপাশে ফাঁকা রাখার পেছনেও একাধিক কারণ থাকা স্বাভাবিক।

প্রথমত পত্রের চারপাশ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। এটা লক্ষণীয় যে দীর্ঘদিনের ব্যবহারে এবং সময়ের ব্যবধানে পত্রের চারপাশ ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন—বৃক্ষবল্কল, তালপত্র, ভূর্জপত্র, মোটা তুলট কাগজ প্রভৃতির চারপাশ খুব শীঘ্রই ভেঙ্গে যায়; পাতলা তুলট কাগজ, হাতে তৈরি পাতলা কাগজ প্রভৃতির চারদিক যায় ছিন্ন হয়ে। এ সব কথা চিন্তা করেই হয়তো লিপিপত্রের চারপাশে কিছুটা স্থান ফাঁকা রাখা হত।

দ্বিতীয়ত পত্রের লম্বালম্বি দুই পার্শ্বে পত্র-সংখ্যা লিখিত হত। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এক পার্শ্বে এবং কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে উভয় পার্শ্বেই লিখিত হয়েছে পত্রসংখ্যা। এ কারণে দুই পার্শ্বে কিছুটা স্থান ফাঁকা রাখা অনেকটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল।

তৃতীয়ত অধিকাংশ পুথিতেই পত্রের লম্বালম্বি দুদিকের শূন্যস্থানে লেখক বা লিপিকরের আরাধ্য দেব-দেবীকে স্মরণযোগ্য কিছু লিখিত হত। যেমন—শ্রী, শ্রীহরি, শ্রীদুর্গা, ওঁ তারা, শ্রীগুরুবে নমঃ ইত্যাদি শব্দ বা শব্দাবলী কিংবা নিবেদন বাক্য লিখিত হত। আবার কখনও কখনও এ জায়গায় লেখা হত লেখক বা লিপিকরের নাম অথবা তাঁর গুরুদেবের নাম। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের নাম, গ্রন্থের ভিতরের কোন বিশেষ কথা, লেখক বা লিপিকরের কাল প্রভৃতিও দুই পার্শ্বের শূন্যস্থানে লেখা হত।

চতুর্থত পাণ্ডুলিপি লিখতে গিয়ে যদি কোন অক্ষর বা বর্ণ কখনও বাদ পড়ে যেত তাহলে তা পত্রের আড়াআড়ি অর্থাৎ প্রশস্ত দিকে রক্ষিত ফাঁকা স্থানটিতে কোন চিহ্ন দিয়ে লিখে রাখা হত। আবার কোন লিখিত শব্দ ভুল হয়ে গেলে সেই শব্দটি কালি দিয়ে নষ্ট করে কোন চিহ্ন দিয়ে পত্রের ওপরে বা নীচে শুদ্ধ করে লেখা হত। এ কারণেও পাণ্ডুলিপির ওপরে ও নীচে কিছু স্থান ফাঁকা রাখা হত।

পঞ্চমত কোন টীকাকার চারপাশে রক্ষিত শূন্য অংশে মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা করতেন। টীকা সম্বলিত পাণ্ডুলিপিগুলিতে চতুস্পার্শ্বের ফাঁকা স্থান তুলনামূলকভাবে কিঞ্চিদধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এখানে মূল বিষয় লেখা হত মধ্যভাগে এবং চারদিকে থাকত তার ব্যাখ্যা। এসকল পাণ্ডুলিপিতে মধ্যবর্তী স্থানের লিপিবর্ণ থেকে বহিরংশের লিপিবর্ণ অধিকতর ক্ষুদ্র অবয়ববিশিষ্ট। সুতরাং এ ধরণের লেখা পাণ্ডুলিপি দেখে সাধারণত বুঝতে হবে যে এটি টীকা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থ কিংবা টীকা গ্রন্থ। এভাবেই পাণ্ডুলিপি-পত্রে লিখিত মূল অংশের চতুস্পার্শে পরিদৃষ্ট শূন্যস্থানের সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে।

পাণ্ডুলিপি লেখার আর একটা বৈশিষ্ট্য হল, পত্রের মধ্যভাগে লম্বালম্বি ৩ থেকে ৮ এবং আড়াআড়ি ২ থেকে ৬ সেন্টিমিটার জায়গা ফাঁকা রেখে লেখা। এটি 'ছাড়' নামে পরিচিত। এ স্থানটি ফাঁকা রাখার প্রধান কারণ হল, উক্ত স্থানটির ঠিক মধ্যে বন্ধনযোগ্য কিছুর সাহায্যে পাণ্ডুলিপি শক্ত করে বেঁধে রাখা। পাণ্ডুলিপিকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পোকা-মাকড় প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা এবং দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য শক্ত বাঁধনে সংরক্ষণ করার কৌশল সেকালে প্রচলিত ছিল। পাণ্ডুলিপিকে যেমন শক্ত করে বাঁধা হত তেমনি তাকে পালন করা হত সযত্ন লালনে। এ সম্পর্কে সে কালে এবং সে সমাজে একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল—"পাণ্ডুলিপিকে পুত্রের মতো পালবে, শত্রুর মতো বাঁধবে।" এ কথাটা কেবল সে যুগের মানুষের জন্যই নয়, এ যুগের মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রাচীন যুগে এই ছিদ্র করে পাণ্ডুলিপি বাঁধা একটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল। ফলে ছিদ্র করার জন্য মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা জায়গা রাখাও নিয়মে রূপ নিয়েছিল। এ নিয়মের দ্বারা বশীভূত হয়ে পরবর্তী সময়ের অনেক পাণ্ডুলিপির মধ্যভাগে ছিদ্র না রাখলেও ফাঁকা জায়গা কিন্তু ঠিকই রাখা হত। ফলে মাঝখানের এই শূন্য স্থানটি কোন প্রকার প্রয়োজন ব্যতিরেকেই রক্ষিত হয়েছে একাধিক পাণ্ডুলিপিতে। সতের শতকে এসে ধীরে ধীরে এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম বা শৈথিল্য লক্ষ করা যায়। এরপর থেকে বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি মধ্যভাগের কোন অংশ ফাঁকা না রেখেই লিখিত হয়েছে। পরবর্তীকালে উনিশ শতক পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি লিখনে প্রচলিত হয়ে আসছে এ দুটো রীতিই।

মধ্যভাগের এ অংশটি ফাঁকা রাখার পেছনে আরও একটি কারণ বিদ্যমান। অনেক লেখক বা লিপিকর পত্রের লম্বালম্বি দুদিকে পত্র সংখ্যা না দিয়ে মাঝখানের এই শূন্য অংশের একদিকে বসাতেন। হয়ত দু-পার্শ্বের ভাঙার হাত থেকে পত্র সংখ্যাকে রক্ষাকল্পে ছিল এ রীতি। যাই হোক মধ্যভাগে পত্র সংখ্যা লেখা এরূপ পাণ্ডুলিপির নিদর্শন একাধিক।

তথ্যসূত্র

১. দ্রষ্টব্য

(i) ঢা. বি. পা. সংখ্যা-১৫৩।

(ii) ঢা. বি. পা. সংখ্যা-১২১৫৫।

২. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-২২২২।
৩. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-২২০৯।
৪. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-২১৯৫।
৫. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-২২৩৩।
৬. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-২২০৬।
৭. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-১৯৭৮।
৮. ঢা. বি. সংযোজন সংখ্যা-২২১০।
৯. ঢা. বি. সংযোজন সংখ্যা-১৯৭৮।
১০. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-৪৯৫।
১১. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-৪৬০৮।
১২. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-৭৫২।
১৩. ঢা. বি. সংগ্রহ শালার পত্র সংখ্যা-৮৫।
১৪. লেমিনেশন শব্দের অর্থ স্বচ্ছপত্রপুটীকরণ, অর্থাৎ স্বচ্ছ কাগজ দ্বারা পাণ্ডুলিপির পত্রগুলিকে আচ্ছাদন করে রাখা হয়। এর ফলে পাণ্ডুলিপি দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করে।

তৃতীয় অধ্যায়

পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব

ক. পাণ্ডুলিপির প্রাচীনত্ব

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের সঠিক সময় এখনও নির্ণীত হয়নি। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বেদের রচনাকাল ২৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন।[১] আবার খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-৫০০ বেদের রচনাকাল বলেও কেউ মত প্রকাশ করেছেন।[২] এ দুই সময় সীমার মধ্যেও অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেছেন। ডঃ যোগীরাজ বসুর মতে বেদের রচনাকাল খ্রি. পূ. ৬০০০ অব্দ।[৩] প্রথম অধ্যায়ে এ মতই গ্রহণ করা হয়েছে।

বেদ হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র-রূপে পরিগণিত। কথিত হয় অতীতে বেদের লিখিত কোন রূপ ছিল না। শুধু গুরুর মুখে শুনে শুনে কণ্ঠস্থ করা এবং মনে রাখা—এটাই ছিল প্রাচীন কালের নিয়ম। এ জন্য বেদের এক নাম শ্রুতি। কিন্তু বেদ যে লিখিত হত তারও যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। যেমন—বেদের নিরুক্তকার যাস্কের লেখা থেকে জানা যায়—"যাঁহারা ধর্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই অর্থাৎ শ্রুতর্ষিদিগকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্রসমূহ প্রদান করেন, সেই শ্রুতর্ষিগণ আবার উপাধ্যায়রূপে উপদেশ দ্বারা 'গ্রন্থতঃ' ও 'অর্থতঃ' মন্ত্রগুলি শিখাইয়াছিলেন। তাঁহারা আবার অর্থ গ্রহণে অক্ষম শিষ্য দেখিয়া খেদযুক্ত হইয়া বুঝাইবার জন্য এই গ্রন্থ (নিঘণ্টু), বেদ ও বেদাঙ্গ ব্যাসদ্বারা সংকলিত করেন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সহজেই শক্তিহীন অল্পায়ু মনুষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে।"[৪] এখানে 'গ্রন্থতঃ' এবং 'অর্থতঃ' শব্দদ্বয়ের অর্থ গ্রন্থানুসারে এবং অর্থানুসারে। তাই 'গ্রন্থানুসারে' শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তখন গ্রন্থ ছিল অর্থাৎ লিখন রীতি প্রচলিত ছিল।

ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১/৪/৪) এবং আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে (৪/৬/৩) 'পটল' শব্দের উল্লেখ আছে—

"দ্যৌরিত্যোতৈরেবৈনং তৎ কামৈঃ সমর্দ্ধয়তীতি নু পূর্বং পটলম্।"

এখানে 'পটল' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে গ্রন্থবিভাগ। অর্থাৎ বর্তমানে কোন গ্রন্থে পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় বলতে যা বোঝায় প্রাচীনকালে পটল শব্দের দ্বারা তাই

বোঝাত। অতএব, গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় অর্থে 'পটল' শব্দের ব্যবহার থেকে প্রমাণিত হয় যে সে যুগে গ্রন্থ লিখিত হত।

"বেদে আছে, নানা সূত্রের (যজ্ঞের) সম্পাদনকল্পে ঋষিগণের হৃদয়ে জ্যোতিষিক কঠিন সমস্যা উদিত হইয়াছিল। অঙ্কবিদ্যা ব্যতীত সেই সকল সমস্যা পূরণ সম্ভবপর নহে। কোন প্রকার চিহ্ন বা বর্ণ-বিন্যাস ব্যতীত অঙ্কপাত করা যায় না।"[৫]—এ উদ্ধৃতি থেকেও স্পষ্টত বলা চলে, বৈদিক যুগে নানা বর্ণমালা ও অক্ষরের প্রচলন ছিল। এছাড়া ঋক্, সাম্, যজুঃ প্রভৃতি বেদের বিভিন্ন শ্লোক সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বৈদিক যুগে লিখনপদ্ধতি কত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য—"হিমপ্রলয়ের পূর্বে যখন বৈদিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন মোটামুটি স্বীকার করা যায় যে, বৈদিক বর্ণমালার বিকাশও সেই সময় ঘটিয়াছিল। প্রাতিশাখ্য বা প্রতিশাখার বৈদিক পঠন-পাঠন বিধি অনুসারে প্রতি মন্ত্রই 'স্বরঃ' ও 'বর্ণতঃ' (অর্থাৎ স্বর ও বর্ণের উচ্চারণ অনুসারে) পাঠ করিবার নিয়ম আছে। সুতরাং আদি বৈদিক মন্ত্রসমূহ কেবল যে স্বরানুশ্রিত হইত তাহা নহে, বর্ণবিশিষ্টও ছিল। একথাও সকলেই জানিতেন। মনে করা হয় যে, হিমপ্রলয়ের সময়ে বিষম তুষার সমুদ্রের তরঙ্গাঘাত হইতে যে কয়জন আর্য-সন্তান রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রুতিবিভ্রম ঘটে নাই। তাঁহাদের বংশধরগণ মেরু (টেবধর) ও সমুচ্চ হিমালয় প্রদেশে অবস্থানকালে তাঁহাদের মুখেই যে আদি বৈদিক মন্ত্র শুনিয়াছিলেন, তাহাই 'শ্রুতি' বলিয়া গণ্য হইয়াছে।"[৬]

বৈদিক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থা কোন পর্যায়ে অর্থাৎ কত উচ্চ পর্যায়ে ছিল তা নির্ণয় করা যায় বেদমন্ত্রের রচয়িতা ঋষিদের দ্বারা। বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, মধুচ্ছন্দা, মেধাতিথি, শুনঃশেপ, কণ্ব, গৌতম, কুৎস, দীর্ঘতমা, অগস্ত্য, গৃৎসমদ, উৎকীল, ঋষভ, প্রজাপতি, বামদেব, অত্রি, শ্যাবাশ্ব, গর্গ, সুহোত্র, নর, শংযু, বসিষ্ঠ প্রগাথ, বৈয়শ্ব, নেম জামদগ্ন্য, নারদ, মনু, নাভাগ, ত্রিত, ত্রিশিরা, বিমদ, কবষ, লুষ, বৃহদুক্থ, গয়, অঙ্গ, বেন প্রমুখ অসাধারণ মনীষা সম্পন্ন ঋষিগণ বেদের অসংখ্য শ্লোক বা সূক্ত রচনা করেছেন। এ শ্লোকগুলিতে জ্ঞানের বা পাণ্ডিত্যের এমন সমাবেশ ঘটেছিল যা বর্তমান বিশ্বের সুপণ্ডিতকেও বিস্মিত করে। বেদের এই অসাধারণ জ্ঞানরাশির জন্যই বেদকে অপৌরুষেয় নামে আখ্যায়িত করা হয়, অর্থাৎ বলা হয়—বেদ কোন পুরুষ অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি নয়। এ বিশ্বাস এক সময় অনেকেরই ছিল (আজও অনেকের আছে)। তাঁরা অসাধারণ কোন কিছুকে মানুষের সৃষ্টি বলে মানতে চাইতেন না, যুক্তিহীন আবেগ দ্বারাই তারা পরিচালিত হতো। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের বিশ্লেষণধর্মী মানুষ আর আবেগের বশীভূত নয়, তারা বিশ্বাসী যুক্তিতে। সেই যুক্তির দ্বারাই প্রমাণিত যে বৈদিক যুগে লিখনরীতি ছিল এবং বেদ লিখিত হত গ্রন্থাকারে।

বৈদিক যুগে নারীরাও সুশিক্ষিত ছিলেন। বেদের মতো কঠিন শাস্ত্রচর্চা বা তার সূক্ত বা মন্ত্ররচনা করা সাধারণ পাণ্ডিত্যের ব্যাপার নয়। বৈদিক যুগে বৈদিক সূক্ত রচনাকারী অনেক মহিলা ঋষিদের নাম জানা যায়। যেমন—বিশ্ববারা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, সাবিত্রী,

ঘোষা, অপালা, বাক্, অদিতি, ইন্দ্রাণী, সরমা, রোমশা, লোপামুদ্রা, সর্পরাজ্ঞী, মেধা, দক্ষিণা, সূর্যা, অম্ভৃণিবাক্ ইত্যাদি। এঁদের রচিত মন্ত্রগুলি বেদের অন্যান্য মন্ত্রের চেয়ে নিম্নমানের নয়। যেমন—

লোপামুদ্রা—

> পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষা বস্তোরুষসো জরয়ন্তীঃ।
> মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনামপ্যূ নু পত্নীবৃষণো জগম্যু ॥ (১/১৭৯/১)

[হে অগস্ত্য] বহু সংবৎসর অবধি, আমি রাত্রিদিন ও জরাসমুৎপাদক ঊষাতে তোমার সেবা করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি। জরা শরীরের সৌন্দর্য নাশ করিতেছে। এক্ষণে কি? পুরুষ স্ত্রীর নিকট গমন করুক। (অনু. রমেশচন্দ্র দত্ত)

বিশ্ববারা—

> সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙ্ঙুষসমুর্বিয়া বিভাতি।
> এতি প্রাচী বিশ্ববাবা নমোভির্দেবা ঈলানা হবিষা ঘৃতাচী ॥ ৫/২৮/১)

অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আকাশে দীপ্তি বিস্তার করেন, এবং ঊষার সম্মুখে বিস্তৃতভাবে প্রদীপ্ত হয়েন; বিশ্ববারা পূর্বাভিমুখী হইয়া এবং দেবগণের স্তবোচ্চারণপূর্বক হব্যপাত্র লইয়া অগ্নির অভিমুখে গমন করিতেছে। (অনু. রমেশচন্দ্র দত্ত)

অম্ভৃণিবাক্—

> অহং রুদ্রোভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
> অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ (১০/১২৫/১)

আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যগণের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং দুই অশ্বিদয়কে অবলম্বন করি। (অনু. রমেশচন্দ্র দত্ত)

কোন যুগের শিক্ষার মান কিরূপ তা পরিমাপ করা যায় নারী-শিক্ষার দ্বারা। কারণ কোন ইতিহাস প্রমাণ দেয় না যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে নারীরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে। বৈদিকযুগে লিপি পদ্ধতি বা লিখন রীতির প্রচলন না থাকলে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নতমানের না হলে মহিলাদের পক্ষে বেদের মতো একখানা সুসংবদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সূক্ত বা শ্লোক রচনাকরা সম্ভব হত না। কাজেই স্বীকার না করে উপায় নেই যে সেই প্রাচীন কালে বা বৈদিকযুগে লিখন পদ্ধতি ছিল এবং বৃক্ষবল্কল, পশুচর্ম কিংবা অন্য কোন কিছুতে গ্রন্থ লিখিত হত—যা কালের ব্যবধানে কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অথবা কোন অজানা অন্ধকারে এখনো মানুষের আবিষ্কারের অপেক্ষা করছে।

এ যাবৎ যে সকল পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন নির্দশন হচ্ছে তালপত্রে লিখিত একটি সংস্কৃত (খণ্ডিত) নাটক। এটি খ্রিস্টাব্দ ২য় শতকের বলে অনুমিত। এ নাটকটি মুদ্রিত করেছেন ড. লুডার্স। ড. স্টাইন খোতান প্রদেশের খড়লিক্ নামক স্থান থেকে আবিষ্কার করেন একটি সংস্কৃত পুস্তক 'সংযুক্তাগম'। এটি বৌদ্ধসূত্র। ভূর্জপত্রে লিখিত এ যাবৎ আবিষ্কৃত এটিই সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন। এটি খ্রিস্টাব্দ ৪র্থ

শতকে লিখিত বলে অনুমান করা হয়। অধ্যাপক বেবর-আবিষ্কৃত চার খানা সংস্কৃত পুস্তক তুলট কাগজে লিখিত সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন বলে পরিচিত। তিনি মধ্য এশিয়ার যারকংর নগর থেকে ৬০ মাইল দক্ষিণে কুগিঅর নামক স্থান থেকে এগুলি আবিষ্কার করেন। খ্রিস্টাব্দ ৫ম শতকে এগুলি লিখিত বলে ড. হার্নলি মত প্রকাশ করেছেন।

বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের রচনার সময় সুদূর প্রাচীনকাল হলেও আমরা যা পেয়েছি তা অনেক পরবর্তী কালের প্রতিলিপি। তবে বৈদিকযুগ থেকে বর্তমানে প্রাপ্ত সাহিত্যের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ের লিখিত কোন গ্রন্থ হয়ত কখনও আবিষ্কৃত হতে পারে যা অনেক সমস্যার সমাধান কিংবা মধ্যবর্তী সময়ের দীর্ঘতা আনতে পারে কমিয়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সংগৃহীত অথচ এখনও অপরিচায়িত এমন কোন পাণ্ডুলিপির পরিচায়নও দিতে পারে নতুন কোন আবিষ্কারের সন্ধান। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে সংগৃহীত প্রচুর পাণ্ডুলিপি এখনও সম্পূর্ণ অপরিচায়িত রয়েছে যা অযত্ন ও অবহেলায় পরিচায়িত হওয়ার আগেই হয়ত হয়ে যাবে বিলুপ্ত। শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছাড়াও গ্রামাঞ্চলের অনেকের ঘরেও রয়েছে নানান রকমের পাণ্ডুলিপি। এসব পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে পরিচায়িত করলে হয়ত সন্ধান পাওয়া যেতে পারে কোন কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের বা তথ্যের। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য—"... প্রাচীন দেবালয়, দীঘি ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের ফোটোগ্রাফ এবং প্রাচীন পুঁথি, পুরালিপি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।"[৭] শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান' গ্রন্থে বলেছেন ... "পুথির মধ্যে ছিন্নভিন্ন পত্ররাশি ঘাঁটিলে এ জাতীয় জীবনবৃত্তের কঙ্কাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শহরের প্রতিষ্ঠানে আসিয়া এই সকল 'আবর্জনা' ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পুথিগুলি মনোহর বেশ পরিধান পূর্ব্বক অভিনব কক্ষে ঢুকিয়া নিদ্রিত থাকে—ইহাই সাধারণ নিয়ম। প্রত্যেক পুথিশালায় একজন আবর্জনাবিশারদ নিযুক্ত থাকিয়া ইহাদের সৎকারের পূর্ব্বে নাড়ী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে কঙ্কালমালিনী প্রত্নবিদ্যার পূজোপহার আজ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত।"[৮] অন্যদেশের কথা জানিনা তবে বাংলাদেশের সিলেট, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, দিনাজপুর, রংপুর প্রভৃতি গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপির প্রচুর সংগ্রহই শুধু রয়েছে—যেগুলির সৎকারের কোন ব্যবস্থাও যেমন নেই, তেমনি নিযুক্ত নেই কোন আবর্জনা বিশারদও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংগৃহীত ৩০ (ত্রিশ) হাজার পাণ্ডুলিপির মধ্যে আনুমানিক ১২ (বার) হাজার পাণ্ডুলিপি এখনও রয়েছে সম্পূর্ণ অপরিচায়িত। এ সব পাণ্ডুলিপি আজ থেকে ৬২ বৎসর পূর্বে সংগৃহীত হয়েছে। পরিচায়িত পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রাচীনতম যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা খ্রিস্টাব্দ পনের শতকের।

পনের শতকের চারটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রাচীনতম হল 'সারদা-তিলক' গ্রন্থটি। গাছের বাকলে লিখিত এ সংস্কৃত তন্ত্র শাস্ত্রটির লিপিকাল ১৩৬১ শকাব্দ (১৪৩৯ খ্রিস্টাব্দ)। গ্রন্থটির রচয়িতা শ্রীলক্ষ্মণ দীক্ষিত। গ্রন্থটিতে ১-২৬, ২৯-১৩০ টি পত্র

বিদ্যমান, অর্থাৎ গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত।[৯] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহে এ গ্রন্থটির আরও কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আছে পরবর্তী শতকের লিপিকৃত, যেমন ১৪৩০ শকাব্দের (১৫০৮ খ্রিস্টাব্দের) লিপিকৃত ৫৫৭ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি। এটি ২০৪ পত্রে সম্পূর্ণ। এ গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে তালপত্রে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহে পুরাণ, মহাভারত, কোষ, বেদ, রামায়ণ, কাব্য, নাটক প্রভৃতির বিভিন্ন শতকে লিপিকৃত অসংখ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এ সবের মধ্যে যেগুলির প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এখানে সংগৃহীত রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে প্রাচীনত্বের ক্রমানুসারে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে পুরাণের পাণ্ডুলিপিই প্রাচীনতম। পুরাণের বিপুল সংগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন যে পাণ্ডুলিপি তা হল 'বিষ্ণুপুরাণ'[১০]। এ পাণ্ডুলিপিটি ১৩৮৮ শকাব্দে (১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দ) অনুলিখিত। গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় বাংলা লিপিতে তুলট কাগজে লিখিত।

মহাভারতের প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন যে পাণ্ডুলিপি এখানে রয়েছে তা ১৩৯৩ শকাব্দে (১৪৭১ খ্রি.) লিপিকৃত মহাভারতের 'বনপর্ব'[১১]। খ্রিস্টীয় পনের শতকের এ পাণ্ডুলিপিটি লিখিত হয়েছে তুলট কাগজে। গ্রন্থটিতে ১-৩২৩, ৩২৫ পত্র বিদ্যমান। অর্থাৎ গ্রন্থটি খণ্ডিত। গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় বাংলা লিপিতে লিখিত।

বিভিন্ন কোষ বা অভিধানের মধ্যে প্রাচীনতম যে পাণ্ডুলিপি এ সংগ্রহে পাওয়া গেছে তা ১৪২১ শকাব্দে (১৪৯৯ খ্রি.) অর্থাৎ খ্রিস্টীয় পনের শতকে লিপিকৃত 'অনেকার্থকোষ'[১২]। এর রচয়িতা মেদিনী। ১ থেকে ৮৫ পর্যন্ত পত্রে অভিধানটি সম্পূর্ণ। এটি লিপিকৃত হয়েছে সংস্কৃত ভাষায় বাংলা লিপিতে। লেখার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তুলট কাগজ।

বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক প্রভৃতির মধ্যে প্রাচীন যে প্রতিলিপি রয়েছে তা হল সামবেদীয় 'সামবিধান ব্রাহ্মণ'[১৩]। পাণ্ডুলিপিটি ১৬৬৮ সম্বৎ অর্থাৎ ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে লিপিকৃত। সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী লিপিতে পাণ্ডুলিপিটি লিখিত হয়েছে। ১৭ পত্রে গ্রন্থটি সম্পূর্ণই বিদ্যমান।

নাটকের মধ্যে সর্বপ্রাচীন যে পাণ্ডুলিপিটি এ সংগ্রহে রয়েছে তা হল 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়'[১৪] নাটক। এর রচয়িতা কবিকর্ণপূর। নাটকটি ১ থেকে ১০৬ পত্রে সম্পূর্ণ। ১৪৯৪ শকাব্দে (১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে) সংস্কৃত ভাষায় বাংলা লিপিতে নাটকটি লিখিত হয়েছে।

কাব্যের মধ্যে রূপ গোস্বামী রচিত 'দানকেলিকৌমুদী'[১৫] কাব্যটির পাণ্ডুলিপিটি প্রাচীনতম। এ ভক্তিকাব্যটি লিখিত হয়েছে ১৪৭১ শকাব্দে (১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে)। ৪ থেকে ৪০ পত্রে কাব্যটি অসম্পূর্ণ।

এর পর থেকে অর্থাৎ পনের শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন লেখকের নানা কাব্য, নাটক, স্মৃতি, তন্ত্র, কোষ, বেদ, পুরাণ, মহাভারতের অসংখ্য প্রতিলিপি এ সংগ্রহে সংগৃহীত রয়েছে।

ঘ. পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব ও ব্যবহার

পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব বা মূল্য যুগানুসারে বিভিন্ন প্রকার। সুদূর প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগে বেদগ্রন্থ থাকত সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে। বেদশাস্ত্রে পারদর্শী গুরুর মুখে শুনে শুনে শিষ্যদের অর্জন করতে হত এ শাস্ত্রজ্ঞান। এভাবে শাস্ত্রজ্ঞান অর্জনকারীদের তাই হতে হত কঠোর সংযমী, পরিশ্রমী ও অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী। দেশ-দেশান্তর থেকে আগত শিষ্যরা গুরুর নিকট বসে যুগ যুগ ধরে বিদ্যার্জনের জন্য চালাত তাদের সাধনা। ঐ সময় 'বেদ' নামক গ্রন্থ বা তার পাণ্ডুলিপি ছিল বহুমূল্যবান ধন-রত্নের চেয়েও দামী এবং গুরুত্ববহ। এ গ্রন্থ যেমন ছিল ধর্মীয় শাস্ত্র হিসেবে সকলের নমস্য তেমনি হত জ্ঞানার্জনের বাহন রূপে পূজিত। এর পরে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, ব্যাকরণ, ছন্দশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থও সযত্নে রক্ষিত হত মুনি—ঋষি ও সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী গুরুর কাছে। এঁদের কাছে এগুলি আদৃত হত পুত্রসমতুল্য। এই সময়ে অর্থাৎ প্রাচীন যুগে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করতেন এবং যাঁরা প্রাচীন গ্রন্থ প্রতিলিপি বা অনুলিপি করতেন তাঁরা হতেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ফলে তাঁদের কাছে গ্রন্থের গুরুত্ব ছিল নিজ অঙ্গের চেয়ে অধিক। সাধারণ মানুষ পেত না এর সান্নিধ্য। ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে এগুলি ছিল দেবতার মতো পূজ্য। ব্রাহ্মণ ব্যতীত এসব গ্রন্থ সাধারণ লোকে ছোঁয়া ও পড়া পাপ মনে করত। এবং যাঁরা এসব গ্রন্থ লিখতেন ও পড়তেন তাঁদের মনে করা হত দেবতুল্য। তাই অজ্ঞানী লোকের কাছে তখনকার গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি যেমন ছিল অতীব মূল্যবান, তেমনি মূল্যবোদ্ধা জ্ঞানী লোকেরাও একে সংরক্ষণ করতেন সযত্নে। এরপরে ক্রমে ক্রমে যেমন বেড়েছে পণ্ডিতের সংখ্যা তেমনি বেড়েছে গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপির সংখ্যাও। প্রাচীন যুগে বিদ্যাদানের ব্যাপারে কোন উদারতা ছিল না। সবকিছু গোপন করে রাখাই যেন ছিল তখনকার নিয়ম। এই গোপনীয় ভাবটা মধ্যযুগের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ছিল প্রবল। সে সময় কবি বা পণ্ডিতগণ তাঁদের প্রতিভাকে অন্যত্র প্রকাশ করাকে মনে করতেন হীনতা। ফলে যেমন গোপন করে রাখতেন লিখিত বস্তু, তেমনি গোপন করতেন তাঁদের নাম পরিচয়। এ হেতু প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের অধিকাংশের সঠিক সময় আজও নির্ণীত হয়নি। শুধু সংস্কৃত কবিদের ক্ষেত্রেই নয়, এই সময়ের বাংলা কবিদের নিয়েও পড়তে হয় একই সমস্যায়। বিদ্যার প্রসার সম্পর্কে প্রাচীন যুগের সীমাবদ্ধতা এবং গোপনীয়তা অনুসরণে সম্ভবত মধ্যযুগেও বিদ্যার বিস্তার অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই সময়ে কোন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বাধীনে নিজস্ব সম্পদ রূপেই রক্ষিত হত। যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে— বিদ্যা সম্পর্কে এই মতের তারা বিপক্ষে ছিলেন। ফলে নিজস্ব পাণ্ডুলিপি অপরকে পড়তে বা অনুলিপি করতে দিতেন না। এ হেতু অনেক কবি বা গ্রন্থের অধিকর্তা তাদের গ্রন্থশেষে অভিসম্পাতমূলক বাক্য লিখে রাখতেন। যেমন—

> 'এই পুস্তক যে চুরি করিবে সে শ্বাশুরে হইবেক আর পুত্রবধূকে হরণ করিবে।'[১৬]
>
> 'এই গ্রন্থ যে জানিবার স্বরূপ চুরি করিয়া রাখিবেক সেই মহাপাপের পাতকি। সে বিয়্যান্যা হইবেক।'[১৭]

তবে এ অভিসম্পাতমূলক শব্দ বা বাক্যাবলী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লিখতেন লিপিকররা। অপর কেউ যাতে তার গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি চুরি না করে তার জন্য গ্রন্থ শেষে পুষ্পিকা অংশে কটূ ভাষায় নানা বাক্য লিখতেন। যেমন—

(ক) যো মূঢ়োঽপহরেদেতৎ পুস্তকং দুষ্টচেতনঃ।
সত্যমেতস্য ভবিতা পুত্রদারাদিসংক্ষয়ঃ ॥[১৮]

অর্থাৎ—দুষ্টমতি যে মূঢ় এ পুস্তক অপহরণ করবে অবশ্যই তার স্ত্রী পুত্রাদি বিনাশ হবে।

(খ) যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ।
মাতা চ সুকরী তস্য পিতা গর্দ্দভঃ ॥[১৯]

অর্থাৎ—সযত্নে লিখিত এ গ্রন্থ যে ব্যক্তি (যে জন) চুরি করবে তার মা শূকরী এবং পিতা গর্দভ।

(গ) যত্নেন লিখিতং বেদং যশ্চোরয়তি পুস্তকম্।
শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দভঃ ॥[২০]

অর্থাৎ—সযত্নে লিখিত এ বেদ গ্রন্থ যে চুরি করবে তার মা শূকরী এবং পিতা গর্দভ।

(ঘ) পুঁথি চুরি করে যে শূকর তাহার পিতা গাধা হয় সে।[২১]

(ঙ) জতনে লিখিলাম পুস্তক যে করিবে চুরি,
বাপ হয় গাধা তার মা হয় কুকুরী ॥[২২]

কোন লিপিকর পুষ্পিকাংশে অভিশাপের সঙ্গে সঙ্গে নানা উপদেশ বাক্যও লিখতেন।

যেমন—

(ক) যস্য হস্তগতং ভূয়াদেত্তস্মৈ নিবেদয়ে।
প্রাণতুল্যমিদং বক্ষ্যং পণ্ডিতস্যৈব পুস্তকম্ ॥[২৩]

অর্থাৎ—এ পুস্তক যার হস্তগত হবে তার প্রতি নিবেদন—পুস্তক প্রাণতুল্য—একথা পণ্ডিতেরই।

(খ) এই পুঁথি লিখিবেক সে বৈকুণ্ঠ পাইবে।
এই কথা শুনে ভাই স্বর্গে যাইবে ॥[২৪]

তখনকার দিনে পাণ্ডুলিপি সুন্দররূপে রক্ষা করার যে একটা চেষ্টা বা পরিকল্পনা ছিল তা উপর্যুক্ত শ্লোক প্রমাণ করে।

মধ্যযুগের শেষার্ধ থেকে ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। এই সময় কোন গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপির অসংখ্য অনুলিপি-প্রতিলিপি হয়েছে। তখন শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুর বাহন ছিল পাণ্ডুলিপি। ধর্ম,

অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ সাধনার জন্য প্রত্যেক কুলীন পরিবার বা ভদ্র ঘরেই তখন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ছিল অপরিহার্য। হিন্দুদের ঘরে এবং মন্দিরে থাকত বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনী, পদাবলী প্রভৃতি। প্রতি হিন্দু পরিবারে পূজিত হতেন কাশীরাম, কৃত্তিবাস। মুসলমানদের ঘরে এবং মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসাতে থাকত কোরান, কালাম, কেচ্ছা, বয়েতের পুঁথি, নস্তালিকা কিংবা শিকস্তা। পড়ুয়াদের খুঙ্গিতে এবং গুরুমশায়দের টোলে থাকত অমর, মাঘ, কালিদাস, ভবভূতি, পিঙ্গল, পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন প্রভৃতি লেখকের নানাগ্রন্থের অনুলিপি। স্মৃতি, তন্ত্র, কবিরাজি, হেকিমি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রেরও বহুল প্রচার হত হাতে লেখা অনুলিপির মাধ্যমে। অর্থাৎ হিন্দু মুসলিম সব জাতির কাছেই তখন পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

তখন পাণ্ডুলিপির অনুলিপিকরণ এবং পাণ্ডুলিপি দান পুণ্য কর্ম বলে বিবেচিত হত। অনেকের পাণ্ডুলিপি নকল বা অনুলিপিকরণ ছিল প্রধান পেশা। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তারা পাণ্ডুলিপির অনুলিপি করত। হাতের লেখা ভাল হলে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে গ্রহণ করত এ পেশা; অবিরামভাবে ব্যাপৃত থাকত পাণ্ডুলিপির অনুলেখনে। যদিও বিনিময়ে তারা পেত না তাদের ন্যায্যমূল্য। অনেকে আবার গ্রন্থ লেখা শেষ হলে পুষ্পিকা অংশে তাদের প্রাপ্ত পারিশ্রমিক বা দক্ষিণার কথা লিখে রাখতেন। যেমন—

(ক) "এই পুথির মালিক শ্রী শেখ আওয়াজ সাং নেতাপনা। এহার দক্ষিণা ।০ এক যুকার ধান্য দিয়াছিল। আমি সন্তুষ্ট আছি সন ১২৩৫ সাল তারিখ ১৬ অগ্রাণ বেলা চারি দণ্ডের সময়।"[২৫]

(খ) "এহার দক্ষিণা ৷৷০ আনা"।[২৬]

লিপিকররা কোন গ্রন্থ অনুলিপিকরণের পর কিরূপ সম্মানী পেত তা তখনকার পুথির মূল্যের অঙ্ক থেকেও অনুমান করা যায়। এ প্রসঙ্গে নিম্নের উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য—

"শ্রীরামপুরের ওয়ার্ড সাহেব ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যা দাম দেখেছিলেন, তার একটা হিসেব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে হাতে লেখা 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ তিন টাকায় বিক্রি হত, যদি হাতের লেখা সুন্দর হত। আর তা না হলে নীচের দিকে দেড়টাকা পর্যন্ত। হাতে-লেখা 'অমরকোষ' তিন টাকায় বিক্রি হত। ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন যে নকল করবার জন্য লিপিকরদের বত্রিশ হাজার অক্ষরের জন্য বারো আনা দেওয়া হত। অনেকে আবার টাকার সঙ্গে লিপিকরদের এক জোড়া কাপড় ও মিষ্টান্ন দিত, অনেকের আবার যাবজ্জীবন ভরণপোষণের কথাও শোনা যায়।"[২৭]

এদেশে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির অনুলিখনে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে তখন, পাশ্চাত্য প্রভাবে যখন আগমন ঘটেছে কলের কাগজ ও মুদ্রণ যন্ত্রের। এ যন্ত্র থেকে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প শ্রম ও মূল্যে একের পর এক মুদ্রিত হতে থাকে বিভিন্ন গ্রন্থ। তখন ইংরেজ-

সংস্কৃতির প্রভাবে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত পণ্ডিত ব্রতী হন ইংরেজী শিক্ষায়। ক্রমে ক্রমে বিদেশী সাহিত্যাদির কদর প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। আর ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে দেশী সাহিত্য এবং হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির কদর। এক সময় সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতদেরই নিজস্ব সম্পদরূপে রক্ষিত থাকত হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি। আর সাধারণ মানুষ ছিল পাণ্ডুলিপির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অর্থাৎ তখন পাণ্ডুলিপি পাঠ কিংবা বিদ্যাচর্চার অধিকার সাধারণ মানুষের ছিল না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের জোয়ারে সেই উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত পাণ্ডিতেরা গা ভাসিয়ে সব কিছু যখন ভুলতে বসেছিলেন তখন সমাজের সেই অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষরাই প্রাচীন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরেন। পাণ্ডুলিপির ব্যবহার তখন সীমিত হয়ে পড়েছিল সমাজের সেই ইংরেজী না জানা সাধারণ মানুষের মধ্যে। "পাঁচালীর বদনামে দেশের কাব্য, সঙ্গীত, চিকিৎসা, জ্যোতিষের গ্রন্থরাজি একেবারে উপেক্ষিত হইয়া পড়িল পাশ্চাত্য সংস্কৃতিমুগ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট।"[২৮]

এই সময়ে সমাজের উপরে ছাপাখানার এই গভীর প্রতিঘাতকে ঘৃণা করত ধর্মান্ধ সনাতনপন্থী কিছু পণ্ডিত। তারা মুদ্রিত গ্রন্থকে মনে করত অস্পৃশ্য। এমনকি মুদ্রিত গ্রন্থের প্রতি তাকানোও গুরুতর পাপ বলে মনে করত। হিন্দু ধর্মকে নষ্ট করার একটা যন্ত্র হিসেবে ছাপাখানাকে দেখত। ফলে ছাপাখানা প্রবর্তনের পরেও বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পাণ্ডুলিপির হস্তানুলিখন হয়েছে। কাজেই এই সময়ে পাণ্ডুলিপির অনুলিখনের জোয়ারে বাধা পড়লেও ভাটার টানে একেবারে শুকিয়ে যায় নি। কোথাও কোথাও বাধাকে অতিক্রম করে অনুলিখন চলেছে সমান গতিতে। বর্তমান ভারতে প্রাচীন ঐতিহ্যের সেই ধারা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও ভারতের অনেক জায়গায় পাণ্ডুলিপির অনুলিপি বা প্রতিলিপি করা হচ্ছে। তবে অনুলিপিকরণের ধারা ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে পাণ্ডুলিপি হাতে লেখা হচ্ছে শুধুমাত্র প্রাচীন ঐতিহ্যকে রক্ষা করবার জন্য।

"সংস্কৃতির চর্চ্চা করেন অথচ ইংরেজী জানেন না এইরূপ ব্যক্তিদের নিকট পুঁথির আদর এখনও কম নহে। বহুস্থানে এখনও সশ্রদ্ধ সংস্কারে গ্রন্থ নকল হচ্ছে আমি জানি। বিশেষ করিয়া তিলি, মালি, সদগোপ, কামার, কুমোর, তাঁতি, ছুতার, বেনে, মাহিষ্য, যুগী, পোদ, রাজবংশী, ধোপা, কলু, বাগ্‌দী, ডোম, চাঁড়াল, নমঃশূদ্র প্রভৃতি এই সব বর্ণের যাঁহারা পূজা-অর্চ্চনা লইয়া থাকেন তাঁহাদের "পণ্ডিত", "দেয়াসী", "দেউলে" শ্রেণীর দরিদ্র লোকের ভিতর। তাঁহারা বিভিন্ন পূজা পর্ব্বে এখনও মঙ্গলকাব্যাদি গান করিয়া থাকেন। কোথাও কোথাও চৌপাড়ি পরিচালনাও করেন। দুর্গাপূজায় চণ্ডীমঙ্গল মনসামঙ্গল, ধর্মঠাকুরের বারমতি গাজনে ধর্ম্মমঙ্গল গান এখনও বহুস্থলে "বাঁধা-আসরে" হইয়া থাকে।"[২৯]

এক সময় পাণ্ডুলিপি ছিল মুনি-ঋষি ও গুরুর ব্যক্তিগত আশ্রয়ে। পরে রাজা বাদশা ও সমাজের পণ্ডিত শ্রেণীর আশ্রয়ে। তারও পরে আশ্রয় পেল সব শ্রেণীর মানুষের ঘরে ঘরে। আর বর্তমানে আশ্রয় পেয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরীতে।

প্রাচীন কালের মত ততটা না হলেও এখনও পাণ্ডুলিপির গুরুত্ব কম নয়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মানুষের গবেষণার উপকরণ যুগিয়ে চলছে এই ধূলি-মলিন জীর্ণ পাণ্ডুলিপিগুলি। মানুষ এখনও বিশ্বাস করে ঐ জীর্ণ পত্রে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কোন অমূল্য সম্পদ। তাইতো বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত হচ্ছে অতি সযত্নে।

তথ্যসূত্র

১. শ্রীজাহ্নবী চরণ ভৌমিক, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮২, পৃ. ৩১
২. ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৮।
৩. ডঃ যোগীরাজ বসু, বেদের প রিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৭৩।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
৫. ঐ, পৃ. ২০।
৬. রবীন্দ্রনাথ ঘোষঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
৭. ১৩১৩ বঙ্গাব্দে লিখিত 'সাহিত্যসম্মিলন' প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।
৮. প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৫৮, কলিকাতা।
৯. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-৪৬০৮।
১০. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-৬৩।
১১. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-৪৯৫।
১২. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-২৩৯৭।
১৩. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-২৮৩১
১৪. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-৫০৮৩
১৫. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-৩৪৩৭
১৬. শ্রীতারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য সংকলিত 'বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ,' ৩য় খণ্ড ৩ সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯০।
১৭. ঐ
১৮. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-২৫৯৮।
১৯. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির পুথি সংখ্যা-৩৬।
২০. কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি পু. সংখ্যা-৫২০৪।
২১. বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা-১৭৮।
২২. বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা-২২০।
২৩. ঢা. বি. পা. সংখ্যা-২৫৯৮।
২৪. বিশ্বভারতী পুথি সংখ্যা-২২৭।
২৫. বিশ্বভারতী পুথি সং-১৫৪৩।
২৬. বিশ্বভারতী পুথি সং-৮৪৭।
২৭. শ্রীঅতুল সুর, বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৮৫, পৃ. ৩৪-৩৫।
২৮. পঞ্চানন মণ্ডল—পুঁথি পরিচয় ১ম খণ্ড, কলিকাতা, অঢ়া ১৩৫৮, পৃ. ১০।
২৯. পঞ্চানন মণ্ডল, পুথি পরিচয়, প্রাগুক্ত পৃ. ১০।

চতুর্থ অধ্যায়

পাণ্ডুলিপি পরিচায়ন পদ্ধতি

ক. পরিচায়ন কি

কোন অপরিচায়িত পাণ্ডুলিপি সর্বসাধারণের সম্মুখে পরিচিত করণকে পুথি পরিচায়ন বলা হয়।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পাণ্ডুলিপির বহিরঙ্গ বা বহিরাবয়ব সম্পর্কিত বিষয়ে যথাসম্ভব পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। এবার সম্পূর্ণ অপরিচায়িত (unidentified) কোন পাণ্ডুলিপি কি প্রকারে সাধারণভাবে পরিচায়িত করা সম্ভব সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক। এখানে বিশেষভাবে সংস্কৃত ও বাংলা পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, সংস্কৃত ও বাংলা পাণ্ডুলিপির জন্য কিছু অতিরিক্ত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পরিচায়িত করতে হলে পাণ্ডুলিপি পাঠকের সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির একটি বৃহদংশ বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, তন্ত্র, মন্ত্র, কবচ, জ্যোতিষ, স্তোত্র, নীতিশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা, বিভিন্ন ব্যাকরণ, গণিতশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, প্রণয়োপাখ্যান, সওয়াল সাহিত্য, চরিত, পীর-পাঁচালী প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় লিখিত পুথি।

খ. পাণ্ডুলিপি পরিচায়ন পদ্ধতি

পুথিপরিচায়ন পদ্ধতি দুইভাগে বিভক্ত।

১. সংক্ষিপ্ত পুথি পরিচিতি
২. বর্ণনামূলক পুথি পরিচিতি

১. সংক্ষিপ্ত পুথি পরিচিতি : এ পদ্ধতিতে একটি পুথির সামগ্রিক বর্ণনা সংক্ষিপ্তাকারে লিখিত হবে। যেমন—(ক) পুথির সংগ্রহ সংখ্যা। (খ) পুথির নাম। (গ)

বিষয়। (ঘ) রচয়িতার নাম। (ঙ) লিপিকরের নাম। (চ) টীকাকারের নাম। (ছ) রচনাকাল। (জ) লিপিকাল। (ঝ) টীকাকাল। (ঞ) পত্রসংখ্যা। (ট) উপাদান। (ঠ) উপকরণ। (ড) অবস্থা (ঢ) পরিমাপ। (ন) প্রাপ্তিস্থান।

২. **বর্ণনামূলক পুথি পরিচিতি :** এ পদ্ধতিতে কোন পুথির সার্বিক পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হবে। এ পদ্ধতিতে একটি পুথির সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুটিত হয়। এখানে সংক্ষিপ্ত পুথি পরিচিতির সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে এবং এ ছাড়াও পুথির লিখনরীতি, যেমন—পত্রাঙ্ক কোথায় কিরূপে লিখিত হয়েছে। প্রতিপত্রে কত পংক্তি লিখিত হয়েছে। সম্পূর্ণ পুথিটি একজন লিপিকর না একাধিক লিপিকর দ্বারা লিখিত হয়েছে, লিপিকরের হস্তাক্ষর কিরূপ। কালাঙ্ক কোন পদ্ধতিতে, কিরূপে এবং পুথির কোথায় লিখিত হয়েছে প্রভৃতি পুথি মধ্যস্থিত সামগ্রিক বিষয় উপস্থাপিত হবে। এর সঙ্গে নমুনাস্বরূপ পুথির প্রথম, মাঝের ও শেষের কিছু অংশের পাঠ এবং পুষ্পিকা, ভণিতা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অংশের আক্ষরিক কিছু পাঠ লিখিত হবে।

গ. পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের কতিপয় সহজ নিয়ম

১. **বিষয় নির্ধারণ :** পাণ্ডুলিপির বিষয় নির্ধারণের প্রধান সমস্যা হল অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতেই বিষয় সম্পর্কে কোন লিখিত বক্তব্য থাকে না। তদুপরি অনেক পাণ্ডুলিপির আবার সম্পূর্ণ অংশও পাওয়া যায় না। কখনও কখনও পাণ্ডুলিপির মধ্যভাগের কিংবা অন্য কোন অংশের সামান্য কয়েকটা পত্র মাত্র পাওয়া যায়। এমন কি কখনও কেবলমাত্র একটি পত্রেরই প্রাপ্তি সম্ভব হয়। এসব ক্ষেত্রে বিষয় নির্ধারণ করা খুবই দুরূহ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণের কয়েকটি পন্থা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল। যে সকল বিষয় অবলম্বনে পাণ্ডুলিপি প্রণীত হয়েছে সে সম্পর্কেও এ আলোচনার মাধ্যমে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অপরিচায়িত পাণ্ডুলিপির বিষয় নির্ণয় হয়তো সহজতর হবে।

(i) বেদ : এক কথায় 'বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা লাভ করা যায় না সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এ কারণে এ গ্রন্থকে বলা হয় বেদ। ঋক্, সাম, যজু: ও অথর্বভেদে বেদের চারটি ভাগ আছে।

ঋগ্‌বেদ : বেদের যে সকল মন্ত্রে অর্থানুসারে ছন্দ ও পাদব্যবস্থা আছে সেই মন্ত্রসমূহকে বলা হয় ঋক্। এই ঋক্ মন্ত্রের সংগ্রহই হচ্ছে ঋগ্‌বেদ।

সামবেদ : গীতিরূপ মন্ত্র অর্থাৎ গানযুক্ত ঋক্‌কেই বলা হয়েছে 'সাম'। এই সাম মন্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থই সামবেদ। সামবেদের মন্ত্রসমষ্টির ৭৫টি ব্যতীত আর সকল মন্ত্রই ঋগ্‌বেদে পরিদৃষ্ট। ঋক্ মন্ত্রের ওপর সাতটি স্বর প্রয়োগ করে বিভিন্ন ছন্দে বাদ্যযন্ত্র যোগে সামগান করা হত।

যজুর্বেদ : ঋক্ ও সাম ভিন্ন মন্ত্রসমষ্টি অর্থাৎ যজুর্মন্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থই যজুর্বেদ। ঋক্ ও সাম সম্পূর্ণ পদ্যময় হলেও যজুর্মন্ত্র পদ্য ও গদ্য মিশ্রিত। যজুর্বেদেই গদ্যের প্রথম নির্দশন পাওয়া যায়। যাগ-যজ্ঞের প্রক্রিয়ার অধিকাংশ নিয়ম-পদ্ধতি এই বেদে নিবদ্ধ।

অথর্ববেদ—এই বেদের একটি প্রাচীন নাম 'অথর্বাঙ্গিরস'। ভেষজ বিদ্যা ও শান্তি/পৌষ্টিক ইত্যাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়া এবং শত্রুবধের নিমিত্ত মারণ ও উচাটনমূলক অমঙ্গল অভিচার ক্রিয়াদির বিষয় এই বেদে স্থান পেয়েছে। ঋক্ মন্ত্র থেকে এই বেদের একটি বিরাট অংশে গৃহীত হলেও প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যা, নানাবিধ রোগ থেকে আরোগ্যের উপায় প্রভৃতি এখানে আলোচিত হওয়ায় অথর্ববেদ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে আবার চারটি পৃথক স্তরে ভাগ করা যায়। এগুলি নিম্নরূপ :

সংহিতা : সংহিতা অর্থ সংগ্রহ অর্থাৎ বেদমন্ত্রের সংগ্রহ। পৃথক পৃথক শ্রেণী বিন্যাসক্রমে বেদমন্ত্রসমূহকে ঋক্, সাম, যজুঃ এবং পরে স্বতন্ত্রভাবে অথর্ব এই চারভাগে সংগ্রহ করা হয়েছে। অথর্ব সংহিতার মন্ত্র ঋক্ ও যজুঃ-র মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় বলে অনেকের কাছে অথর্বের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার্য নয়।

ব্রাহ্মণ : বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা যে গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার নাম ব্রাহ্মণ। যাগ-যজ্ঞ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এ গ্রন্থে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ গদ্যাকারে লিখিত। প্রতি বেদেরই স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণগ্রন্থ আছে। সমগ্র ব্রাহ্মণ সাহিত্য বেদের কর্মকাণ্ড নামে অভিহিত।

আরণ্যক : কর্মবিষয়ক যাগ-যজ্ঞ এবং জ্ঞান বিষয়ক ব্রহ্ম-সম্পর্কিত মিশ্র আলোচনা আরণ্যক সাহিত্যে পরিদৃষ্ট।

গদ্য ও পদ্য দুইয়ের সংমিশ্রণে আরণ্যক লিখিত। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী সময়টাই আরণ্যক কাল। অনেকে পৃথকভাবে আরণ্যককে স্বীকার করতে চান না। এটিকে তাঁরা উপনিষদ হিসেবেই আখ্যায়িত করতে চান।

উপনিষদ : এ অংশটি বেদের জ্ঞানকাণ্ডনামে অভিহিত। সম্পূর্ণজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মসম্পর্কিত আলোচনা উপনিষদের বিষয়বস্তু। উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম। উপনিষদ বলে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অধিকাংশ উপনিষদই ছন্দোবদ্ধভাবে গদ্যাকারে লিখিত। তবে কিছু কিছু উপনিষদ আছে যেগুলি গদ্য-পদ্য মিশ্রিত। কয়েকটি উপনিষদে গল্পাকারে ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিবেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ আছে।

উপরি উক্ত বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল তার সাহায্যে এ শ্রেণীর পাণ্ডুলিপি-নির্ণয় অর্থাৎ বেদ-বিষয়ক পাণ্ডুলিপি-নির্ণয় অনেকখানি সহজতর হবে বলে আমার ধারণা।

ii. পুরাণ : অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ নিয়ে পুরাণের সংখ্যা মোট ৩৬টি। বায়ু পুরাণে পুরাণের পাঁচটি লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। লক্ষণ ৫টি হল—

১. সর্গ (সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা);
২. প্রতিসর্গ (প্রলয়কালে পূর্বসৃষ্টির ধ্বংসের পর নূতন সৃষ্টির বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা);

৩. বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশ বর্ণনা);
৬. মন্বন্তর (মনুগণের শাসন কাল সম্পর্কে আলোচনা);
৫. বংশানুচরিত (নৃপতিগণের বংশের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে এই লক্ষণগুলি কেবল ১৮শ উপপুরাণ সম্পর্কে প্রযোজ্য। অষ্টাদশ মহাপুরাণের এই পাঁচটি ছাড়া আরও ছয়টি লক্ষণ রয়েছে। লক্ষণগুলি হল ভুবনবিস্তর, দানধর্মবিধি, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রম বিভাগ, ইষ্টাপূর্ত ও দেবতা প্রতিষ্ঠা। অতএব কোন পুরাণের খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিতে পুরাণের নাম পাওয়া না গেলেও এসব লক্ষণগুলি দেখে বোঝা যাবে যে এটি পুরাণ গ্রন্থ।

iii. রামায়ণ : রামায়ণ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা, সুন্দর এবং উত্তরকাণ্ড। প্রতিটি কাণ্ড একাধিক সর্গ বা অধ্যায়ে বিভক্ত। রামায়ণ সূর্য বংশীয় রাজাদের কাহিনী নিয়ে রচিত। এ মহাকাব্যের প্রধান চরিত্র বা নায়ক রাম। 'বিষয়' পরিচায়নের ক্ষেত্রে কাব্যের বিষয়বস্তু এবং কাণ্ড দেখে সহজেই বোঝা যাবে এটি রামায়ণ গ্রন্থ।

iv. মহাভারত : মহাভারত চন্দ্রবংশীয় রাজা কুরু ও পাণ্ডবদের কাহিনী নিয়ে রচিত। রাজ্যের অংশিদারিত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এর প্রধান উপজীব্য বিষয়। কুরুবংশীয়দের প্রধান ছিলেন দুর্যোধন, আর পাণ্ডবদের প্রধান ছিলেন যুধিষ্ঠির। কাব্যটি ১৮টি পর্বে বিভক্ত। পর্বগুলি হল—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রাস্থানিক এবং স্বর্গারোহণ পর্ব। প্রতিটি পর্ব একাধিক অধ্যায়ে বিভক্ত। পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের ক্ষেত্রে 'পর্ব' এবং বিষয়বস্তু দেখে 'মহাভারত' বলে গণ্য করা যাবে।

v. স্মৃতি : স্মৃতি অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র। 'স্মৃতি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—'যাহা স্মৃত হয় তাহা'। ব্যাপক অর্থে যা শ্রুতি নয় তা-ই স্মৃতি। স্মৃতি দুই প্রকার, প্রাচীন স্মৃতি ও নব্য স্মৃতি। সাধারণভাবে ধর্মসূত্রগুলিকে, বিশেষত শ্লোকাকারে রচিত ধর্মশাস্ত্রগুলিকে প্রাচীন স্মৃতির পর্যায়ে ধরা হয়। এর টীকা, টিপ্পনী, ভাষ্য, সংক্ষিপ্তসার ও তাদের ভিত্তিতে রচিত নিবন্ধগুলিকে নব্যস্মৃতি নামে অভিহিত করা হয়। বৈদিক যাগ-যজ্ঞের নিয়ম-প্রণালী, বিবিধ উপনয়ন, বিবাহাদি, শ্রাদ্ধ ও ধর্মীয় বিভিন্ন বিধি-ব্যবস্থা, ধর্মীয় বিভিন্ন অনুশাসন প্রণালী, যজ্ঞবেদীর পরিমাপ, আকার ও নির্মাণ প্রণালী, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা পদ্ধতি, দেব-বেদী, ঘট, গৃহ প্রভৃতি স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ভুক্ত পাণ্ডুলিপিগুলি স্মৃতি বলে গণ্য হবে।

vi. তন্ত্র : সাধারণত যে শাস্ত্রে রহস্যময় মণ্ডল, মুদ্রা, যন্ত্র, মন্ত্র, চক্র, সিদ্ধি প্রভৃতি বর্ণিত আছে তাকে তন্ত্রশাস্ত্র বলা হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব, শিব ও শক্তি, দেহতত্ত্ব ও মানব প্রকৃতি, আচার, সিদ্ধি, মন্ত্র, যোগ, দীক্ষা এবং অভিষেক (গুরু ও শিষ্য), পূজা (বাহ্য ও মানসিক), শাস্ত্রজ্ঞান, জপ-তপ, পঞ্চতত্ত্ব, স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা, হোম প্রভৃতি বিষয় তন্ত্র হিসেবে গণ্য।

vii. কোষ : কোষ অর্থ অভিধান। অর্থাৎ শব্দ ও লিঙ্গ নির্ণয়ের অভিধান। শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ, কোন শব্দের কোন লিঙ্গ অর্থাৎ লিঙ্গ নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ কোষ নামে অভিহিত।

viii. জ্যোতিষশাস্ত্র : যে শাস্ত্রের মাধ্যমে বিবিধ গ্রহ—নক্ষত্র, বৎসর, মাস, বার, পক্ষ, রাশিচক্র, কোষ্ঠীনির্ণয়, জাতকনির্ণয়, সময় নির্ণয়, যাত্রার শুভাশুভ, বিবাহের বিভিন্ন লক্ষণাদি এবং শুভাশুভ, অন্নপ্রাশন, নবান্ন, বৃক্ষরোপণাদি ব্যবস্থা, শস্যছেদন, মোক্ষ, দীক্ষা প্রভৃতি বিষয় এবং যাকে ভিত্তি করে মানুষের ভাগ্যের শুভাশুভ ফল সম্পর্কে জানা যায় সেই শাস্ত্রকে জ্যোতিষশাস্ত্র বলে। বিভিন্ন চক্র, গণনাপদ্ধতি এবং আনুষঙ্গিক লক্ষণাদি বিচারের মাধ্যমে এই ফলাফল নির্ণয় করা হয়। অতএব উপরিউক্ত লক্ষণগুলি দেখে পাণ্ডুলিপিকে সহজেই জ্যোতিষশাস্ত্র বলে নিরূপণ করা যায়।

বিষয়ের কথা পরিষ্কার রূপে লেখা না থাকলেও অনেক সময় কেবল গ্রন্থের শিরোনামের মাধ্যমে বিষয় নির্ধারণ করা সম্ভব হতে পারে। যেমন—অভিষেক বিধি, নারদসংবাদ, হরপার্বতী-সংবাদ, সত্যকলিবিবাদ, সতীময়না-লোরচন্দ্রানী, পদ্মাবতী, নীতিশতক, অপদেশশতক, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বেণীসংহার, মেঘদূত, হংসদূত, কপিদূত, হর্ষচরিত, অমরার্থচন্দ্রিকা, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, দেবীমাহাত্ম্য, মঠপ্রতিষ্ঠা, জাতক নির্ণয়, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, বিরাটপর্ব, অযোধ্যাকাণ্ড ইত্যাদি। এখানে গ্রন্থের নাম দেখে বা পড়েই আমাদের বিষয় সম্পর্কে একটা ধারণা হয়ে যায়। যখন এই নামের মাধ্যমেও বিষয় সম্পর্কে ধারণা করা না যায় কিংবা ধারণা করা গেলেও সঠিক বস্তু সম্পর্কে হতে হয় দ্বিধান্বিত তখন ঐ নামের সূত্র ধরে 'বর্ণনামূলক ক্যাটালগ' (Descriptive Catalogue) খুঁজলে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যেতে পারে। যেক্ষেত্রে কোন খণ্ডিত পত্রে নামও থাকে অনুল্লিখিত সেক্ষেত্রে ঐ পত্রটির বিষয়ের কোন বিশেষ সূত্র ধরে তৎসম্পর্কিত কোন অনুমিত গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে অথবা 'বর্ণনামূলক ও সংক্ষিপ্ত' ক্যাটালগের সাহায্যে অনুমিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে অনুসন্ধান চালাতে হবে। এভাবে কেবল অনুসন্ধানের মাধ্যমেও সম্ভব হতে পারে গ্রন্থের বা পাণ্ডুলিপির বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

২. নাম নির্ধারণ

পাণ্ডুলিপির পরিচায়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয় হল এর নাম নির্ধারণ করা। সাধারণত গ্রন্থের নাম পাণ্ডুলিপির প্রথম পত্রে ও শেষ পত্রে পুষ্পিকা অংশে লিখিত হয়ে থাকে। তবে একাধিক পরিচ্ছেদে (বা অধ্যায়, পটল, খণ্ড ইত্যাদিতে) বিভক্ত কোন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির একটি পরিচ্ছেদ (বা অধ্যায়াদি) শেষ হওয়ার প্রাক্কালে লেখা থাকে উক্ত গ্রন্থের নাম। রামায়ণ, পুরাণ, মহাভারত, কাব্য, নাটক প্রভৃতিতে সাধারণত প্রথম পত্রে নাম লিখিত হয় নি, হয়েছে পরিচ্ছেদ শেষে এবং গ্রন্থশেষে। যেমন—

পরিচ্ছেদশেষে—

(i) ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে অনুক্রমণিকা নাম শততমোহধ্যায়ঃ।'[১]

(ii) ইতি মহাভারতে বিরাটপর্ব্বনিপাণ্ডবমন্ত্রে চতুর্থোহধ্যায়ঃ।[২]

(iii) ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্তখণ্ডে শিক্ষা শ্লোকার্থানুস্বাদনং নাম বিংশতিঃপরিচ্ছেদঃ।[৩]

(iv) ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে গয়াবিহারাদি-পুনঃ গৃহাগমনং নাম ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ।[৪]

(v) ইতি শ্রীমুক্তাচরিত্রে শ্রীকৃষ্ণস্য নিষ্কৃতিকরণং নাম চতুর্থঃ স্তবকঃ।[৫]

(vi) ইতি শ্রীকর্ণানন্দে সন্দেহচ্ছেদনং নাম সপ্তমঃ নির্য্যাসঃ।[৬]

গ্রন্থশেষে—

(i) ইতি শ্রীচন্দ্রমাণিক্যদেবরচিতমপদেশশতকং সমাপ্তম্।[৭]

(ii) ইতি মহামহোপাধ্যায়—শ্রীরঘুনন্দন-ভট্টাচার্য-বিরচিতং শুদ্ধিতত্ত্বং সমাপ্তম্।[৮]

(iii) ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সূত্ররূপ আদিলিলা সমাপ্ত।[৯]

(iv ইতি মেদিনিকৃতোহনেকার্থ-কোষঃ সমাপ্তঃ।[১০]

(v) ইতি বন্দ্যঘটীয়-হরিহর-ভট্টাচার্য্যাত্মজশ্রীরঘুনন্দন-ভট্টাচার্য্য-বিরচিত স্মৃতিতত্ত্বে একাদশীতত্ত্বং সমাপ্তম্।[১১]

(vi) ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজএ অষ্টাদসে জুধিষ্ঠির স্বর্গারোহপর্ব্বং সমাপ্তম্।[১২]

(vii) ইতি বিদ্যালঙ্কারকৃতঃসারসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ।[১৩]

(viii) ইতি হোরাষট্‌পঞ্চাশিকা সমাপ্তা।[১৪]

তন্ত্র, মন্ত্র, কবচ, বৈদ্যক, জ্যোতিষ প্রভৃতিতে গ্রন্থের নাম লিখিত হয়েছে সাধারণত প্রথম পত্রে ও শেষ পত্রে। যেমন—

প্রথম পত্রে—

(i) ওঁ নমো গণেশায় ॥
অথ জাতকপ্রকরণম্ ॥[১৫]

(ii) ওঁ নমো গণেশায় ॥
অথ সংক্ষেপকেরালী লিখ্যতে ॥[১৬]

(iii) অথ শণিচক্রং ॥
শনি চক্রং নরাকারং লিখিত্বাসৌরভাদিতঃ।
গ্রন্থশেষে—
ইতি শনিচক্রং সমাপ্তং লিখিতং শ্রীরোহিণীচন্দ্র শর্ম্মা।[১৭]

(iv) অথ যোনিতন্ত্রম্ ॥
গ্রন্থশেষে—
ইতি যোনিতন্ত্রং সমাপ্তম্ ॥[১৮]

(শ) অথ নৈমিত্তিক বিধি।

গ্রন্থশেষে—

ইতি শ্রীরাজকৃষ্ণ বিদ্যানিবাস কৃত নৈমিত্তিক বিধি সমাপ্তম্ ॥

আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে যদি প্রথম ও শেষ পত্রে গ্রন্থের নাম লেখা না থাকে কিংবা প্রথম ও শেষ দিকের কিছু পত্র খণ্ডিত থাকে তাহলে ভিতরে পটল বা বিভাগকৃত

বিষয়ের শুরু বা শেষের প্রতি নিবদ্ধ করতে হবে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি (অনেক গ্রন্থে মূল বিষয়কে একাধিক অংশে বিভক্ত করা থাকে, যেমন—জ্যোতিস্তত্ত্ব গ্রন্থের বিভক্ত কয়েকটি অংশ—লগ্ন নির্ণয়, জাতক নির্ণয়, যাত্রা নির্ণয়, অন্নপ্রাশন, নবান্ন, বৃক্ষরোপণাদি ব্যবস্থা, শস্যছেদন, গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি)। এখানেও যদি নাম না থাকে বা নাম সম্পর্কে কোন ধারণা না জন্মে তাহলে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে হবে এবং তখন হয়তো কোথাও না কোথাও পৌঁছে যাওয়া যাবে ঈপ্সিত লক্ষ্যে অর্থাৎ প্রাপ্তি ঘটবে সেই কাঙ্ক্ষিত নামের। এ ক্ষেত্রে বিষয় অনুসন্ধানের পন্থা অর্থাৎ অনুমতি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়েও নামোদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে।

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থারম্ভে কিংবা পরিসমাপ্তিতে রচিত শ্লোকের মধ্যেও নাম পাওয়া যেতে পারে। যেমন—

গ্রন্থারম্ভে—

(i) ওঁ নমো গণেশায় ॥
বন্দেহংপরমানন্দমজ্ঞানতিমিরাপহম্।
ভবসাগরপারায় গীতং বেদন্তৈর্মুহুঃ ॥
বিদ্যালঙ্কারবিখ্যাতহৃদয়ানন্দশর্ম্মণা।
জ্যোতিঃশাস্ত্রং সমালোক্য ক্রিয়তে সারসংগ্রহঃ।[১৯]

(ii) ওঁ নমো শিবায় ॥
মনশ্চিন্তিতবস্তূনাং শ্রোত্রপ্রত্যাকারিণীম্ ॥
তাং বর্ণরূপিণীং বন্দে ভারতীং ভক্তবৎসলাম্ ॥
বিনালগং বিনাভাবং বিনাগ্রহবিচারণম্।
অদৃশ্যদর্শনার্থায় প্রশ্নবিদ্যাং নিরূপ্যতে ॥[২০]

(iii) ওঁ নমো গণেশায় ॥
দেবতায়াঃ পদদ্বন্দ্বং প্রকৃতৈঃ পুরুষস্য চ।
শ্রীগুরোঃ পাদপদ্মঞ্চ নত্বা শ্রীরামকৃষ্ণজঃ ॥
ভূদেবোরামগোবিন্দঃ শিষুনামাশুবুদ্ধয়ে।
শাস্ত্রং বীক্ষ্যাতিসংক্ষেপাৎ তনোতি জ্যোতিরাকরম ॥[২১]

(iv) ওঁ নমো গণেশায় ॥
তৃষ্ণাতরঙ্গদুস্তরসংসারাম্ভোধিলঙ্ঘনে তরণিঃ।
উদয়বসুধাধরারুণমুকুটমণিঃ পাতু বস্তরণিঃ ॥
অস্তং গতবতি মিহিরেহতিমলিনদোষাকুলে চ গোবিভবে।
উদ্বাহাদিষু শুদ্ধিগ্রহণার্থং দীপিকা ক্রিয়তে ॥[২২]

গ্রন্থ সপাপ্তিতে—

(i) শক-দৃগশ্ব-শক্রে-নভসি নভোমণি-দিনে।
ষষ্ঠ্যাং ব্রজপতিসদ্মনি রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকা দীপি ॥[২৩]

(ii) শাকে চন্দ্রগজাগগোত্রবিধুমে ভালৌস্থিতে শ্রাবণে।
তত্বঞ্চ ব্যবহারকস্য বিধুদোর্মানোগুরোর্বাসরে ॥[২৪]

(iii) জ্ঞানি নিজ গুণে দোষ ঢাকিব অবস্য
সমাপ্ত হইল নটনন্দিনী রহস্য ॥[২৫]

(iv) সহস্রেক সাইট সতেজ সাইত অব্দ আর।
মগি সন এ লিখন সুন পুনর্ব্বার ॥
কহি সুন এ কিতাব নামের মহত।
দুল্লা মজলিস বুলি ঘুসএ জগত ॥[২৬]

(v) শ্রীলোকনাথ প্রভু-পদ হৃদে করি আশ।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস ॥[২৭]

(vi) শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ।
নারদসংবাদ কথা কহে কৃষ্ণদাস ॥[২৮]

(vii) নত্বা স্বপঠায় চ কাব্যচন্দ্রিকাং
মুদালিখৎ শ্রীযুতরামসুন্দরঃ ॥[২৯]

৩. পত্র সংখ্যা

পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের আর একটি মূল্যবান বিষয় হল ক্রমানুসারে পত্র সাজানো। আমরা 'পৃষ্ঠা বলতে যা বুঝি 'পত্র' তা থেকে ভিন্ন। পত্রের পিঠকেই বলে পৃষ্ঠা। অতএব একটি পত্রের এ-পিঠ ও-পিঠ নিয়ে হয় দুই পৃষ্ঠা। পাণ্ডুলিপি পত্র হিসেবেই গণনা করা হয় এবং পত্রের যে-কোন এক পার্শ্বে পত্র সংখ্যা দেয়া হয়। সাধারণত পত্রের যে পার্শ্বে সংখ্যা লিখিত হয় সেই পৃষ্ঠাটি ঐ পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা/পিঠ অর্থাৎ 'খ' হিসেবে ধরা হয় এবং সংখ্যাবিহীন পৃষ্ঠাটি প্রথম পৃষ্ঠা/পিঠ অর্থাৎ 'ক' হিসেবে ধরা হয়। যেমন—৫ (ক) ও ৫ (খ)। তবে পত্রে সংখ্যা লেখা পার্শ্বটি প্রথম পৃষ্ঠা হিসেবে এবং সংখ্যাবিহীন পার্শ্বটি দ্বিতীয় পৃষ্ঠা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এরূপ নির্দশনও বিরল নয়। বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে কোন প্রকারে অস্তিত্ব ও স্থিতি রেখে যে পাণ্ডুলিপিগুলি আমাদের হাতে এসে পৌছেছে, তার সৌন্দর্য যেমন বিনষ্ট তেমনি তা অপরিচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল। অপরিচায়িত পাণ্ডুলিপির পত্রগুলি তাই একদিকে যেমন অবিন্যস্ত, ক্রমবিহীন, অপরদিকে তেমনি একটা বিশেষ বিষয়সম্বলিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে ভিন্ন বিষয়ক পাণ্ডুলিপির পত্রের। এসব ক্ষেত্রে প্রথম কর্তব্য অতিশয় যত্নে ও সচেতনতায় পাণ্ডুলিপির প্রতিটি পত্র অধ্যয়ন করে পত্রের সংখ্যার ক্রমানুসারে তাকে শৃঙ্খলায়িত করা। অনেক সময় দেখা যায়, একটা পাণ্ডুলিপির মধ্যে আর একটা পাণ্ডুলিপির অনুপ্রবেশ এমনভাবে ঘটেছে যে সাধারণভাবে বা একটু অসতর্ক হলে বুঝতে ভুল হতে পারে। যেমন একটা পাণ্ডুলিপির ৪র্থ পত্রের পরে অন্য একটা পাণ্ডুলিপির ৫ম/৬ষ্ঠ পত্র আছে। এখানে ঐ ৪র্থ

পত্রের পর অসতর্কতাবশত ৫ম/৬ষ্ঠ হিসেবে গুণে গেলে সম্পূর্ণ বিষয়টিই ভুল হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি পত্র গণনা করার সময় অতীব নিষ্ঠা এবং সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, একটি পত্রের সঙ্গে অন্য পত্রের লেখার উপকরণ, লেখার রীতি, লিখিত বিষয়বস্তুর মিল আছে কিনা। যেমন—লেখার উপকরণ অর্থাৎ আধার (যার উপর লেখা হত), কালি ও লেখার বিষয় এক, না ভিন্ন; লেখার রীতিই (বৈশিষ্ট্য) বা কেমন, দুইটি পত্রের পঙ্ক্তি সংখ্যা সমান কিনা ইত্যাদি পরীক্ষা করলেই সহজভাবে পার্থক্য ধরা পড়বে। অনেক সময় লেখার উপাদান ভিন্ন কিন্তু বিষয়বস্তু এক এমনও দেখা যায়। তবে এর নিদর্শন খুবই কম। মোট কথা খুব সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি পত্র পরীক্ষা করতে হবে।

ক্রমানুসারে পত্র নির্ধারণের আর একটি জটিল বিষয় হল, অনেক সময় প্রাচীনত্বের জন্য দুই পার্শ্বের সংখ্যা-লেখা অংশটি ভেঙ্গে যায় বা ছিঁড়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে পত্র সাজাতে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

প্রথমত পত্রের ভিতরে যে-শ্লোক সংখ্যা থাকে তার ক্রমানুসারে পত্র সাজানো যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত বিষয়বস্তু অনুসারে পত্র সাজানো যেতে পারে।

তৃতীয়ত অনেক সময় দেখা যায় পত্রেও শ্লোক সংখ্যা থাকে না এবং বিষয়বস্তু অনুসারে সাজাতেও কষ্ট হচ্ছে। সেক্ষেত্রে একটা সহজ উপায়ে সমাধানে আসা সম্ভব। ঐ সমস্যাপূর্ণ পাণ্ডুলিপিটির অন্য কোন কপি আছে কিনা তা ক্যাটালগের মাধ্যমে জেনে কিংবা ওর কোন সম্পাদিত গ্রন্থ থাকলে তা বের করে ঐ পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে নির্ভুলভাবে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে পত্র সাজানো যেতে পারে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে পাণ্ডুলিপিটি সর্বাংশেই সুন্দর রয়েছে, অথচ পত্র সংখ্যা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে দুটো বিষয় বুঝতে হবে। এক, লেখক বা লিপিকরের ভুলবশত হয়তো পত্র সংখ্যা লিখিত হয় নি। দুই, লেখক বা লিপিকর ইচ্ছা করেই হয়তো পত্রসংখ্যা লেখেন নি। অনেক সময় দেখা যায়, লেখক বা লিপিকররা ইচ্ছা করেই পত্র সংখ্যা না লিখে একটি পত্রের শেষ লাইনের কিছু অংশ অন্য পৃষ্ঠার প্রথম লাইনে লিখতেন। তারপরে পৃষ্ঠা থেকে পত্রে এভাবে ক্রম রক্ষা হত। কাজেই পত্র সংখ্যা বিহীন পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে এ বিষয়টার প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত পরিচায়নে পত্রসংখ্যা লেখার নিয়ম নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে। পুথিটি যদি মোট ৫০টি পত্রে সম্পূর্ণ হয় এবং সব কটি পত্রই থাকে তাহলে লিখতে হবে—

(ক) ১-৫০ (সম্পূর্ণ)
আর যদি অসম্পূর্ণ হয় তাহলে শুধু যে পত্রগুলি আছে তার সংখ্যাই উল্লেখ করতে হবে। যেমন—

(খ) ১-৩,৭-১৫, ১৭-৫০ ইত্যাদি (অসম্পূর্ণ) এবং যে-ক্ষেত্রে কোন পত্রসংখ্যা উল্লেখ নেই এরূপ ৫০ পত্রের একটি পুথি সম্পর্কে লিখতে হবে।

(গ) মোট ৫০টি পত্র (সংখ্যাবিহীন)।

৪. সম্পূর্ণ/অসম্পূর্ণ নির্ধারণ

কোন একটি পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণতা বা অখণ্ডিত অবস্থা এবং অসম্পূর্ণতা বা খণ্ডিত অবস্থা সম্পর্কে বলা যায়, একটি পত্র নিয়েও সম্পূর্ণ হতে পারে একটি পাণ্ডুলিপি, আবার ৫/৬ শত পত্র নিয়েও একটি পাণ্ডুলিপি অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। এখানে কথা হল, একটি পাণ্ডুলিপি যেখান থেকে শুরু করা হবে এবং যেখানে গিয়ে শেষ হবে তার মধ্যস্থিত সব কটি পত্রই একসঙ্গে সন্নিবদ্ধ থাকতে হবে। যেমন ধরা যাক—পঞ্চাশ সংখ্যক পত্রে গিয়ে একটি পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু লেখা শেষ হয়েছে। এবং সব কটি পত্রই সেখানে অবিকৃত রূপে বর্তমান, কেবল তখনই উক্ত পাণ্ডুলিপিটিকে সম্পূর্ণ বা অখণ্ডিত বলা যাবে। কিন্তু এর মধ্যে থেকে একটি মাত্র পত্রও বিলুপ্ত হলে পাণ্ডুলিপিটি তার সম্পূর্ণতা বা অখণ্ডতা হারাবে। যেমন—একশত পত্রের একটি পাণ্ডুলিপির কেবল পঞ্চম পত্রটি নেই, কিন্তু এর অন্য সকল পত্র অবিকৃত রূপে আছে এবং তার আরম্ভ ও সমাপ্তিও যথাযথভাবে রয়েছে তথাপি এ পাণ্ডুলিপিটিকে সম্পূর্ণ বলা যাবে না, তাকে অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিতই বলতে হবে।

৫. লেখক/লিপিকর নির্ধারণ

পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের ক্ষেত্রে লেখক পরিচিতিও একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় বিষয়। বহু শতাব্দের ব্যবধানে আজ আমরা যে-সকল পাণ্ডুলিপি পাচ্ছি তার অধিকাংশই প্রায় লিপিকৃত। লেখকের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি খুব বেশী একটা পাওয়া না গেলেও যা পাওয়া যায় তার সংখ্যাও কম নয়। অনেক পাণ্ডুলিপিতে লেখক ও লিপিকরের নাম একই সঙ্গে লিখিত হয়েছে। আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে কেবল লেখকের নাম কিংবা কেবল লিপিকরের নাম লিখিত হয়েছে। এই লিখিত নামের ভিতর থেকে কোন্‌টি লেখকের নাম আর কোন্‌টি লিপিকরের নাম এবং কখনও বা কোন্‌টি টীকাকারের নাম তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। কেননা লিপিকরের নামের সঙ্গে 'লিপিকর' কথাটি এবং লেখকের নামের সঙ্গে 'লেখক' কথাটি লেখা থাকে না। লেখকের ক্ষেত্রে কেবল 'বিরচিতম্‌', 'কৃত', ক্রিয়তে, ক্রিতায়াং, বক্তি এবং নির্মিতম্‌ শব্দগুলি নামের পরে কিংবা পূর্বে লেখা থাকে। যেমন—

(ক) শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য *বিরচিতং* জ্যোতিস্তত্ত্বং সমাপ্তম্‌।[৩০]

(খ) দৈবজ্ঞেন্দ্রাত্মজপ্রজাপতিশর্ম্মনা *বিরচিতঃ* সারসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ ॥[৩১]

(গ) মুনিগণসাম্ভার্থং শ্রীমহাদেব *বিরচিতং* পঞ্চপক্ষিনুকুলং সমাপ্তম্‌ ॥[৩২]

(ঘ) শ্রীমতামীননাথেন *ক্রিয়তে* স্বরদীপিকা।[৩৩]

(ঙ) শ্রীকৃষ্ণবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্যেন ধীমতা *ক্রিয়তে* বিদুষাং প্রীত্যৈ কৃত্যা পল্লবদীপিকাম্‌।[৩৪]

(চ) *ক্রিয়তে* শ্রীঘনশ্যামসার্ব্বভৌমেন ধীমতা।[৩৫]

(ছ) বিদ্যালঙ্কাকার *কৃতঃ* সারসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ।[৩৬]

(জ) জ্যোতিঃশাস্ত্রেষু তত্ত্বানি *বক্তি* শ্রীরঘুনন্দনঃ।[৩৭]

(ঝ) মেদিনি*কৃতোঽহ*নেকার্থকোষঃ সমাপ্তঃ।[৩৮]
(ঞ) শ্রীবরাহমিহির *কৃতায়াং* দৈবজ্ঞবল্লভা রচনা ॥[৩৯]
(ট) শ্রীল-শ্রীঈশ্বরচন্দ্রাখ্য ন্যায়বাগীশ *নির্ম্মিতম্*।[৪০]

আর যে-সকল পাণ্ডুলিপিতে নামের পরে কিংবা পূর্বে 'স্বাক্ষরম্', 'লিখিতম্', 'লিং', 'লিপিরিয়ং' প্রভৃতি শব্দ লেখা থাকে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে তিনি লিপিকর। অর্থাৎ উক্ত যে-কোন একটি শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নামটি হবে লিপিকরের। যেমন—

(ক) শ্রীকালিনাথ-শর্ম্মণঃ *স্বাক্ষরমিদংপু*স্তকঞ্চ।[৪১]
(খ) শ্রীরামদেব-দেবশর্ম্মণঃ *স্বাক্ষরমিদম্*।[৪২]
(গ) *স্বাক্ষরমিদং* শ্রীকৃষ্ণদাসস্য মোকাম শ্রীশ্রী ধাম।[৪৩]
(ঘ) *স্বাক্ষরমিদং* শ্রীরামগঙ্গাশর্ম্মণঃ।[৪৪]
(ঙ) শ্রীরাজকৃষ্ণ-বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য দ্বিজমনীষিনা *লিখিতেয়ং* স্বীয়পুস্তিকেতি।[৪৫]
(চ) শ্রীকমলাশর্ম্মণঃ পুস্তিকেয়ং শ্রীগঙ্গাদাসশর্ম্মণা *লিখিতম্*।[৪৬]
(ছ) শ্রীগঙ্গেশদেবশর্ম্মণা *লিখিতং* স্বকীয়পুস্তকম্।[৪৭]
(জ) শ্রীবিশ্বম্ভরশর্ম্মণা *লিখিতমিদম্*।[৪৮]
(ঝ) শ্রীরমাচন্দ্রদাসেন *লিখ্যতে* গ্রন্থসংহিতঃ।[৪৯]
(ঞ) *লিখিতং* শ্রীমহানন্দ রায়।[৫০]
(ট) *লিখিতং* শ্রীগুরুপ্রসাদ দাষ মিত্রষ্য সাকিম চাবড়া পরগনে বিষ্ণুপুর চৌকি ওন্দা।[৫১]
(ঠ) *লিং* হরিনারায়ণ দত্তঃ।
(ড) শ্রী মধুসূদনদেবশর্ম্মণো *লিপিরিয়ং* পুস্তকঞ্চেতি।[৫২]
(ঢ) শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং *স্বাক্ষর* নিজ ॥[৫৩]

এই লেখক বা লিপিকরের নাম একটা সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির কোথায় কোথায় পাওয়া যায় সে সম্পর্কেও একটা সাধারণ ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। লেখকের নাম সাধারণত পাণ্ডুলিপির তিনটি জায়গায় পাওয়া যায়—প্রথম পত্রে, শেষ পত্রে এবং গ্রন্থ মধ্যস্থিত অধ্যায় শেষে। প্রথম পত্রে স্তুতি বাক্যের পর গ্রন্থের নাম সম্পর্কে কিছু কথা লিখে কিংবা নামের সঙ্গেই বিষয়বস্তু শুরু করার পূর্বে অনেক সময় লেখকের নাম পাওয়া যায়। যেমন—

(ক) ওঁ নমঃ শিবায় ॥
অনায়াসে সময়ং কর্ম্মণাং যো বিবিৎসতি।
তদর্থং জ্যোতিষঃ শ্লোকান্ সঞ্চিনোমি যথামতি ॥
জ্যোতির্গ্রন্থকলাপাদ্বচনান্যাকৃষ্য শিষ্যবোধায়।
সময়প্রদীপমেতং কুরুতে *শ্রীহরিহরাচার্য্যঃ* ॥[৫৪]

উক্ত শ্লোকে লেখকের নাম 'শ্রীহরিহরাচার্য' প্রথম শ্লোকে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(খ) ওঁ শ্রী সূর্য্যায় নমঃ ॥
প্রণম্য সচ্চিদানন্দং ভাস্করং জগদীশ্বরম্ ।
জ্যোতিঃশাস্ত্রেষু তত্ত্বানি বক্তি *শ্রীরঘুনন্দনঃ* ॥[৫৫]

এখানে লেখকের নাম 'শ্রীরঘুনন্দন' লিখিত হয়েছে গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে।

(গ) ওঁ নমো গণেশায় ॥
তিমিরারিপদদ্বন্দ্বং নত্বা পাতকনাশাকম্ ।
যস্যস্মরণমাত্রেণ ভবরোগাদ্বিমুচ্যতে ॥
জ্যোতিঃশাস্ত্রং সমালোক্য গ্রন্থোয়ঃ মুনিভাবিতঃ ।
ক্রিয়তে *শ্রীঘনশ্যাম* সার্ব্বভৌমেন ধীমতা ॥[৫৬]

উক্ত প্রথম শ্লোকে লেখকের নাম 'শ্রীঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম' শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(ঘ) ওঁ নমো গণেশায়।
নত্বা মহেশ্বরং দেবং *মুকুন্দেন* সুধীমতা ।
জাতদীপপ্রকাশাখ্যো গ্রন্থোহয়মুচ্যতেহধুনা ॥[৫৭]

এখানেও লেখকের নাম 'মুকুন্দ' প্রথম শ্লোকে লিখিত হয়েছে। গ্রন্থমধ্যে যদি কোন অধ্যায় ভাগ থাকে তবে অধ্যায় শেষে অনেক সময় লেখকের নাম পাওয়া যায়। যেমন—

(ক) ইতি শ্রীমহীন্তাপনীয়পণ্ডিত*শ্রীশ্রীনিবাসবিরচিতায়াং* শুদ্ধিদীপিকায়াং গ্রহনির্ণয়ো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥[৫৮]
(খ) ইতি বন্দ্যঘটীয়-শ্রীহরিহরভট্টাচার্য্যাত্মজ-*শ্রীরঘুনন্দনভট্টাচার্য*বিরচিতো মঠাদিপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগঃ (অধ্যায়) সম্পূর্ণঃ ॥[৫৯]

সাধারণ নিয়মে গ্রন্থের শেষ পত্রেই লেখকের নাম লিখে গ্রন্থ শেষ করা হয়, আবার কখনও কখনও গ্রন্থ শেষ করেও লেখকের নাম লিখিত হয়। যেমন—

(ক) ইতি *রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য*বিরচিতং জ্যোতিস্তত্ত্বং সমাপ্তং ॥[৬০]
(খ) ইতি *শ্রীরঘুনন্দনভট্টাচার্য্য*বিরচিতং দেবপ্রতিষ্ঠাপ্রয়োগতত্ত্বং সমাপ্তম্ ॥[৬১]
(গ) ইতি *বিদ্যালঙ্কারকৃতঃ* সারসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ ॥[৬২]
শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ সরস্বত্যৈ নমঃ ॥ শ্রীচন্দ্রনাথদেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিদং পুস্তকঞ্চেতি সন ১২ সা ৫০ সমাহোবৈশাখঃ॥[৬৩]
(ঘ) ইতি *শ্রীলঙ্কেশ্বরকৃতা* প্রাকৃতকামধেনুকা সমাপ্তা ॥ শ্রীদুর্গাচরণে নমঃ ॥ ...॥[৬৪]

লিপিকরের নাম সাধারণত পাওয়া যায় পাণ্ডুলিপির শেষ পত্রে। শেষ পত্রে গ্রন্থ শেষ করার পরে লিপিকরের নাম লিখিত হয়। যেমন—

(ক) ইতি স্কন্দপুরাণে গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্
শ্রী ভুবনচন্দ্র শর্ম্মণা লিখিতমিদম্ ।[৬৫]

(খ) ইতিসারসংগ্রহসমাপ্তঃ ॥ শকাব্দা ১৭/৮৪/৩/৭ ॥ স্বাক্ষরং *শ্রীগঙ্গাচরণ শর্ম্মণঃ* স্বকীয়ং পুস্তকঞ্চ ॥[৬৬]

(গ) ইতি সল্লকেরালি সমাপ্তঃ॥ *শ্রীরামলোচনশর্ম্মা স্বাক্ষরম্*।[৬৭]

(ঘ) সমাপ্তমিদং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ং নাম নাটকম্ ॥ ...
শ্রীরামদেব দেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিদম্ ॥[৬৮]

লেখক বা লিপিকরের নাম কখনও কখনও সহজভাবেও পাওয়া যায়। আবার কখনও কখনও পাওয়া যায় গ্রন্থের পুষ্পিকাংশে রচিত শ্লোকমধ্যে, যেমন—

(ক) যুগ্ম-পৃথ্বী-রসেন্দৌ চ শাকে সংগণিতে স্বয়ম্।
লিলেখ জ্যোতিষাং তত্ত্বং গঙ্গেশঃ শ্রীযুতঃ সুধীঃ ॥
অলেখি চাত্ম-পাঠায় *শ্রীযুতগঙ্গেশ শর্ম্মণা* ॥[৬৯]

এখানে লিপিকরের নাম 'শ্রীযুত গঙ্গেশ শর্ম্মা' শ্লোকাকারে লিখিত হয়েছে।

(খ) নত্বা স্বপঠায় চ কাব্যচন্দ্রিকাম্।
মুদালিখৎ *শ্রীযুতরামসুন্দরঃ* ॥[৭০]

উক্ত শ্লোকে লিপিকরের নাম 'শ্রীযুতরাম সুন্দর' লিখিত হয়েছে।

(গ) নাগেন্দ্র-গোত্রক্ষিতি-সংখ্যা শাকেমীনাপ্তভানোবসুচন্দ্রমানে।
মহ্যাত্মজাহে শিবকালিদাসো লিলেখ পুস্তিংবটুরামরামঃ ॥[৭১]

এখানে লিপিকরের নাম 'শিবকালিদাস'।

(ঘ) ধ্যাত্বা *শ্রীশিবসুন্দরী* লিখিতবান্ তন্ত্রস্যাসারং বৃহৎ।
দুর্গাকিঙ্করচক্রবর্ত্তিন ইমং শ্রীবাবুপূর্বস্য চ ॥[৭২]

উক্ত শ্লোকে লিপিকরের নাম 'শ্রীশিবসুন্দরী' এবং লেখকের নাম' দুর্গাকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী' শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(ঙ) শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে যে বলাইলেন বাণী।
তাই কহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি ॥
শ্রীলোকনাথ প্রভু-পদ হৃদে করি আশ।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে *নরোত্তম দাস* ॥[৭৩]

এখানে লেখকের নাম 'নরোত্তম দাস'।

(চ) শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ।
নারদ-সংবাদ কথা কহে *নরোত্তম দাস* ॥[৭৪]

এই শ্লোকে লেখকের নাম 'নরোত্তম দাস' লিখিত হয়েছে।

(ছ) শাকে ভূরস-সপ্তি-ভূমি-বিমিতে সিংহেগতে পুষণি।
পঞ্চাংশে কুজবাসরে হরিতিথৌ *শ্রীরামদাসো দ্বিজঃ* ॥[৭৫]

উক্ত শ্লোকটিতে লিপিকরের নাম 'শ্রীরামদাস দ্বিজ' শ্লোকাকারে লিখিত হয়েছে।

(জ) ইতি *শ্রীরামচন্দ্রাখ্যন্যায়বাগীশধীমতা।*
সুধীভিরাভিধীয়েত কৃপয়া কাব্যচন্দ্রিকা ॥[৭৬]

এ শ্লোকটিতে লেখকের নাম 'শ্রীরামচন্দ্রন্যায়বাগীশ' লিপিবদ্ধ হয়েছে।

(ঝ) বিধিবেদাদ্রীন্দুশকে নভসী শনেত্রমিতে।
অভিধানং সৌম্যদিনে ব্যলিখৎ *শ্রীরামজয়দ্বিজঃ*।[৭৭]

এখানে লিপিকরের নাম 'শ্রীরামজয় দ্বিজ (ব্রাহ্মণ)'।

(ঞ) *শ্রীরামরাম বিপ্রেন* গীতামাহাত্মমুক্তম্।
লিখিতংগ্মীয় (?) মানস্য পাদপদ্মং গদাভূতঃ ॥[৭৮]

উক্ত শ্লোকে লৈখকের নাম 'শ্রীরামরাম বিপ্র (ব্রাহ্মণ)' শ্লোকাকারে লিখিত হয়েছে।

৬. পুষ্পিকা

লেখক বা লিপিকর গ্রন্থের শুরুতে, অধ্যায়শেষে এবং গ্রন্থশেষে নিজের আত্মবিবরণীমূলক এবং গ্রন্থ সম্বন্ধীয় বিবরণ ও গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে যে অংশটি লিখে রাখতেন সে অংশকে পুষ্পিকা (colophon) বলা হয়। লিপিকরের বিবরণীসংযুক্ত পুষ্পিকা সাধারণত গ্রন্থের শেষেই লিখিত হত। অনেক সময় লিপিকরের কবিত্বগুণে এই পুষ্পিকা সুদীর্ঘও হত। আঠার শ' শতকের রহিমুন্নেসা নাম্নী এক লিপিকর আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের অনুলিপি প্রস্তুত করার সময় পুথির শেষে নিজের আত্মবিবরণীমূলক এক সুদীর্ঘ অধ্যায় সংযোজন করেছেন। সাধারণত পুষ্পিকা অংশে রচয়িতার নাম, লিপিকরের নাম, গ্রন্থের নাম এবং তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য লিখিত হত। যেমন—

(ক) ইতি শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে শেষখণ্ডঃ সম্পূর্ণ্নঃ ॥ ইতি সূত্রাদিমধ্য শেষখণ্ডঃ ॥ হরিঃ ॥ চন্দ্রকাশ হয় খিতিঃ শকের নির্ণ্ণয় ইতি : তীর্থ (তিথি) পৌর্ন্নমাশী সুরগুরুঃ অর্দ্ধ মেষে শশী নারিঃ ভবুনে বিখ্যাত হরি : বনি যোগেন্দ্র অতি চারু : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলাঃ শিখরীনি কর লিলাঃ অধিক অমৃত পদে পদে : চৈতন্যমঙ্গল নাম : ভক্তিরস প্রেমধামঃ শ্রীলোচনানন্দমুখোদিতেঃ বিলিখিত বৃন্দাবনঃ গ্রন্থ রত্নাধিক ধনঃ দর্শন স্পর্শন শ্রুতি আসঃ জয়তি শ্রীগৌরচন্দ্রঃ শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ গদাধর আদি শ্রীনিবাস ॥ শ্রীহরি ॥ শ্রীজিতনারায়ণরায়স্য গ্রন্থোহয়ং ॥ কৃষ্ণচৈতন্য। যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ। মাতা চ সুকরী তস্য পিতা গর্দ্দভঃ ॥ শ্রী হরয়ে নমঃ ॥ হরিঃ ॥[৭৯]

(খ) ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাসীবাসী বৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাদ্রিগমনং নাম পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদঃ। সমাপ্তশ্চায়ং মধ্যখণ্ডঃ। পক্ষৌবেদঘটে চন্দ্রে মানে শাকস্য সংখ্যকে। পৌষে মাস্যমিতে পক্ষে দশম্যাং ভৃগুবাসরে। নত্বা বৃন্দাবনং শ্যামং কৃষ্ণং গোপীজনপ্রিয়ং। লিখ্যতে চ শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতসংগ্রহঃ। নানাযত্নকৃতেনৈব নানাক্লেশসহিষ্ণুনা। শ্রীরামচন্দ্রদাসেন লিখ্যতে গ্রন্থসংহিতঃ। শ্রীরাধায়ৈ নমঃ। যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং ইত্যাদি।[৮০]

(গ) লেখে হীন আজিজর রহমানে মনে ভাবি সার।
হাওলা গেরামে জান কধুরখীল মাঝার ॥
আবদুল্লার পুত্র আমি সবা হস্তে হীন।
হাওলা গেরাম জান উদ্দেশিয়া চিন ॥
মাতা পিতা পীর মুরসিদ জান এই চাইর।
আর বহু আছে জান ওস্তাদ যে সার ॥
হীনবন্ধু আজিজর বহমান মোর নাম।
ওস্তাদ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণাম ॥
পিতাহীন শিশু আমি নাহি মোর বুদ্ধি।
শাস্তহীন[৮১] অজ্ঞান না বুঝি-এ সিদ্ধি।
পুস্তক লেখিতে আমি দিলে করি এই।
তালাইস করিয়া মুই না পাইলুম ছহি ॥
যেই মতো দেখি আমি সেই মতো লেখি।
অপরাধ ক্ষেম মোর গুণিগণে দেখি ॥
হরফের ভুল চুক যদি পাও আর।
গুণিগণে চাহি তবে করি দিবা সার ॥
সার না করি যদি গালি দেও মোরে।
পাইবা বহুল দুঃখ গোরের[৮২] ভিতরে ॥
এবে কহি সন মঘী তারিখের গৎ।
বিংশ আষ্ট মঘী জান আর বারশত ॥
তারিখ আষাঢ় জান বার দিন হৈল।
সেই দিন এই পুস্তক লেখা হৈল ॥[৮৩]

(ঘ) ইতি মক্তুলহোচন পুস্তক সমাপ্ত। ভিমস্যাপি ভবেত ভ্রম মুনিরপি। জথা দিষ্টি ... তথা লেখিতং লীখীক নাস্থিক দোসং লেখীতং অক্ষ্যর শ্রীহিন মাহাম্মদ ফাজীল নস্য হক মালিক শ্রী সেক মাহাম্মদ আবজল ওং মাং ফাজীল মৌং ছলাইন ইতি সন ১১৪১ মাহে ২৯ আগ্রহণ[৮৪] রোজ রবিবার আমলে শ্রীযুত সামনর ফেরাঙ্গি দেবান শ্রীমদন হালদার।

শুধু লেখক, লিপিকর এবং গ্রন্থের নামই নয়, কোন্ মাস, কি বার, কোন্ লগ্নে, কোন্ দিকে ফিরে পাণ্ডুলিপিটি লিখিত হল সে সম্পর্কেও বিভিন্ন কথা এ পুষ্পিকা অংশে লিখিত হত। যেমন—

(ক) এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম বেলা একদণ্ড থাকিতে শ্রীযুত রামধন ব্রসু (?) সাক্ষ্যাৎ মাতুল মহাসয়ের বাহির বাটিতে মণ্ডপ ... উপরেতে দক্ষিণমুখি হইয়া ঘাড়ের মধ্যে সাল হইয়া বড় বেতা পাইয়া এহি পুস্তক সমাপ্ত করিলাম—এহি পুস্তক আর কেহর এলাকা নাহি ইতি সন ১২৪০ সনের মাহে আশ্বীন[৮৫] তাং ৩ বোদবার[৮৬] কালে সমাপ্ত করিলাম ইতি।[৮৭]

(খ) ইতি শ্রীমৎ জগন্নাথচরিত্র লির্খতে ॥ জথা দিষ্টং [ইত্যাদি]।
ভিম য়াদি জর্দ্দ নানা রোগে[৮৮] হয় ভঙ্গ। মুনিগনের ভ্রম হয় আমি কি পতঙ্গ ॥
লিখিতং শ্রীদিননাথ ব্রহ্মচারি। পরগণে সাতসৌকা মৌজে দেনুড় ॥ সন ১২৪৫ সাল তারিখ ১৩ চৌত্রী রোজ সোমবার তিথি একাদসি বেলা আন্দাজি ৫ পাচ দণ্ড সময়ে। এই পুস্তক সোমাপ্ত হইল ॥
শ্রীদিননাথ রায়ের বাহিরবাটির পূর্ব্বদ্বায়ারি ঘরের পিরায় বসিয়া লিখি। ইহার সাইদ শ্রীদিননাথ রায় এই পুস্তক জে ব্যক্তি চুরি করিবে। সে সাসুরে হইবেক য়ার পুত্রবধূকে হরণ করিবে ॥[৮৯]

(গ) ইতিসন ১২৬৯ সাল ১৮ই চৈত্র সোমবার একাদশী বেলা আড়াই প্রহর সময়ে শ্রীযুক্ত মাধবিন্দু দত্তের বড় দক্ষিণদ্বারী ঘরের পূর্ব্ব পার্শ্বে সম্পূর্ণ হইল। এই গ্রন্থের লেখক শ্রীরাধাই রায় শ্রীমাধবিন্দু দত্ত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী নিজ গ্রন্থ লিখিলেন।[৯০]

(ঘ) ইতি নারদসংবাদ সমাপ্ত। পাঠক শ্রীলক্ষীনারায়ণ রজক, সাকিম সিউড়ী, পরগণে খটঙ্গা। লিখিতং শ্রীমহানন্দরায়ং, সাং সিউড়ী, পরগণে খটঙ্গা, সন ১২৫১ সাল তাং ২৬ অগ্রহায়ণ তিথি প্রতিপদ বার মঙ্গলবার রচনা দেড় প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল। ইতি।[৯১]

(ঙ) ... ...
সমাপ্ত হইল নটনন্দিনীরহস্য।
সনমঘী রাখি এথা তারিখ গণিআ।
কর সর্ ভুরু গুরু নিয়মে ধরিআ ॥
মিথুনের আদ্য পক্ষ ভুবন বিদিত।
লিখা অবসান দিলু ভার্গব লুকিত ॥[৯২]

(চ) সন ১১৯০ মং তারিখ মাহে ১২ ফালগুণ রোজ সমবার সোল গরি বাদে জকী চাহাতে পুস্তক সমাপ্ত হইআচে হেন জানিবা।[৯৩]

(ছ) অতঃপর কহী সুন সন বিবরণ।
গোপালের (১২) পীচ্ছে অম্বর (০) সোভন ॥
দক্ষিণেতে গ্রহ (৯) করিয়া সাজন।
সিংহ রাম্যে (ভাদ্রমাস) পুথি সাঙ্গ সুন, সর্ব্বজন।
রুদ্রাস্তক (১২) রোজ হইল কি বলিব আর।
কুহাস্তক (শুক্লপক্ষ) হইয়া প্রতিপদ সার ॥"[৯৪]

(জ) সাওয়ালের তের রোজ পূর্ণিমার দিনে।
বারশ আটত্রিশ মঘি কার্তিক পুনি খনে ॥
এলাহি গজব ভেজে বাঙ্গালা জমিনে`।
রোজ মঙ্গলবার ছিল জান সব জনে ॥[৯৫]

পুষ্পিকা অংশ যে কারণে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হলো লেখক ও লিপিকরের সময় সম্পর্কে এখানে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। সময়কাল সম্পর্কিত এই পুষ্পিকা অংশ লেখা হত পাণ্ডুলিপির প্রথমভাগে কিংবা অধ্যায় শেষ অথবা গ্রন্থ শেষে। তবে প্রথমভাগে এবং অধ্যায়-শেষে সময়কাল সম্পর্কে লিখিত পুথির সংখ্যা কম। গ্রন্থশেষে সময় সম্পর্কে গদ্য পদ্য উভয় পদ্ধতিতেই লিখিত হত। যেমন—

(ক) কার্ত্তিকের ছাব্বিশ দিন ভৃগুর বাসরে।
গ্রন্থ সমাপন হৈল দ্বিতীয় প্রহরে।
১৭ সতের শত বেয়াল্লিশ পরিমাণে শক।
শ্রীরামদাস ইহার লিখক।[৯৬]

উক্ত শ্লোকে সময়কাল সম্পর্কে বলা হয়েছে ১৭৪২ শকাব্দ ২৬শে কার্ত্তিক শুক্রবার ২য় প্রহর। লিপিকর শ্রীরামদাস এই সময়ে গ্রন্থ লেখা শেষ করেছেন।

(খ) ভাস্কর দক্ষিণ পানে নেত্র বসাইআ।
তার ডাইনে বসু রাখি জত্তন করিআ ॥
ঋতু বসু দিন জান বিশ্চিক মাসের।
লিখন সমাপ্ত রোজ শুক্র অসুরের ॥[৯৭]

এই পুষ্পিকাংশে লিপিকর তার গ্রন্থ লেখার সমাপ্তি সময় শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার লিখিত সময় এরূপ ১২৩৮ মঘী, অগ্রহায়ণ মাস, শুক্রবার। (এখানে ভাস্কর-১২, নেত্র-৩, বসু-৮, বিশ্চিক-অগ্রহায়ণ, শুক্র অসুরের—শুক্রবার)

(গ) বযু নেত্র সত অব্ধ হইলেক জবে।
কুমুদ বান্ধব বামে দিআ দেখ তবে।
দধি বামে সুরভি তনএ পতিমতি।
কলানিধি পাসে সসোধর প্রকাশিত।
শ্রাবণে তা মূল গতে জিকা দহর মত।
অহ নেত্র বার কর্ণপিতা উপস্থিত।
সে দিনে অপূর্ব্বমতে বহে জলধার।
সম্পূর্ণ বারির তলে হইল সংসার ॥[৯৮]

উক্ত অংশে সময়কাল শ্লোকাকারে লিখিত হয়েছে। এখানে বযু (বসু) শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে ৮ সংখ্যা, নেত্র শব্দের দ্বারা ৩ সংখ্যা এবং কুমুদ-বান্ধব শব্দে নির্দেশ করেছে ১২ সংখ্যা অর্থাৎ ১২৩৮ মঘীঅব্দ।

(ঘ) সপ্ত ত্রিশাধিক পঞ্চদশশতশকাব্দে মার্গশীর্ষ—
শুক্লপঞ্চম্যাং বুধবাসরে লিখিতা শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জগৃহে ॥
শুভমস্তু॥ শ্রীহরয়েনমঃ॥ শ্রীশ্রী গোবিন্দদেবে জয়তি।
শাকে খেষুরসেন্দুকে গুরুদিনে ভাদ্রে শুভাপূর্ণিমা—

যাতস্যাং পঠনে ছয়াত্মন ইয়ং সর্ব্বাঘসংহারিণী।
শ্রীগোপীচরণেন দীর্ঘনগরে চৈতন্যদেবালয়ে
শ্রীমদ্রূপবিনির্ম্মিতা বিলিখিতা স্তোত্রস্য মালাহরেঃ ॥[৯৯]

শ্রীমৎরূপ গোস্বামী বিরচিত স্তবমালা গ্রন্থের এই পুষ্পিকাংশে লিপিকর গ্রন্থটি লিপি করার সময়কাল শ্লোকাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর লিখিত সময়-সপ্তত্রিংশ = ৩৭, পঞ্চদশশত = ১৫ অর্থাৎ ১৫৩৭ শকাব্দ।

পুষ্পিকামধ্যে সময়কাল সাধারণত কাব্যাকারে লিখিত হলেও যে-সব পাণ্ডুলিপির পুষ্পিকাংশে কাব্যাকারে সময়কাল সম্পর্কিত কোন কথা লিখিত হত না, সে-সব ক্ষেত্রে গ্রন্থের সম্পূর্ণ পুষ্পিকা অংশ নিরীক্ষা করতে হবে, কারণ অনেক সময় লিপিকরের লিখিত বিভিন্ন তথ্য থেকে লেখকের সময় সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব। যে-সকল পাণ্ডুলিপিতে পুষ্পিকাও না থাকে সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বা মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করতে হবে বা পড়তে হবে। কেননা কোথাও না-কোথাও সময় সম্পর্কে কোন-না কোন তথ্য হয়তো পাওয়া যেতে পারে। তবে লেখক বা লিপিকরের আত্মবিবরণীমূলক তথ্য সম্পর্কিত পুষ্পিকা অংশই সময়কাল নিরূপণের উল্লেখযোগ্য পন্থা। এছাড়াও পাণ্ডুলিপির লেখার উপকরণ, লেখার রীতি, লিখিত বিষয়বস্তু প্রভৃতি নিরীক্ষার মাধ্যমেও অনেক সময় কাল সম্পর্কে অবগত হওয়া যেতে পারে।

৭. ভণিতা

প্রাঙ্মুদ্রণ যুগে নিজের রচনার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রন্থারম্ভে, অধ্যায়শেষে এবং গ্রন্থশেষে কবি যে আত্মবিবরণীমূলক এবং প্রশস্তিমূলক বাক্য লিপিবদ্ধ করতেন তা ভণিতা নামে পরিচিত। কবি বা রচয়িতা নিজের নাম, পিতার নাম, বংশ পরিচয়, কাব্যের নাম, বিষয়ের নাম এবং নানা দেবদেবী ও প্রণতঃজনদের প্রতি শ্রদ্ধামূলক প্রশস্তিবাক্য এ ভণিতা অংশে লিপিবদ্ধ করতেন।

(ক) ওঁ নমো গণেশায়।
চতুর্বদনসম্মস্থ-চতুর্বেদ-কুটুম্বিনে।
দ্বিজানুষ্ঠেয়-সৎ-কর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥
গৃহ্যসূত্রার্থমালোক্য ছন্দোগানামিয়ং ক্রমাৎ।
কৃতা শ্রীভবদেবেন কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতিঃ ॥[১০০]

(খ) ওঁ নমো দুর্গায়ৈ।
ওঁ নমঃ সর্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে ॥
অধ্যয়ন-ভাবনাভ্যাং সারং নির্ণীয় নিখিল-তন্ত্রানাম্।
দীধিতিমধিচিন্তামণি তনুতে তার্কিকশিরোমণিঃ শ্রীমান্ ॥[১০১]

(গ) ওঁ নমো গণেশায়।
সগুণা সালঙ্কারা রসভাবাদোষপরিহারা।
জগদনুরঞ্জনশীলা কবিকৃতলীলা সরস্বতী জয়তি ॥
বিদ্যানিধিতনুজের ন্যায়বাগীশধীমতা।
গুণালঙ্কারদোষাখ্যা ক্রিয়তে কাব্যচন্দ্রিকা ॥[১০২]

(ঘ) ওঁ নমো গণেশায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণৌ নত্বা কারকাদ্যর্থনির্ণয়ঃ।
শ্রীভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশেন বিতন্যতে ॥[১০৩]

(ঙ) ওঁ নমো গণেশায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণদ্বন্দ্বং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্।
প্রণম্য জয়কৃষ্ণেন ক্রিয়তে সারমঞ্জরী ॥[১০৪]

(চ) ওঁ নমো দুর্গায়ৈ ॥
প্রণম্য সচ্চিদানন্দং রামং কামদমীশ্বরম্।
তিথ্যাদিতত্ত্বং তৎপ্রীত্যৈ বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ ॥[১০৫]

(ছ) ওঁ নমো গণেশায় ॥
ন্যায়াম্বুধিকৃতসেতুং হেতুং শ্রীরামমখিলসম্পত্তেঃ।
তাতং ত্রিভুবনগীতং তর্কালঙ্কারমাদরান্নত্বা ॥
শ্রীমতা মথুরানাথতর্কবাগশিধীমতা।
বিশদীকৃত্যদর্শ্যন্তে প্রত্যক্ষমণিফক্কিকাঃ ॥[১০৬]

(জ) ওঁ নমো গণেশায় ॥
জগদম্বাপদদ্বন্দ্বমাপপদক্ষয়সাধনম্।
বিশ্বকোটিবিনির্ম্মাণ-স্থিতি-সংহারকারণম্ ॥
নিধায় হৃদয়ে দায়াধিকারে ক্রমসংগ্রহঃ।
ক্রিয়তে পণ্ডিতামোদী শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মণা ॥[১০৭]

(ঝ) শ্রীদুর্গা। ওঁ নমো গণেশায় ॥
নত্বেশানী পদাম্ভোজং ভ্রমদ্ভ্রমরশোভিতম্।
দুর্গোৎসববিবেকন্তু ক্রিয়তে শূলপাণিনা ॥[১০৮]

পাণ্ডুলিপির লিপিকাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা প্রাচীন যুগে খ্রিস্টাব্দ এবং বর্তমান বাংলা সনে লিপিকাল সাধারণত লেখা হত না। তখন শকাব্দ, সম্বৎ, বঙ্গাব্দ, মঘি অব্দ, মল্লাব্দ, ত্রিপুরাব্দ, লক্ষ্মণাব্দ, পালাব্দ প্রভৃতি অব্দে সংখ্যাবাচক শব্দ এবং জ্যোতিষীয় শব্দে রচিত বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমেই লিপিকাল লিখিত হত। এছাড়াও সে সময় প্রচলিত ছিল আরও কয়েকটি অব্দ যাতে নির্ণীত হত পাণ্ডুলিপির লিপিকাল, যেমন—বুদ্ধনির্বাণাব্দ, কলিযুগ সংবৎ (গত), বীরনির্বাণ সংবৎ, চৈতন্যাব্দ, গুপ্তসংবৎ, হিজরী সন, ইলাহী সন, উত্তরী ফসলী সন, দক্ষিণী ফসলী সন,

চালুক্য বিক্রম সংবৎ, কলচুরি সংবৎ, হর্ষসংবৎ, ভাটিক সংবৎ, বিলায়তী সন, শাহুর সন, অমলি সন, জমিদারী সন, দানিশাব্দ, নসরৎশাহী সন, নেপাল সম্বৎ, নৃপশক, পরগণাতি সন, বিশ্বসিংহ শক, বিষ্ণুপুরী সন, মন্দারণ সন, রাজড়া সন, রাজ সন, সদর সন, ইংরাজী সন, যবননৃপতি শকাব্দ, রত্নপীঠস্য নৃপতি শকাব্দ। লিপিকাল লেখা হত সাধারণত গ্রন্থের পুষ্পিকা অংশে।

৮. কালাঙ্ক

কাল (সময়) + অঙ্ক (হিসাব) অর্থাৎ সময়ের হিসাব। পুথি সাহিত্যের লেখক ও লিপিকরগণ তাঁদের রচনাকৃতির সময়কে এই কালাঙ্কের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করতেন। এই কালাঙ্ক পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে লিখিত হত।

ক. গাণিতিক সংখ্যার মাধ্যমে খ. সংখ্যা প্রকাশক প্রতীকী শব্দের মাধ্যমে।

সাধাবণত পাণ্ডুলিপির শেষে পুষ্পিকা এবং ভণিতা অংশে কালাঙ্ক লিখিত হত। এই কালাঙ্ক যুগভেদে শাসনকর্তাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে এবং নিয়মে পরিণত হত। রচয়তিাগণও স্ব স্ব সময়ের পদ্ধতি অনুযায়ী কালাঙ্ক লিপিবদ্ধ করতেন। বর্তমানে খ্রিস্টাব্দ এবং বঙ্গাব্দ ব্যতীত অন্যান্য শব্দের প্রচলন স্তিমিত হয়ে আসছে। সারাবিশ্বে বর্তমানে খ্রিস্টাব্দই অধিক প্রচলিত।

পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন অব্দ কিভাবে খ্রিস্টাব্দে নিরূপণ করতে হবে সে সম্বন্ধে এখন কিছু আলোচনা করা যাক।

খ্রিস্টাব্দ

যীশুখ্রিস্টের জন্মের তিন বৎসর পর থেকে যে অব্দ গণনা করা হয় তা-ই খ্রিস্টাব্দ নামে প্রসিদ্ধ। খ্রিস্টাব্দ গণনা করা হয় জানুয়ারী মাস থেকে। বর্তমানে প্রায় সমস্ত দেশেই এই শব্দ প্রচলিত।

শকাব্দ

'শক' নামক রাজার প্রবর্তিত বৎসরকে বলা হয় শকাব্দ। ওল্ডেন্ বার্গ, ফার্গুসন, বুহ্লার, র‍্যাপ্সন প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ ও ভারতীয় অনেক লিপিবিশারদ মনে করেন কুষাণবংশীয় রাজা কনিষ্ক ৭৮ খ্রিস্টাব্দে শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত করেন। অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দ শুরু হওয়ার ৭৮ বৎসর পরে এবং বঙ্গাব্দের ৫১৫ বৎসর পূর্বে শকাব্দ শুরু হয়েছে। একারণে শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে পাওয়া যায় খ্রিস্টাব্দ এবং বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫১৫ যোগ করলে পাওয়া যায় শকাব্দ। যেমন ১০৪২ বঙ্গাব্দ + ৫১৫ = ১৫৫৭ শকাব্দ + ৭৮ = ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দ। "শকাব্দ, বঙ্গাব্দ, লক্ষণাব্দ ও সম্বৎ ইত্যাদি এক অব্দ হইতে অন্য অব্দ বাহির করিবার মৈথিলী ভাষায় এক গাঁথা প্রচলিত ছিল। যথা—শাকে সো সন জনাবসোই রহিত বান (৫) শশি (১) বান (৫) যো হোই—আসন জমারহৈ সো দেখহু। শর (৫) শশি (১) বাণ (৫) হীন করি লেখহু। বাকী রহে সো লংসং প্রমাণ।

গুরুজ্ঞানীজন ভাষা মান। অৱ্ন চৌষট (৬৪) একাদশ (১১) দীজে। লংসং সহিত সম্বৎ করি লীজে— অর্থাৎ শকাঙ্ক হইতে ৫১৫ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই সন অর্থাৎ বঙ্গাব্দের পরিমাণ এবং সেই বঙ্গাব্দের পরিমাণ হইতে ৫১৫ বাদ দিলে লক্ষণাব্দের পরিমাণ হয়; সেই লক্ষণাব্দের পরিমাণ সহ ১১৬৪ যোগ দিলে, সম্বৎ পরিমাণ জানা যায়। লক্ষণাব্দে ১০৩০ যোগ করিলেই শকাব্দ বাহির হয়।"[১০৯]

সম্বৎ

উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য প্রবর্তিত অব্দ সম্বৎ নামে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ অব্দে ইহা প্রবর্তিত হয়। তাই 'সম্বৎ' থেকে ৫৭ বিয়োগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১৮৫৫ সম্বৎ—৫৭ = ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ। সম্বৎ অনেক সময় সাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ সম্বৎ শব্দের একটি অর্থ সাল। বঙ্গাব্দে ৬৫০ বৎসর পূর্বে সম্বৎ শুরু হয়েছে। এ হেতু বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৬৫০ যোগ করলে সম্বৎ পাওয়া যাবে। যেমন—১২৩৪ বঙ্গাব্দ + ৬৫০ = ১৮৮৪ সম্বৎ। লক্ষণাব্দের সঙ্গে ১১৬৪ যোগ করলেও সম্বৎ পাওয়া যায়।

বঙ্গাব্দ

বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন প্রচলিত হয় সুলতান হোসেন শাহের রাজত্বকালে। মতান্তরে সম্রাট আকবর এই বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের প্রচলন করেন। বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১২৪৪ বঙ্গাব্দ + ৫৯৩ = ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ। বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫১৫ যোগ করলে শকাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১১৮৭ বঙ্গাব্দ + ৫১৫ = ১৭০২ শকাব্দ। বঙ্গাব্দ থেকে ১০১ বাদ দিলে মল্লাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১১৯২ বঙ্গাব্দ—১০১ = ১০৯১ মল্লাব্দ। বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৩ যোগ করলে ত্রিপুরাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১২৮০ বঙ্গাব্দ + ৩ = ১২৮৩ ত্রিপুরাব্দ। অর্থাৎ ১২৮০ বঙ্গাব্দ-১২৮৩ ত্রিপুরাব্দ।

মঘিঅব্দ

'ব্রহ্মদেশে প্রচলিত মঘী সন ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয়।[১১০] মতান্তরে কোন এক আরাকানরাজ কর্তৃক মঘী সন প্রচলিত হয় ৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে। এ হেতু মঘী সনের সঙ্গে ৬৩৯ ৬৩৮ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। বঙ্গাব্দ থেকে ৪৫ বিয়োগ করলে মঘী সন পাওয়া যায়। যেমন—১২৪৮ বঙ্গাব্দ-৪৫ = ১২০৩ মঘীসন। অর্থাৎ ১২৪৮ বঙ্গাব্দ = ১২০৩ মঘীঅব্দ।

মল্লাব্দ

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চলের রাজা আদি মল্ল কর্তৃক প্রচলিত সনকে মল্লাব্দ বলা হয়। আদিমল্ল এই অব্দ প্রবর্তন করেন ৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে। এ হেতু মল্লাব্দের সঙ্গে ৬৯৬ যোগ করলে পাওয়া যায় খ্রিস্টাব্দ। যেমন—১০৯৫ মল্লাব্দ + ৬৯৬ = ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ১০৯৫ মল্লাব্দ = ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ।

ত্রিপুরাব্দ

"বিশ্বকোষের মতে পার্বত্য স্বাধীন ত্রিপুরায় প্রচলিত এই অব্দ ৬২১ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয়। বঙ্গাব্দ আরম্ভ হয় ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে। অতএব বঙ্গাব্দ ও ত্রিপুরাব্দের মধ্যে পার্থক্য ২৮ বৎসর। কিন্তু একাধিক বাংলা পুথিতে যে ত্রিপুরাব্দের উল্লেখ পাইতেছি তাহা বিশ্বকোষের অভিমত সমর্থন করে না। বাংলা পুথির ত্রিপুরাব্দ—বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৩ বৎসর যোগ দিলেই পাওয়া যায়।"[১১১] অন্যমতে ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যে মহারাজা ধীররাজ কর্তৃক এই ত্রিপুরাব্দ প্রচলিত হয়। এ হেতু ত্রিপুরাব্দের সঙ্গে ৫৯০ যোগ করলে পাওয়া যায় খ্রিস্টাব্দ। যেমন—১২৪৪ ত্রিপুরাব্দ + ৫৯০ = ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ১২৪৪ ত্রিপুরাব্দ = ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ। ত্রিপুরাব্দের সঙ্গে ৫১২ যোগ করলে শকাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১২৪৭ ত্রিপুরাব্দ + ৫১২ = ১৭৫৯ শকাব্দ। অর্থাৎ ১২৪৭ ত্রিপুরাব্দ = ১৭৫৯ শকাব্দ।

লক্ষ্মণাব্দ

বাংলাদেশের রাজা বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারে যে অব্দ প্রচলিত ছিল তাই লক্ষ্মণাব্দ নামে পরিচিত। রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যভার গ্রহণের সময় ১১১৮ খ্রিস্টাব্দ। একারণে লক্ষ্মণাব্দের সঙ্গে ১১১৮ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১৮১ লক্ষ্মাবাব্দ + ১১১৮ = ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ১৮১ লক্ষণাব্দ = ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দ। লক্ষ্মণাব্দ 'লক্ষ্মণ সংবৎ' বা সংক্ষেপে লংসং নামেও পরিচিত। লক্ষ্মণাব্দ ১০৩০ শকাব্দের মাঘ মাসে শুরু হয়েছিল বলে লক্ষ্মণাব্দের সঙ্গে ১০৩০ যোগ করলে শকাব্দ পাওয়া যায়

পালাব্দ

পালবংশীয় রাজগণকর্তৃক প্রবর্তিত সন পালাব্দ নামে পরিচিত। এই বংশে একাধিক অব্দ প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এই কারণে তাদের কোন অব্দই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

হিজরী অব্দ

হজরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত সন হিজরী অব্দ বলে পরিচিত। খ্রিষ্ট জন্মের ৬২২ বৎসর পরে এই অব্দ শুরু হয়।

চৈতন্যাব্দ

বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বারা প্রচলিত অব্দ চৈতন্যাব্দ নামে পরিচিত। চৈতন্যের জন্মকাল ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং এই অব্দ চৈতন্যের জন্মসময় থেকে গণিত হয়। চৈতন্যাব্দের সঙ্গে ১৪৮৫ যোগ দিলে পাওয়া যায় খ্রিস্টাব্দ।

বিষ্ণুপুরি সন

বঙ্গাব্দ থেকে ১০১ বাদ দিলে বিষ্ণুপুরি সন পাওয়া যায়। যেমন—১২৪০ বঙ্গাব্দ-১০১ = ১১৩৯ বিষ্ণুপুরিসন।

অমলি সন

অমলি সনের সঙ্গে ৫৯২-৯৩ যোগ করলে যাওয়া যায় খ্রিস্টাব্দ। বিশ্বকোষ অনুসারে এই সন শুরু হয় ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে। অনেক ক্ষেত্রে অমলি সন ও বঙ্গাব্দ এক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "অমলি সনের সঙ্গে যে শকাব্দ নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে অমলি সন ও বঙ্গাব্দ অভিন্ন হইয়া পরে। যেমন 'বঙ্গাব্দ' বলিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে 'শকাব্দ' বা 'শকাব্দ' বলিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে 'বঙ্গাব্দ' বলা হইয়াছে, অনুরূপভাবে অমলি সন বলিতে গিয়া বঙ্গদেশের বহু প্রচলিত বঙ্গাব্দই নির্দেশ করা হইয়া থাকিবে। দৃষ্টান্ত—(ক) 'সন ১১৮৫ অমলি সকাব্দা ১৭০০ সালে লিখা হইল।'—বিশ্ব, ৯০১, ভাগবত-প্রথম স্কন্ধ, সনাতন বিদ্যাবাগীশ। (খ) 'মাহ আষাঢ় ১৫ স্‌স ১১৮৫ অমলি সকাব্দা ১৭০০ সালে সমাপ্ত। বিশ্ব ৯০৩, ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ, সনাতন বিদ্যাবাগীশ। (গ) 'তাং ২০ মাহ ফাল্গুন সন ১২৩০ অমলি।'-বিশ্ব, ৯২০, মহাভারত-কর্ণপর্ব, কাশীরাম দাস। উপরে উদ্ধৃত (ক) ও (খ) পুথিতে শকাব্দ ১৭০০ পাইতেছি। শকাব্দ ১৭০০ = ১১৮৫ বাং, অতএব অমলি ও বঙ্গাব্দ এ স্থলে অভিন্ন। (গ) পুথির এই 'অমলি১২৩০'—বিশ্বকোষ নির্দিষ্ট অমলি হইলে ১৫৫৫ + ১২৩০ অর্থাৎ ২৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ হইয়া পড়ে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও 'অমলি' সম্ভবত বঙ্গাব্দই নির্দেশ করিয়াছে।"[১১২]

দানিশাব্দ

বঙ্গাব্দ থেকে ১১৫৭ বাদ দিলে দানিশাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১২৪৮ বঙ্গাব্দ—১১৫৭ = ৯১ দানিশাব্দ।[১১৩] দানিশাব্দের সঙ্গে ১৭৫০ যোগ দিলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—দানিশাব্দ ৯১ + ১৭৫০ = ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ।

নেপাল সংবৎ

৮৮০ খ্রিস্টাব্দে নেপাল সংবৎ প্রবর্তিত হয়েছে। এহেতু নেপাল সংবৎ-এর সঙ্গে ৮৮০ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—নেপাল সংবৎ ৮০০ + ৮৮০ = ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ৮০০ নেপাল সংবৎ = ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দ।

জমিদারি সন

জমিদারি সনের সঙ্গে ১০১ যোগ দিলে বঙ্গাব্দ পাওয়া যায়। এবং বঙ্গাব্দ থেকে ১০১ বিয়োগ দিলে জমিদারি সন পাওয়া যায়। যেমন—১২২১ জমিদারিসন + ১০১ = ১২২২ বঙ্গাব্দ। এর সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করলে পাওয়া যায় খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ১১২১ জমিদারি সন = ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ।

গুপ্তসংবৎ

গুপ্ত সংবতের সঙ্গে ৩১৯ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১৪২৫ গুপ্তসংবৎ + ৩১৯ = ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ১৪২৫ গুপ্ত সংবৎ = ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ।

ইলাহী সন

ইলাহী সনের সঙ্গে ১৫৫৫ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন-৩২০ ইলাহী সন + ১৫৫৫ = ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ৩২০ ইলাহীসন = ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ।

বিলায়তী সন

বিলায়তী সনের সঙ্গে ৫৯২ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১২৪০ বিলায়তী সন + ৫৯২ = ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ১২৪০ বিলায়তী সন = ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ।

উত্তরীফসলী সন

উত্তরীফসলী সনের সঙ্গে ৫৯২ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১২৮৬ উত্তরীফসলী সন + ৫৯২ = ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ১২৮৬ উত্তরী ফসলী সন = ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ।

দক্ষিণী ফসলী সন

দক্ষিণী ফসলী সনের সঙ্গে ৫৯০ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—১১৯৫ দক্ষিণী ফসলী সন + ৫৯০ = ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ। অর্থাৎ ১১৯৫ দক্ষিণী ফসলী সন = ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

শাহূর সন

শাহূর সনের সঙ্গে ৫৯৯ যোগ করলে পাওয়া যায় খ্রিস্টাব্দ। যেমন—১০১০ শাহূর সন + ৫৯৯ = ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ১০১০ শাহূর সন = ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দ।

হর্ষ সংবৎ

হর্ষ সংবতের সঙ্গে ৬০৬ যোগ করলে পাওয়া যায় খ্রিস্টাব্দ। যেমন—৬৯৮ হর্ষ সংবৎ + ৬০৬ = ১৩০৪ খ্রিষ্টাব্দ। অর্থাৎ ৬৯৮ হর্ষ সংবৎ = ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দ।

চালুক্য বিক্রম সংবৎ

চালুক্য বিক্রম সংবতের সঙ্গে ১০৭৫ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। যেমন—চালুক্য বিক্রম ৫২০ + ১০৭৫ = ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ ৫২০ চালুক্য বিক্রম = ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

বীরনির্বাণ সংবৎ

বীর নির্বাণ সংবৎ থেকে ৫২৭ বিয়োগ দিলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়।

চৈত্রাদি বিক্রম সংবৎ

চৈত্রাদি বিক্রম সংবৎ থেকে ৫৭-৫৬ বিয়োগ দিলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়।

কলচুরি সংবৎ

কলচুরি সংবৎ আরম্ভ হয় ২৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে। এ হেতু কলচুরি সংবৎ এর সঙ্গে ২৪৮-৪৯ যোগ দিলে পাওয়া যায় খ্রিস্টাব্দ।

ভাটিক সংবৎ

ভাটিক সংবৎ প্রবর্তিত হয় ৬২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে। এ কারণে ভাটিক সংবৎ এর সঙ্গে ৬২৩-২৪ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়।

কোল্লম সংবৎ

৮২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে কোল্লম সংবৎ আবম্ভ হয়। এ হেতু কোল্লম সংবৎ-এর সঙ্গে ৮২৪-৭৯ যোগ করলে পাওয়া যায় খ্রিস্টাব্দ।

নেবার সংবৎ

৮২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে কোল্লম সংবৎ আরম্ভ হয়। এ হেতু কোল্লম সংবৎ-এর সঙ্গে ৮২৪-২৫ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়।

সিংহ সংবৎ

সিংহ সংবৎ শুরু হয় ১১১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে। অতএব, সিংহ সংবৎ এর সঙ্গে ১১১৩-১৪ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যাবে।

রাজ্যাভিষেক সংবৎ

এই সংবৎ প্রবর্তিত হয় ১৬৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে। এ কারণে এই সংবৎ-এর সঙ্গে ১৬৭৩-৭৪ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যাবে।

ঘ. প্রাচীন অব্দ লিখন পদ্ধতি

এ সব অব্দ পাণ্ডুলিপিতে দু'প্রকারে লেখা হত। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে গদ্যাকারে সহজরূপেই লেখা হত, আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে লেখা হত পদ্যাকারে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় শব্দে রচিত বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে। শাস্ত্রীয় বিভিন্ন শব্দ এবং তার অর্থ সম্পর্কে অবহিত না থাকলে এ সব পাণ্ডুলিপির কাল নির্ধারণ করা দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব। কেবল সময় নির্ধারণ নয় গ্রন্থের নাম, লেখক-লিপিকরের নাম প্রভৃতিও লিখিত

হত বিভিন্ন শ্লোকের মাধ্যমে এবং সুকৌশল শব্দ প্রয়োগে। সুতরাং পাণ্ডুলিপি পরিচায়নের ক্ষেত্রে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিভিন্ন শব্দ এবং তার অর্থ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। এতদ্বিষয়ে নিম্নে কয়েকটি শ্লোক এবং তার মর্মার্থ আলোচনা করা হলো :

(ক) নেত্রেন্দু সিন্ধু ক্ষিতি শাক সম্বিতে
গ্রেহায়নীয়াসিত পক্ষতৌ হরিম্।[১১৪]
'নেত্রেন্দু সিন্দু ক্ষিতিশাক'
নেত্র (ত্রিনেত্র = দর্শনেন্দ্রিয়ের ২টি নেত্র এবং ১টি জ্ঞানেন্দ্রিয়
অর্থাৎ জ্ঞান নেত্র) = ৩
ইন্দু (চন্দ্র) = ১
সিন্ধু (সপ্ত সিন্ধু অর্থাৎ সাত সমুদ্র)[১১৫] = ৭
ক্ষিতি (পৃথিবী) = ১
শাক = শকাব্দ

প্রাচীনকালে এ পদ্ধতিতে সাল গণনায় দুটি রীতি প্রচলিত ছিল—'দক্ষিণাগতি' এবং অপরটি 'বামাগতি'। 'দক্ষিণাগতিব' অর্থ হল শ্লোকস্থ শব্দগুলি বাম দিক থেকে ডানদিকে গুণতে হবে এবং 'বামাগতি' ঠিক এর বিপরীত, অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে ডান দিক থেকে বামে গুণতে হবে। পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ সালই লিখিত হয়েছে বামাগতি পদ্ধতিতে। উপরিউক্ত সালটিও বামাগতি পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে। ফলে এখানে গণনায় যে সালটির প্রাপ্তি ঘটল তা হলো ১৭১৩ শকাব্দ। উল্লেখ্য যে উপরিউক্ত সালটি দক্ষিণাগতিতে গণনা করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তা হল ৩১৭১ কিন্তু এটি আমাদের জ্ঞাত কোন সালের ব্যাপ্তিতেই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। অতএব সাল গণনার শব্দগুলো থেকে সংখ্যা বের করে প্রথমেই দেখতে হবে যে এটি কোন পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে এবং সেই পদ্ধতিতেই সালটি গণনা করতে হবে। অতএব আমাদের আলোচ্য উল্লিখিত সালটি অবশ্যই ১৭১৩ শকাব্দ এবং (১৭১৩ + ৭৮) = ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ।

(খ) রস শূন্য সপ্তদশ শকাব্দে শশিবাসরে
আষাঢ়ে মাসি সম্পূর্ণ : কৃতোহয়ং গ্রন্থআত্মনঃ ॥[১১৬]
'রস শূন্য সপ্তদশ শকাব্দ'
রস[১১৭] = ৬
শূন্য = ০
শপ্তদশ = ১৭

বামাগতি পদ্ধতিতে এ গণনায় হয় ১৭০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭০৬ + ৭৮ = ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ।

(গ) শাকেরন্ধ্র শ্রুতিকুসুমলিট্‌পাদ শীতাংশু সংখ্যেনত্বা
যত্নাদমলকমল প্রখ্যপাদং পুরারেঃ।[১১৮]
এখানে 'শাক' শব্দের অর্থ শকাব্দ

'রন্ধ্র' শব্দের অর্থ শূন্য = ০
'শ্রুতি' শব্দের অর্থ বেদ[১১৯] = ৪
কুসুম লিট্‌পাদ[১২০] শব্দের দ্বারা ভ্রমরের ছয়টি পায়ের কথা বলা হয়েছে = ৬
এবং শীতাংশু শব্দের অর্থ চন্দ্র = ১

অর্থাৎ বামাগতি পদ্ধতিতে প্রাপ্ত শাক (শকাব্দটি) ১৬৪০ বা খ্রিস্টাব্দ (১৬৪০ + ৭৮) = ১৭১৮

(ঘ) শর বেদর্ষি ভূমানে শাকে কলসজোরুণে
লিখিতা মাথুরী টীকা শিবনাথেন শর্ম্মণা ॥[১২১]
"শরবেদর্ষি ভূমানে শাকে"
এখানে শর অর্থ পঞ্চশর বা পঞ্চবাণ[১২২] = ৫
বেদ অর্থ চতুর্বেদ = ৪
ঋষি অর্থ সপ্তর্ষি[১২৩] = ৭
এবং ভূ অর্থ পৃথিবী = ১

অর্থাৎ বামাগতি পদ্ধতিতে গণনায় এ শকাব্দটি (শাক) হবে ১৭৪৫ এবং খ্রিস্টাব্দ (১৭৪৫ + ৭৮) = ১৮২৩

(ঙ) খ যুগ মুনি কুশাকে লিপ্ত পুস্তীং স্বকীয়া—
মবনি সুরকুলোদ্ভূঃ শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়াম্‌ ॥[১২৪]
"খ যুগ মুনি কুশাকে"

এখানে খ অর্থ আকাশ যার গাণিতিক মান শূন্য, অতএব খ যুগ বলতে বোঝায় দুইটি শূন্য = ০০

মুনি অর্থ সপ্তমুনি বা ঋষি = ৭
এবং কুঅর্থ পৃথিবী = ১

অর্থাৎ বামাগতি পদ্ধতিতে গণনায় প্রাপ্ত শাক (শকাব্দ) = ১৭০০ এবং খ্রিস্টাব্দ (১৭০০ + ৭৮) = ১৭৭৮

(চ) দ্বে দ্বে মুনীন্দু উদয়ে শাকেন্দুমন্দাত্মজভাগ
দিবসে সৌম্যেচবারেপি চ।[১২৫]
এখানে সংস্কৃত 'দ্বে' শব্দের অর্থ দুই।
অর্থাৎ দ্বে = ২
দ্বে = ২
মুনি বলতে সাতজন মুনি বা ঋষিকে বোঝানো হয়েছে = ৭
এবং ইন্দু অর্থ চন্দ্র = ১

অর্থাৎ বামাগতি পদ্ধতিতে গণনায় শাক (শকাব্দ) হয় ১৭২২ এবং খ্রিস্টাব্দ (১৭২২ + ৭৮) = ১৮০০

(ছ) শাকে ভূরস সপ্তি ভূমি বিমিতে সিংহেগতে পুষণি,
পঞ্চাংশে কুজ বাসরে হরিতিথৌ শ্রীরামদাসোদ্বিজঃ।[১২৬]
'শাকে ভূরসসপ্তি ভূমি বিমিতে'
এখানে 'ভূ; শব্দের অর্থ পৃথিবী = ১
'রস' বলতে ছয়টি রসের কথা বলা হয়েছে = ৬
'সপ্তি'[১২৭] বলতে 'সপ্তাশ্ব' কে বোঝানো হয়েছে = ৭
ভূমি' শব্দের অর্থ পৃথিবী = ১

বামাগতি পদ্ধতিতে গণনা করলে এখানে যে শকাব্দটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে ১৭৬১ এবং খ্রিস্টাব্দ ১৭৬১ + ৭৮ = ১৮৩৯।

(জ) শক দৃগশ্ব শক্রে নভসি নভোমনি দিনে
ষষ্ঠ্যাং ব্রজপতি সদ্মনি রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ।[১২৮]
এখানে 'দৃক্' শব্দ চোখ অর্থে অর্থাৎ ত্রিনেত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে = ৩
'অশ্ব' অর্থাৎ সপ্তাশ্ব = ৭
এবং 'শক্র' অর্থে ইন্দ্র[১২৯] = ১৪

অর্থাৎ বামাগতি পদ্ধতিতে প্রাপ্ত শক (শকাব্দটি) ১৪৭৩ এবং খ্রিস্টাব্দ (১৪৭৩ + ৭৮) = ১৫৫১

(ঝ) বিধিবেদাদ্রীন্দু শকে নভসী শনেত্রমিতে,
অভিধানং সৌম্যদিনে ব্যলিখৎ শ্রীরামজয় দ্বিজ ॥[১৩০]
'বিধি' শব্দের অর্থ ঈশ্বর = ১
'বেদ' বলতে চারিবেদের কথা বলা হয়েছে = ৪
'অদ্রি' শব্দের অর্থ পর্বত[১৩১] = ৭
এবং 'ইন্দু' অর্থ চন্দ্র = ১

এখানে বামাগতি পদ্ধতিতে যে শাক (শকাব্দটি) প্রাপ্ত হল তা ১৭৪১ এবং খ্রিস্টাব্দ (১৭৪১ + ৭৮) = ১৮১৯।

(ঞ) শাকে সাগর শীতদীধিতি ধরাধার্য্যোষধীশোন্মিতে
ভাদ্রস্যামৃত ধৃষ্টিলোচনমিতে শুক্লাষ্টমীত স্তিথৌ।[১৩২]
'শাকে' শব্দে শকাব্দ বোঝানো হয়েছে।
'সাগর' অর্থে বোঝানো হয়েছে সাত সমুদ্রকে = ৭
শীতদীধিতি' শব্দের অর্থ চন্দ্র = ১
'ধরাধারী' শব্দের অর্থ পর্বত = ৭
এবং 'ওষধীশ' শব্দের অর্থ চন্দ্র = ১

অর্থাৎ বামাগতি পদ্ধতিতে প্রাপ্ত শকাব্দটি হ'ল ১৭১৭ এবং খ্রিস্টাব্দটি (১৭১৭ + ৭৮) = ১৭৯৫।

(ট) শ্রীরুদ্র নারায়ণ, রায়তুষ্ট্যা অপ্নর্থিনাংপ্রাণভৃতাং পরায়ৈ,
পঞ্চাগ্নি কালেশ কপালভালে শাকে পিতৃনাং যবদানকালে ।[১৩৩]
এখানে 'পঞ্চাগ্নি'১৩৪ বলতে পাঁচ প্রকার অগ্নির কথা বলা হয়েছে = ৫
'কালেশ' শব্দটি শিব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে = ১
'কপাল' বলতে এখানে মাথার খুলির চারটি অংশকে বোঝানো হয়েছে = ৪
এবং 'ভাল' বলতে এখানে মস্তকের সম্মুখভাগকে বোঝানো হয়েছে = ১
এরূপভাবে বামাগতি পদ্ধতিতে যে শকাব্দটি প্রাপ্ত হল তা ১৪১৫
এবং খ্রিস্টাব্দ (১৪১৫ + ৭৮) = ১৪৯৩।

(ঠ) নাগেন্দু গোত্রক্ষিতি সংখ্যা শাকেমীনাগুভানোবসু চন্দ্রমানে।
মহ্যাত্মজাহেশিবকালিদাসোলিলেখ পুস্তিংবটুরামরাম ॥[১৩৪]
'নাগ' শব্দের গাণিতিক অর্থ আট, অর্থাৎ অষ্টনাগ[১৩৫] = ৮
'ইন্দু' অর্থ চন্দ্র = ১
'গোত্র' শব্দ পর্বত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে = ৭
এবং 'ক্ষিতি' শব্দের অর্থ পৃথিবী = ১

এখানেও বামাগতি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এ নিয়মে যে শাক (শকাব্দটি) পাওয়া গেল তা হলো ১৭১৮ এবং খ্রিস্টাব্দ (১৭১৮ + ৭৮) = ১৭৯৬।

(ড) শাকে খেষুরসেন্দুকে গুরুদিনে ভাদ্রে শুভাপূর্ণিমা-
যাতস্যাং পঠনেশ্চয়াত্মন ইয়ং স্বর্বাঘসংহারিণী ।[১৩৬]
'শাকে খেষুরসেন্দু (খ + ইষু + রস + ইন্দু)'
'শাক শব্দের অর্থ শকাব্দ।
'খ' শব্দের অর্থ আকাশ। আকাশ শূন্যের প্রতীক।
অর্থাৎ খ = ০
'ইষু' শব্দের অর্থ শর বা বাণ। শর শব্দ নির্দেশ করে পাঁচ সংখ্যা। অর্থাৎ ইষু[১৩৭]=৫
ছয়টি রস অর্থে 'রস' শব্দ ছয় সংখ্যার নির্দেশক। অর্থাৎ রস = ৬
'ইন্দু' শব্দের অর্থ চন্দ্র। চন্দ্র একটি তাই ইন্দু = ১

উক্ত শ্লোকে ব্যবহৃত হয়েছে বামাগতি পদ্ধতি। এ নিয়মে প্রাপ্ত শকাব্দ হলো ১৬৫০ এবং ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দ।

(ঢ) হরিপদমধুধারাং বেদযুগ্মাব্ধিচন্দ্রে
মিলিতগণিতশাকে পূর্ণতাং যাতিপীত্বা ।[১৩৮]
'বেদযুগ্মাব্ধিচন্দ্রে' (বেদ, যুগ্ম + অব্ধি, চন্দ্র)
চারিবেদ হেতু 'বেদ' শব্দের সংখ্যামান চার অর্থাৎ বেদ = ৪
'যুগ্ম' শব্দের অর্থ জোড়া বা দুই, অর্থাৎ যুগ্ম = ২ 'অব্ধি' শব্দের অর্থ সমুদ্র।
সপ্ত সমুদ্র বিধায় অব্ধি সাত সংখ্যার বোধক অর্থাৎ অব্ধি = ৭
'চন্দ্র' একটি অর্থাৎ চন্দ্র = ১

এখানে বাম্যগতি পদ্ধতি অনুসারে এ শকাব্দটি হয় ১৭২৪ এবং খ্রিস্টাব্দ (১৭২৪ + ৭৮) = ১৮০২।

(ণ) শাকে হস্তগজাদ্রিচন্দ্রবিমিতে ভানৌ স্থিতে মৈথুনে
যুগ্মেন্দুপ্রমিতে রবের্দিবসকে রাত্রৌ মুহূর্তদ্বয়ে।[১৩৯]
'হস্তগজাদ্রিচন্দ্র' (হস্ত, গজ + অদ্রি, চন্দ্র)।
মনুষ্য শরীরে হস্ত (বা হাত) দুটি এ অর্থে হস্ত দুই সংখ্যার বোধক, অর্থাৎ হস্ত = ২

'গজ' শব্দের অর্থ হস্তী বা ঐরাবত। অষ্ট দিক্‌গজ[১৪০] অর্থে 'গজ' আট সংখ্যার প্রতীক। অর্থাৎ গজ = ৮। 'অদ্রি' পর্বত অর্থে সাত সংখ্যার নির্দেশক। অর্থাৎ অদ্রি = ৭
চন্দ্র = ১

এ শ্লোকেও ব্যবহৃত হয়েছে বামাগতি পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রাপ্ত শকাব্দটি হয় ১৭৮২। এর সঙ্গে ৭৮ যোগে হয় ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ।

(ত) ক্ষেত্রে ধূর্জটিপুরাখ্যে নভঃসিন্ধুদিগীশ্বরে।
শাকে কর্কটগাদিত্যে দিনপতিবারে সমাপ্তস্ত্বিদম্।[১৪১]
'নভঃ সিন্ধুদিগীশ্বরে' (নভঃ, সিন্ধু, দিক্ + ঈশ্বর)।
নভঃ শব্দের অর্থ আকাশ। আকাশ শূন্য তাই নভঃ = ০
'সিন্ধু' শব্দের দ্বারা বোঝায় সপ্তসিন্ধু বা সাত সমুদ্র অর্থাৎ সিন্ধু = ৭
'পূর্ব, ঈশান, উত্তর, বায়ু, পশ্চিম, নৈঋত, দক্ষিণ ও অগ্নি—এ আটটি দিক্ অর্থে 'দিগ্' (ক্) শব্দ আট সংখ্যার বোধক। অর্থাৎ দিক্ = ৮
'ঈশ্বর' একজন বিধায় ঈশ্বর শব্দ এক সংখ্যার নির্দেশক অর্থাৎ ঈশ্বর = ১

এখানে বামাগতি পদ্ধতিতে যে শকাব্দটি পাওয়া গেল তা হলো ১৮৭০ এবং খ্রিস্টাব্দ (১৮৭০ + ৭৮) ১৯৪৮।

(থ) মুনি রস বেদ শশী শকে রহে সন।
শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন ॥[১৪২]
'মুনি রস বেদশশী শকে'
'মুনি' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে সপ্তমুনি বা সপ্তর্ষিকে। এ সপ্তর্ষি হেতু মুনি হয়েছে সাত সংখ্যার বোধক অর্থাৎ মুনি = ৭
'রস' শব্দে জ্ঞাপিত হয়েছে ছয়টি রস অর্থাৎ রস = ৬
চারি বেদ হেতু 'বেদ' নির্দেশ করে চার সংখ্যা
অর্থাৎ বেদ = ৪

'শশী' শব্দের অর্থ চন্দ্র। চন্দ্র একটি হেতু শশী এক সংখ্যার নিদের্শক অর্থাৎ শশী=১

উক্ত শ্লোকেও বামাগতি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এ পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত শকাব্দটি হলো ১৪৬৭ এবং খ্রিস্টাব্দ (১৪৬৭ + ৭৮) ১৫৪৫।

এরূপ শ্লোকাকারে সুকৌশল শব্দ প্রয়োগ ও চাতুর্যে লেখা সময়, লেখক, লিপিকর, গ্রন্থ প্রভৃতির পরিচিতির অসংখ্য নির্দশন রয়েছে প্রাচীন বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে। বর্তমান সময়ে যেহেতু খ্রীস্টাব্দের প্রচলন বেশি সেহেতু কোন পাণ্ডুলিপিতে এসব বিভিন্ন অব্দে লেখা লিপিকালের পার্শ্বে এর সঙ্গে সম্পার্কিত খ্রিস্টাব্দও উল্লেখ করা উচিত। কেননা এ সকল প্রাচীন অব্দের সঙ্গে সর্বসাধারণের পরিচয় না-থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই সহজভাবে সকলের বোঝার জন্য প্রাচীন পদ্ধতিতে লেখা অব্দের সঙ্গে খ্রিস্টাব্দ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

ঙ. আবজাদ রীতি

মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ের বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনামলে বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে আরবী ভাষার প্রভাবও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয়। আরবী আবজাদ রীতিতে তখন কোন কোন পুথির কালাঙ্ক, উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা, জন্ম বা মৃত্যুর সন তারিখ, শুভাশুভ নির্ণয় প্রভৃতি বিষয় লিখিত হত। এই আবজাদ রীতিতে সংখ্যাপ্রকাশক প্রতীকী শব্দের ন্যায় নানা প্রকার আরবী শব্দের প্রতীকে নির্দিষ্ট গাণিতিক সংখ্যা প্রকাশ করে। যেমন—

১-আলিফ	১০-ইয়ে	১০০-কাফ্
২-বে	২০-কাফ্	২০০-রে
৩-জিম	৩০-লাম	৩০০-শিন
৪-দাল	৪০-মিম্	৪০০-তে
৫-হে	৫০-নু	৫০০-সে
৬-ওয়াও	৬০-ওসন	৬০০-খে
৭-যে	৭০-আয়েন	৭০০-যাল
৮-হে	৮০-ফে	৮০০-যোয়াদ
৯-তোয়া	৯০-সাদ	৯০০-যে
১০০০-গায়েন		

ড: এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক গ্রন্থে আবজাদ রীতিতে কালাঙ্ক নির্দেশের একটি উদাহরণ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন—

সপ্ত হৈল পনি এবাদত নাম।
যেই দিনে সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম ॥

এখানে সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দাবলী হল-এবাদত (ইবাদত), নাম, এবং তামাম। 'ইবাদত' শব্দের জ্ঞাপিত সংখ্যামান হল-৪৭৭, 'নাম' শব্দের প্রতীকী সংখ্যা-৯১ এবং 'তামাম' শব্দেব নির্দেশিত সংখ্যা-৪৮১। এই তিনটি সংখ্যার যোগফলে সনটি হয় (৪৭৭ + ৯১ + ৪৮১) = ১০৪৯ হিজরী।

সংখ্যা প্রকাশক উক্ত শব্দত্রয়ের মাধ্যমে এরূপ সংখ্যা নির্দেশের ব্যাখ্যা হল- ইবাদত, নাম এবং তামাম এ শব্দগুলির প্রতিটি একাধিক সংখ্যাসূচক আরবী শব্দের প্রকাশক। 'ইবাদত' শব্দে নির্দেশ করে পাঁচটি সংখ্যাবাচক শব্দ, যেমন—আয়েন = ৭০, বে = ২, আলিফ = ১, দাল = ৪, তে-৪০০। এ সংখ্যাসমূহের সমষ্টি বা যোগফলে প্রকাশিত সংখ্যাটি হয় (৭০ + ২ + ১ + ৪ + ৪০০) = ৪৭৭। এ অর্থে 'নাম' শব্দে জ্ঞাপিত সংখ্যা ৯১। 'তামাম' শব্দে প্রকাশ করে চারটি সংখ্যা নির্দেশক শব্দ, যেমন-তে = ৪০০, মিম্ = ৪০, আলিঠ = ১, মিম্ = ৪০। এ শব্দাবলীর সমষ্টিতে প্রাপ্ত সংখ্যাটি হল(৪০০ + ৪০ + ১ + ৪০) = ৪৮১। এ অর্থে তামাম শব্দ হয়েছে ৪৮১ সংখ্যার প্রকাশক।

তথ্যসূত্র

১. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৪৪৩৫।
২. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩৯৬।
৩. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২৯৯১।
৪. শ্রীতারাপপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, কলিকাতা, পৃ. ১২।
৫. ঐ, পৃ. ১৫৫
৬. ঐ. পৃ. ১৫১
৭. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২৫৯৮
৮. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩৯৪৬।
৯. শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ. ৪৬
১০. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩৯৪
১১. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২৩৯৭
১২. রা. পা. সংখ্যা—৫৮১০
১৩. রা. পা. সংখ্যা—২০৪
১৪. রা. পা. সংখ্যা—১০৯৯
১৫. রা. পা. সংখ্যা—৫৭২৭
১৬. রা. পা. সংখ্যা—১০৯৬
১৭. রা. পা. সংখ্যা—১৭০০
১৮. রা. পা. সংখ্যা—১৭৪০
১৯. রা. পা. সংখ্যা—২৮০
২০. রা. পা. সংখ্যা—২০৪
২১. রা. পা. সংখ্যা—১০৮৭
২২. রা. পা. সংখ্যা—১০৭৬
২৩. রা. পা. সংখ্যা—৩২৩২
২৪. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০১৩০
২৫. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩৯৪৮
২৬. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৭০৯

২৭. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩২৫
২৮. শ্রীশিববতন মিত্র, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ. ২৮
২৯. শ্রীশিবরতন মিত্র, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ. ৩৯
৩০. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০২৩
৩১. রা. পা. সংখ্যা—২০০
৩২. রা. পা. সংখ্যা—২০৩
৩৩. রা. পা. সংখ্যা—২২১
৩৪. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—১৯৮৮
৩৫. রা. পা. সংখ্যা—৩২৩৮
৩৬. রা. পা. সংখ্যা—১৯৪
৩৭. রা. পা. সংখ্যা—৫৮১০
৩৮. রা. পা. সংখ্যা—১৯৯
৩৯. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩৯৪
৪০. রা. পা. সংখ্যা—১০৮২
৪১. বা. পা. সংখ্যা—৫৭৩৫
৪২. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৪৫১৮
৪৩. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০২৩ ক
৪৪. শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ,' পৃ. ১৩৮ (কলিকাতা)।
৪৫. রা. পা. সংখ্যা—২০৩
৪৬. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—১৯৮৮
৪৭ রা. পা. সংখ্যা—২০২
৪৮. রা. পা. সংখ্যা—২০০
৪৯. রা. পা. সংখ্যা—২৩৯৭
৫০. শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ. ৫৫ (কলিকাতা)।
৫১. শ্রী শিবরতন মিত্র সম্পাদিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ. ২৫।
৫২. শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।
৫৩. রা. পা. সংখ্যা—১৯২
৫৪. রা. পা. সংখ্যা—৩২১৭
৫৫. রা. পা. সংখ্যা—২৪৫২
৫৬. রা. পা. সংখ্যা—১৯৯
৫৭. রা. পা. সংখ্যা—১৯৪
৫৮. রা. পা. সংখ্যা—১০৬৯
৫৯. রা. পা. সংখ্যা—৩২৩২
৬০. রা. পা. সংখ্যা—১২১৬
৬১. রা. পা. সংখ্যা—২০০
৬২. রা. পা. সংখ্যা—১২১৬
৬৩. রা. পা. সংখ্যা—৫৮১০
৬৪. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৪১৭৯
৬৫. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২০৯৭
৬৬. রা. পা. সংখ্যা—২০৫

৬৭. রা. পা. সংখ্যা—১০৯৬
৬৮. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৪৫১৮
৬৯. রা. পা. সংখ্যা—২০০
৭০. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০২৩
৭১. রা. পা. সংখ্যা—১০৮০
৭২. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০৮৫
৭৩. শ্রীশিবরতন মিত্র, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ. ২৮।
৭৪. শ্রীশিবরতন মিত্র, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—৩৯
৭৫. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০৮৫
৭৬. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০২৩
৭৭. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০১৩৬
৭৮. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০৩৬
৭৯. শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ. ৩৬।
৮০. শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ. ৫৫
৮১. স্বাস্থ্যহীন
৮২. কবরের
৮৩. ঢা. বি. আ. সং সং—৬২৪
৮৪. অগ্রহায়ণ
৮৫. আশ্বিন
৮৬. বুধবার
৮৭. শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ. ৭৪
৮৮. রণে
৮৯. শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ. ৮৮।
৯০. শ্রীশিবরতন মিত্র, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ. ৪।
৯১. শ্রীশিবরতন মিত্র, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, পৃ. ৪।
৯২. আহমেদ শরীফ সম্পাদিত পুথিপরিচিত, পুথি সংখ্যা—৭০৯।
৯৩. আহমেদ শরীফ সম্পাদিত পুথিপরিচিত, পুথি সংখ্যা—৩৬৯।
৯৪. শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়, পৃ. ৩৭৬।
৯৫. ঐ
৯৬. শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫
৯৭. শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৬
৯৮. আহমদ শরীফ সম্পাদিত পুথিপরিচিত, পৃ. ১২১
৯৯. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২৪৭০
১০০. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০০২
১০১. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০২০
১০২. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০২৩
১০৩. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০৩০
১০৪. ঢা. বি. পুর্ণ সংখ্যা—৩০০৩২
১০৫. ঢা. বি. পুর্ণ সংখ্যা—৩০০৪৪
১০৬. রা. পা. সংখ্যা—২২৯

১০৭. রা. পা. সংখ্যা—৩০০৮৯
১০৮. রা. পা. সংখ্যা—৩০১২২
১০৯. শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮
১১০. শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭
১১১. শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাংলা পুথির লিপিকাল, পৃ. ৩৭৭
১১২. শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বাংলা পুথির লিপিকাল, পৃ. ৩৭৭
১১৩. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০২৩
১১৪. পৌরাণিক আখ্যায়িকায় লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি (ঘৃত), দধি, দুগ্ধ ও জল নামক সাত সমুদ্রের কথা জানা যায়।
১১৫. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০৩৬
১১৬. রস শব্দের সংখ্যামান ছয়। কারণ প্রাচীন মতানুসারে রস ষড়্‌বিধ—লবণ, অম্ল, মধুর, কটু, কষায় ও তিক্ত।
১১৭. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২৫৯৮
১১৮. হিন্দু সম্প্রদায়ের বিখ্যাত এবং সর্বপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব ভেদে চারভাগে বিভক্ত।
১১৯. কুসুমলিট্‌পাদ—'কুসুমলিট্ শব্দের অর্থ ভ্রমর বা মৌমাছি। 'পাদ' অর্থ পা। ভ্রমর বা মৌমাছির ছয় পা।
১২০. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২৯০৫৬
১২১. দ্র. ইষু.
১২২. মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু ও বশিষ্ট-প্রাচীন কালের এই সাতজন প্রখ্যাত ঋষি সপ্তর্ষি নামে পরিচিত।
১২৩. ঢা. বি পা. সংখ্যা—২৯০০৮
১২৪. রা. পা. সংখ্যা—১১৬৫
১২৫. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০০৮৫
১২৬. সপ্তি—যে সাতটি অশ্ব সূর্য দেবতার রথ টানে বলে কথিত আছে, সপ্তি বলতে এখানে সেই সাতটি অশ্বকে বোঝানো হয়েছে।
১২৭. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০১৩০
১২৮. ইন্দ্র-মত ভেদে ইন্দ্র চতুর্দশ।
১২৯. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩০১৩৬
১৩০. পর্বত-মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিপাত্র এই সাতটি পর্বত পুরাণে খ্যাত।
১৩১. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২৯০৭৫
১৩২. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২৯০৭২
১৩৩. পৌরাণিক আখ্যায়িকায় দক্ষিণ গার্হপত্য, আহবনীয়, পবন, পাবন নামক পঞ্চঅগ্নির কথা জানা যায়।
১৩৪. রা. পা. সংখ্যা—১০৮০
১৩৫. অষ্টনাগ পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছে বলে কথিত। এদের নাম যথাক্রমে—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ।
১৩৬. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২৪৭০

১৩৭. ইষু : হিন্দু পুরাণোক্ত মদন বা কন্দর্প দেবতার পাঁচটি শর বা বাণ (যথা-সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন) থাকায় শর পাঁচ সংখ্যার বোধক হয়েছে। এ পাঁচটি, উন্মাদনকারী পাঁচটি ফুলের নামে পঞ্চ (পুষ্প) বাণ বলেও কথিত। এ পাঁচটি ফুল হল—অশোক, চূত, নবমল্লিকা, অরবিন্দ ও রক্তোৎপল।

১৩৮. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২৩৬০

১৩৯. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৩৯৪

১৪০. পুরাণকাহিনীতে আছে—পূর্ব, ঈশান, উত্তর, বায়ু, পশ্চিম, নৈঋত, দক্ষিণ ও অগ্নি—এ আটটি দিকের রক্ষকরূপে অষ্টদিক্‌হস্তী নিয়োজিত। এ আটটি হস্তীর নাম ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্তম সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক। এ থেকে হস্তী বা গজ শব্দ আট সংখ্যার বোধক হিসেবে চিহ্নিত।

১৪১. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৪৪৩৫

১৪২. ঢা. বি. আ. সংখ্যা—৪২৪

পঞ্চম অধ্যায়

সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দ

ক. সংখ্যাবাচাক প্রতীকী শব্দ

সংখ্যা নির্দেশক শব্দ। অর্থাৎ শব্দের প্রতীকে সংখ্যার প্রকাশ। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় এমন কতগুলি শব্দ আছে যে-গুলি তাত্ত্বিকভাবে একেকটি সংখ্যা নির্দেশ করে। এগুলিকেই সংখ্যাবাচাক শব্দ বলে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কাল নির্ণয়ে, ছন্দ-অলংকারের যতি ও গণ নির্দেশে, জ্যোতিষে তিথি গণনায় সরাসরি সংখ্যা ব্যবহার না করে এই শব্দগুলির মাধ্যমে উদ্দিষ্ট গাণিতিক অর্থ বোঝানো হত। এভাবে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করে শ্লোকাকারে সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতিকে হেঁয়ালিও বলা হয়।

খ. প্রতীকী শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্র

প্রতীকী শব্দের ব্যবহার প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। এখানে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যই আলোচ্য বিষয়।

১. ছন্দ শাস্ত্রে

ছন্দের সংজ্ঞায় পদের মাত্রা বা অক্ষর অনুযায়ী গণ নির্ধারিত হয়। সকল সংস্কৃত ছন্দ যে দশটি গণে নিবদ্ধ (ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ, ল) এগুলির মাধ্যমে অনেক ছন্দকার ছন্দের সংজ্ঞা প্রণয়ন করেছেন। কোন কোন ছন্দকার তাদের ছন্দের সংজ্ঞা প্রণয়ন করেছেন ছন্দের সংজ্ঞা ও মাত্রা অনুযায়ী। এ ক্ষেত্রে যে ছন্দে একটি গণ একাধিকবার প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে সে ক্ষেত্রে ঐ গণটি বার বার প্রয়োগ না করে একটি সংখ্যা প্রকাশক শব্দের প্রতীকে লিখিত হয়েছে। 'গুরুর্নিধনমনুলঘুরিহ শশিকলা' (ছন্দোমঞ্জরী, পৃ. ১০০)। এ ছন্দের সংজ্ঞায় ব্যবহৃত 'মনু' শব্দটি গণ নির্দেশক সংখ্যাসূচক প্রতীকী শব্দ। চতুর্দশ মনু হেতু 'মনু' শব্দের সংখ্যামান চৌদ্দ। সংজ্ঞায়

ব্যবহৃত 'মনুলঘু' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে এ ছন্দে চৌদ্দটি লঘু গণ থাকবে। উক্ত সংজ্ঞায় 'মনু' শব্দটির পরিবর্তে যদি লিখতে হত চৌদ্দটি 'ল' গণ, তাহলে সংজ্ঞার মাত্রা ঠিক রাখা যেমন সম্ভব হত না, তেমনি সম্ভব হত না তার সৌন্দর্য রক্ষা করা। অর্থাৎ চৌদ্দটি ল গণ লেখা বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিয়েছে, একটি 'মনু' শব্দ। সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দের প্রয়োজনীয়তা এখানে স্পষ্টই বোধগম্য।

২. অলঙ্কার শাস্ত্রে

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও সংখ্যাবাচাক প্রতীকী শব্দের প্রয়োগ পরিদৃষ্ট। ধ্বনির রূপবৈচিত্র্য নির্দেশে অনেক সময় আলংকারিকগণ গাণিতিক সংখ্যার পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন সংখ্যা প্রকাশক প্রতীকী শব্দ। যেমন—

> তদেবমেকপঞ্চাশদ্ ভেদাস্তস্য ধ্বনের্মতাঃ।
> শঙ্করেণ ত্রিরূপেণ সংসৃষ্ট্যা চৈকরূপয়া
> (স) বেদাগ্নিশরাঃ শুদ্ধৈরিষুবাণাগ্নিসায়কাঃ ॥ ১৫ ॥

এখানে সংখ্যাপ্রকাশক শব্দ 'বেদাগ্নিশরাঃ' এবং 'ইষুব্যণাগ্নিসায়কা'। এ শব্দসমূহের প্রতীকী মান হলো-বেদ = ৪, অগ্নি = ৩, খ = ০, শর = ৫ এবং ইষু = ৫, বাণ = ৫, অগ্নি = ৩, সায়কা = ৫। বামাগতি পদ্ধতিতে সংখ্যাগুলি হয় ৫০৩৪ এবং ৫৩৫৫।

৩. অঙ্কাভিধানে, সংখ্যাকোষে, অমরকোষে

এ কোষ গ্রন্থসমূহে সংখ্যা প্রকাশক প্রতীকী শব্দের তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন—

> সপ্তপাতাল-ভুবন-মুনি-দ্বীপার্কবাজিনঃ।
> বারাব্ধি-স্বর-রাজ্যাঙ্গ-ব্রীহি-বহ্নিশিখাদ্বয় ॥ ৭ ॥
>
> বিদ্যা-যম-মনু-স্বারাট্-ভুবন-ধ্রুবতারকা ঃ।
> তিথয়ঃ স্যুঃ পঞ্চদশ ষোড়শেন্দুকলান্বিকা ॥ ১৩ ॥
>
> মহাপাপ-মহাভূত-মহাকাব্য-মহামখাঃ
> পুরাণ-লক্ষণান্যঙ্গানিল-বর্গেন্দ্রিয়ার্থকা ঃ ৫ ॥

৪. জ্যোতিষে

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় অনেক গণনায়, গ্রহ-নক্ষত্রের পক্ষ-কাল নির্ণয়ে প্রযুক্ত হয়েছে নানা প্রকার সংখ্যাপ্রকাশক প্রতীকী শব্দ। যেমন—

> অথ বিভাবরীভর্তস্ত্র্যঙ্গদশেশগতো
> অথ দেবগুরোর্বিষয়র্তুনবেশগতো।
> (শুদ্ধিদীপিকা, পৃ. ৬৮)

উক্ত প্রথম পংক্তিতে সংখ্যাপ্রকাশক প্রতীকী শব্দ ত্রি, অঙ্গ (= ৬), দশ, ঈশ (= ১১) এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে বিষয় (= ৫), ঋতু (= ৬), নব (= ৯) এবং ঈশ (=

১১)। পংক্তি দুটির অর্থ এরূপ-চন্দ্র যেস্থানে আছে সে ঘর হতে তৃতীয়, ষষ্ট, দশম ও একাদশ ঘরে এক একটি রেখাপাত করবে। এরূপ বৃহস্পতি হতে পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম ও একাদশ ঘরে একটি রেখা অঙ্কিত করতে হবে।

> কুজযমজ্ঞীবজ্ঞশিতাঃ পঞ্চেন্দ্রিয়বসুমুনীন্দ্রিয়াংশানাম্।
> বিষমে সমেষুৎ ক্রমতস্ত্রিংশাংশপাঃ কল্প্যাঃ ॥ ৩৬ ॥

উক্ত প্রথম পংক্তিতে উদ্ধৃত' পঞ্চেন্দ্রিয়বসুমুনীন্দ্রিয়া' (পঞ্চ, ইন্দ্রিয়, বসু, মুনি, ইন্দিয়) শব্দসমূহ সংখ্যাপ্রকাশক প্রতীকী শব্দরূপে পরিগণিত। পঞ্চ (= ৫), ইন্দ্রিয় (= ৫), বসু (= ৮), মুনি (= ৭), এবং ইন্দ্রিয় (= ৫) শব্দগুলির সহযোগে লেখক বুঝিয়েছেন—বিষম (মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ) রাশির প্রথম পাঁচভাগের অধিপতি মঙ্গল, তৎপর পাঁচভাগের আধিপতি শনি, তারপরের আটভাগের অধিপতি বৃহস্পতি, তারপরের সাতভাগের অধিপতি বুধ এবং শেষ পাঁচভাগের অধিপতি হয় শুক্রগ্রহ। সমরাশির ত্রিংশাংশ দেখতে হবে বিপরীতভাবে অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীনরাশির প্রথম পাঁচভাগ শুক্রের, তারপরের সাতভাগ বুধের, তার পরবর্তী আটভাগ বৃহস্পতির, তার পরবর্তী পাঁচভাগ শনির এবং শেষ পাঁচভাগ হবে মঙ্গলগ্রহের।

শুভঃপঙ্গুরর্কাৎ স্বাযমাম্ভোধিশৈলাষ্টদিক্শম্ভুঃ অথেন্দুতো রামাকালেশর্গঃ, স্বাসুতাদ্বহ্নিবাণর্তুকাষ্ঠাশিবার্কোপগতঃ, জীবতো বাণকালেশমার্তণ্ডযাতঃ, ততঃ স্বাৎ রামেষুকালেশযাতঃ, ততো লগ্নতঃ 'স্বাগুণাম্ভোধিষড়্দিঙমহেশস্থিতঃ' মত্তমাতঙ্গলীলাকরাভিধানমালাদণ্ডকেন শনৈশ্চরাষ্টবর্গঃ। (পৃ-৭৪)

এ শব্দসমূহেব মধ্যে ব্যাখ্যাত হয়েছে শনির অষ্টবর্গে রবি হতে প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ ঘরে; চন্দ্র হতে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ ঘরে; মঙ্গল হতে তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ ঘরে; বৃহস্পতি হতে পঞ্চম, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ ঘরে; শনি হতে তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও একাদশ ঘরে এবং লগ্ন হতে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ ঘরে রেখাপাত হবে।

৫. মন্ত্র-তন্ত্রে

হিন্দুশাস্ত্রীয় মন্ত্র-তন্ত্রেও সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রীয় চণ্ডীতে সংখ্যাবাচাক প্রতীকী শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সংখ্যাসূচক শব্দের মাধ্যমে শ্রীচণ্ডী পাঠের ফল নির্দেশিত হয়েছে। যেমন—

> রাজবশ্যায় ভূত্যৈ চ রুদ্রাবৃত্তমুদীরয়েৎ।
> অর্কাবৃত্ত্যা কাম্যসিদ্ধির্বৈরিহানিশ্চ জায়তে ॥ ৫ ॥

এখানে ব্যবহৃত রুদ্র শব্দের জ্ঞাপিত সংখ্যা এগার (একাদশ রুদ্র হেতু) এবং সূর্য অর্থে 'অর্ক' শব্দের প্রতীকী সংখ্যা দ্বাদশ।

> মন্বাবৃত্ত্যা রিপুর্বশ্যস্তথা স্ত্রী বশ্যতামিয়াৎ।
> সৌখ্যং পঞ্চদশাবৃত্ত্যা শ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ ॥
> কলাবৃত্ত্যা পুত্রপৌত্রধনধান্যাগমং বিদুঃ ॥ ৬ ॥

উক্ত শ্লোকটির প্রথম পাদে গ্রথিত 'মনু' শব্দটি সংখ্যাবাচক শব্দ। চতুর্দশ মনু হেতু 'মনু' শব্দে বোঝায় চৌদ্দ সংখ্যা। দ্বিতীয় পাদের 'পঞ্চদশ' শব্দের মাধ্যমে পনের সংখ্যা এবং তৃতীয়পাদের 'কলা' শব্দটি নির্দেশিত হয়েছে ষোল সংখ্যা (চন্দ্রের ষোল কলা হেতু)। শ্লোকটির এই সংখ্যা নির্দেশক শব্দসমূহ দ্বারা মন্ত্রপাঠের ফল নির্দেশিত হয়েছে।

৬. কালাঙ্ক নির্দেশে

সংখ্যাবাচক শব্দের সর্বাধিক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপির কালাঙ্ক নির্দেশে। মধ্যযুগের আরম্ভ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন বাংলা পুথিতে সন-তারিখ প্রকাশে লিখিত হয়েছে এ সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দ। যেমন—

শাকে গ্রহ বসু ঋতু বিধুর গগনে,
এই হেতু হইল গীত প্রকাশ ভুবনে ॥
(কালিকামঙ্গল)

এখানে সংখ্যাবাচক শব্দ গ্রহ = ৯, বসু = ৮, ঋতু = ৬ এবং বিধু = ১। বামাগতি পদ্ধতিতে শকাব্দটি হয় ১৬৮৯ (খ্রি. ১৭৬৭)।

শাকে সিন্ধোগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্যাহ্নশিতপঞ্চমাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাংগতঃ ॥
(চৈতন্যচরিতামৃত, ঢা. বি. পা. সং-২৪৮৭)

'সিন্ধোগ্নিবাণেন্দৌ' শব্দের বিসন্ধিতে পাওয়া যায় সিন্ধু (= ৭), অগ্নি (= ৩), বাণ (= ৫) এবং ইন্দু (= ১) শব্দগুলি। বামাগতি পদ্ধতিতে গণনায় এখানে শকাব্দটি হয় ১৫৩৭ এবং খ্রিস্টাব্দ (১১৫৩৭ + ৭৮) ১৬১৫।

ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন ॥

এখানে সংখ্যাপ্রকাশক শব্দ ভুবন ও বায়ু। ভুবন = ১৪ এবং বায়ু = ৪৯। দক্ষিণাগতি পদ্ধতি অনুসারে শকাব্দটি হয় ১৪৪৯ (খ্রি. ১৫২৭)।

গ. প্রতীকী শব্দের উৎপত্তি কাল

দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যের বিবিধ অঙ্গনে প্রতীকের মাধ্যমে সংখ্যাপ্রকাশের এই যে রীতি এর উৎস কি? কখন আরম্ভ হয়েছে এর পদযাত্রা? এ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন- "হেয়ালীর ভাষায় অব্দ প্রকাশের এই রীতির প্রাচীন ইতিহাস জানা যায় নি। অতি প্রাচীন কালের জ্যোতিষশাস্ত্রে বার তিথির উল্লেখে সাঙ্কেতিক শব্দের ব্যবহার ছিল। জ্যোতিষ গ্রন্থের অনুকরণে ক্রমশ অন্যান্য কাব্য গ্রন্থেও সাঙ্কেতিক শব্দের ব্যবহার হতে থাকে" (উদ্ধৃতঃ মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা, পৃ. ১০৮)"।

এরূপ মত আরো অনেকে পোষণ করে জ্যোতিষ শাস্ত্রকেই সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দ-ব্যবহারের মূল উৎস বলেছেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিবিধ বিষয়ে যেমন গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি প্রভৃতির লগ্ন-ক্ষণ নির্ণয়ে সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঠিকই, তবে তারও বহু পূর্বে এই সংখ্যাবাচক শব্দের বহুল প্রয়োগ হয়েছে সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে।

জ্যোতিষ চর্চা আরম্ভ হয়েছে বৈদিক যুগ থেকেই। ঐ সময় থেকেই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, আকাশ, বায়ু প্রভৃতির অবস্থান ও তাদের ক্রিয়া-কর্মের নানা পর্যালোচনা চলেছে এবং সে সব মতবাদ লিখিত হয়েছে বিভিন্ন জ্যোতিষ গ্রন্থে। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে প্রথম লিখিত গ্রন্থ বেদ। বেদের অঙ্গ বা শাখা ছয়টি। এর মধ্যে পঞ্চম অঙ্গ হল জ্যোতিষ। ভারতীয় জ্যোতিষের তিনটি শাখা—গণিত, হোরা এবং সংহিতা। গণিতশাস্ত্রে গ্রহগণের গতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হোরা শাস্ত্রে গ্রহগণের অবস্থান-দৃষ্টে জাতকের কোষ্ঠী নির্ণয় প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। সংহিতায় আলোচনা করা হয়েছে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত বিষয়।

তখনকার জ্যোতির্বিদ্যায় গণিত-বিভাগ বা গণিত-শাস্ত্রের প্রভাবই ছিল বেশি। এক কথায় ভারতীয় জ্যোতিষ ছিল গণিত-বিজ্ঞান-সাপেক্ষ। লগধ মুনি গণিতের প্রশংসা করে বলেছেন,

> 'যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
> তদ্‌বদ্ বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধনি স্থিতম্ ॥'
> তিনি আরও বলেছেন যে জ্যোতিষ হচ্ছে কাল-বিজ্ঞান-শাস্ত্র—
> 'বেদাহি যজ্ঞার্থম্ অভিপ্রবত্তা কালানুপূর্বা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ।
> তস্মাদিদং কালবিজ্ঞানশাস্ত্রং যো জ্যোতিষং বেদ স বেদযজ্ঞম্ ॥

বৈদিক যুগে জ্যোতির্বিদ্যার যে চর্চা হয়েছে তাতে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি এবং তাদের ক্রিয়া-কর্মের আলোচনাই লক্ষণীয়। আর এ সব জ্যোতিষচর্চায় যেখানে সংখ্যার প্রয়োজন হয়েছে সেখানে একক, দশক, শতক, সহস্র ইত্যাদির ব্যবহারই হয়েছে। গণিত—শাস্ত্রের এই দশমিক এবং শততমিক প্রণালী ভারতীয় হিন্দু বা আর্যরাই প্রথম আবিষ্কার করেন পরে পাটীগণিতের এ দশকক্রম-প্রণালী ভারত হতে আরব এবং আরব হতে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সুদূর প্রাচীনকালে ভারতীয়রা সাহিত্য-সংস্কৃতির সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজনে এই দশকক্রম প্রণালীই ব্যবহার করতেন। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, সংহিতা, বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ প্রভৃতিতে এর প্রমাণ লক্ষণীয়। অর্থাৎ বেদে যে জ্যোতির্বিদ্যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে কোথাও সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দের ব্যবহার নেই। দশকক্রম প্রণালীর ব্যবহারই লক্ষণীয়। যেমন—

মলমাস সম্পর্কে

> বেদ মাসো ধৃতব্রত দ্বাদশ প্রজাবতঃ
> বেদা য উপজায়তে। (১/২৫/৮)

[যিনি ধৃতব্রত হয়ে স্ব-স্ব ফলোৎপাদী (জায়মান) দ্বাদশ মাস জানেন তিনি ত্রয়োদশ (উপজাত) মাসের নামও জানে।]

নক্ষত্র সম্পর্কে

সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
অঘাসুহন্যন্তে গাবোর্জুন্যোঃ পর্যহ্যতে ॥ (১০/৮৫/১৩)

(পতিগৃহে গমনকালে সূর্য সূর্যাকে যে উপঢৌকন দিয়েছিলেন, তা আগে আগে চলল। মঘা নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকনের অঙ্গভূত গাভীসমূহ তাড়িয়ে নিয়ে যায়, অর্জুনী, অর্থাৎ ফালগুনী নামক দুই নক্ষত্রের উদয়কালে সেই উপঢৌকন বয়ে নিয়ে যায়।)

সোমেনাদিত্যাবলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী।
অথ নক্ষত্রাণামেষামুপস্থে সোম আহিতঃ ॥ (৫/৪০/৫)

(সোমের প্রভাবে আদিত্যগণ বলবাণ হন, সোমের প্রভাবে পৃথিবী প্রকাণ্ড হয়েছে, আরও এ সকল নক্ষত্রের সন্নিধানে সোমকে রেখে দেয়া হয়েছে।)

গ্রহণ সম্পর্কে

যত্ত্বা-সূর্য্য স্বভাবনুস্তমসাবিধ্যদ্যুসরঃ
অক্ষেত্রবিদ্যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ। (৫/৪০/৫)

(হে সূর্য, যখন অসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছিল, নিজস্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয় তৎকালে ত্রিভুবনও সেরূপ লক্ষিত হয়েছিল।)

ঋতুগণনা সম্পর্কে

পূর্বাপরং চরতো মায়ে যতৌ শিশূ ক্রীড়ন্তৌ পরিযাতো অধ্বরম্।
বিশ্বাসন্যন্যোক্ষুবনাক্ষিচষ্ট ঋতুরন্যো বিদধজ্জায়তে পুনঃ ॥ (১০/৮৫/১৮)

[এই দুটি শিশু ক্ষমতাবলে পূর্ব ও পশ্চিমে বিচরণ করেন, এরা ক্রীড়া করতে করতে যজ্ঞে যান। একজন (চন্দ্র) ভুবনে ঋতু ব্যবস্থা করতে করতে সংসার অবলোকন করেন। দ্বিথীয় (সূর্য) ঋতুগণ বিধান করতে করতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন।]

অর্থাৎ জ্যোতিষ থেকে সংখ্যাবাচক শব্দের উৎপত্তি যে হয় নি তা নিশ্চিত। কেবলমাত্র জ্যোতিষের ক্ষেত্রেই নয়, বেদের কোন ক্ষেত্রেই সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দের ব্যবহার হয় নি। উপনিষদেও তদ্রূপ।

জ্যোতিষশাস্ত্রের গণিতশাখা দুই প্রকার—সিদ্ধান্ত ও করণ। সিদ্ধান্তেই ভারতীয় জ্যোতিষ পূর্ণতা লাভ করে। তখনকার পাঁচখানি উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তের মধ্যে 'সূর্যসিদ্ধান্ত'ই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কথিত হয় স্বয়ং সূর্যদেবই নাকি এর রচয়িতা। প্রাচীন যুগের এই সূর্যসিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য সব সিদ্ধান্ত, সংহিতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 'সূর্যসিদ্ধান্তে'র রচনার সময় খ্রীস্টিয় তৃতীয় শতক বলে অনুমান করা হয়। বর্তমানে প্রচলিত সূর্যসিদ্ধান্তের যে-সব তালিকা দেখা যায়, তা খ্রিস্টিয় দশম শতকের অধিক প্রাচীন নয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে মূল সিদ্ধান্ত বিলুপ্ত হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান এবং তাদের ক্রিয়া-কর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

"প্রবহ বায়ুর তাড়নায় গ্রহগণ অতি দ্রুতবেগে পশ্চিম দিকে গমন করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহারা অন্যান্য তারা হইতে ভারী এবং তাহাদের ভ্রমণপথে প্রবাহ বায়ুর পরিমাণ অত্যন্ত কম, সেজন্য তাহার আঘাতের পরিমাণও কম, এই কারণেই গ্রহগণকে তারাসমূহের পিছনে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। এ গ্রন্থে সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না।

এরপরে এই 'সূর্যসিদ্ধান্ত' এবং অন্যান্য জ্যোতিষ-গ্রন্থ অবলম্বনে বরাহমিহির রচনা করেন 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' এবং অন্যান্য জ্যোতিষগ্রন্থ। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে বরহ মিহির এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর আবির্ভাবকাল ৫০৫ খ্রিস্টাব্দ। বরাহমিহিরও তাঁর গ্রন্থে গ্রহ-নক্ষত্রের কোন আলোচনায় সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দের প্রয়োগ করেন নি। সংখ্যা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন শতক দশক অনুসারে গণনা পদ্ধতি। যেমন—

"বরাহোক্তগোচরোহয়ম্।
সূর্য্যঃ ষট্‌ত্রিদশস্থিতস্ত্রিদশষট্ সপ্তাদ্যগশ্চন্দ্রমাঃ
জীবঃ সপ্তনবদ্বিপঞ্চমগতো বক্রার্কজৌ ষট্‌ত্রিগৌ।
সৌম্যঃ ষড়্‌দ্বিচতুর্দশাষ্টমগতঃ সর্বেহপ্যুপান্তে শুভাঃ
শুক্রাঃ ষড়্‌দশসপ্তমর্ক্ষসহিতঃ শার্দূলবৎত্রাসৃকৎ॥"

(বরাহের উক্ত গোচরশুদ্ধি কথিত হচ্ছে। জন্মরাশি হতে ষষ্ঠ, তৃতীয় ও দশস্থ রবি, শুভ; তৃতীয়, দশম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও জন্মস্থ চন্দ্র শুভ; সপ্তম নবম, দ্বিতীয় ও পঞ্চমস্থিত বৃহস্পতি শুভ; মঙ্গল ও মনি ষষ্ঠ, তৃতীয় ও (দশমস্থ) শুভ; ষষ্ঠ, দ্বিতীয়, চতুর্থ দশম, অষ্টম ও (দ্বাদশ) স্থিত বুধ শুভ; জন্মরাশি হতে একাদশস্থিত সমস্ত গ্রহই শুভপ্রদ হন। আর ষষ্ঠ, দশম ও সপ্তমস্থিত শুক্র ব্যাঘ্রের ন্যায় ত্রাস জন্মিয়ে থাকেন।)

সিদ্ধান্তে যেমন ভারতীয় জ্যোতিষের পূর্ণতা তেমনই আবার এ সিদ্ধান্তই ভারতীয় জ্যোতিষের শেষ উৎস। সিদ্ধান্তে প্রমাণাদি প্রয়োগের পরে প্রত্যেকটি গণনার ফল নির্ণয় করা হত গণিতের অন্য শাখা 'করণে' লিপিবদ্ধ করা হত কেবল গণনা-পদ্ধতি। অবস্থান বিষয় সূত্র দ্বারা গ্রহের অবস্থান নির্ণয় করা যায়, কিন্তু কি উপায়ে সেই সূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে 'করণে' তার কোন বর্ণনা থাকত না। পরবর্তী যুগে সিদ্ধান্তসমূহকে অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় বলে মনে করার ফলেই এবং করণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করার জন্যই ভারতবর্ষ থেকে জ্যোতির্বিদ্যা-চর্চা বিলুপ্ত হয়। ফলে ধীরে ধীরে জ্যোতির্বিদ্যার পরিবর্তে আবির্ভাব হয় জ্যোতিষের। তথাকথিত জ্যোতিষিগণ করণের সাহায্যে ফল গণনা, কোষ্ঠী রচনা, শুভাশুভ নির্ণয় ইত্যাদি গণনা-চর্চায় ব্রতী হন। তারই প্রভাবে বা অনুসরণে মধ্যযুগে যে সব জ্যোতিষগ্রন্থ রচিত হয়েছে সেক্ষেত্রে গণনা পদ্ধতিতে কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে সংখ্যাপ্রকাশক প্রতীকী শব্দ। যেমন—

কুজযমজীবজ্ঞশিতাঃ পঞ্চেন্দ্রিয় বসুমুনীন্দ্রিয়াংশানাম্।
বিষমে সমেষূৎক্রমতস্ত্রিংশাংশপাঃ কল্প্যাঃ ॥ ৩৬

[বিষম (মেষ), মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ রাশির প্রথম পাঁচভাগের (পঞ্চ) অধিপতি মঙ্গল, তৎপর পাঁচভাগের (ইন্দ্রিয়) অধিপতি শনি, তারপরের আটভাগের

(বসু) অধিপতি বৃহস্পতি, তারপরের সাতভাগের (মুনি) অধিপতি বুধ এবং শেষ পাঁচভাগের (ইন্দ্রিয়) অধিপতি হয় শুক্র গ্রহ ।]

প্রাপ্ত তথ্যানুসারে তাই বলা যায় জ্যোতিষের ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক প্রতীকী শব্দের ব্যবহার প্রাচীন যুগে নয়, হয়েছে মধ্যযুগে।

বাংলা সাহিত্যের উন্মেষের প্রথম দিকে প্রাচীন যুগের সংস্কৃতের একক, দশক ক্রম গণনা পদ্ধতির প্রভাব পরিলক্ষিত নানা ক্ষেত্রে। যেমন—

"তেরশ পাঁচনই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥"—শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

"শকে চতুর্দ্দশশতে রথিরাজিযুক্তে গৌরোহরির্ধরণিমণ্ডল আবিরাশীৎ
তিথিংশ্চতুর্ন্নবতি ভাতি তদীয়লীলা গ্রন্থোয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্তাৎ ॥"
—ঢা. বি. পা. সং—৪৫১৮

"পড়িয়া বুঝিব সব শাস্ত্রের উদ্দেশ।
একাদশ বিংশ দুই পুস্তক বিশেষ ॥"—গদামল্লিকা।

"চতুর্দ্দশ ভুবনে শ্রীজিলা প্রভু অবিলম্বে।
সপ্ত খণ্ড গগন শ্রীজিলা বিনুস্তম্বে ॥"—আ.ক.সং. সংখ্যা-৪৬৩

ক্ষেমেন্দ্রের 'সুবৃত্ততিলক', জয়দেবের 'জয়দেবছন্দ', বিরহাঙ্কের 'বৃত্তজাতিসমুচ্চয়' জয়কীর্তির 'ছন্দোনুশাসন', দামোদর মিশ্রের 'বাণীভূষণ', গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী', কবিশেখর চন্দ্রশেখর ভট্টের 'বৃত্তমৌক্তিক' প্রভৃতি ছন্দোগ্রন্থে ছন্দের যতি ও গণ নির্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে সংখ্যাবাচক শব্দ। এ সব গ্রন্থে সান্দসিকগণ অত্যন্ত সুকৌশলে বিভিন্ন ছন্দে রচিত শ্লোকের প্রতি চরণে কত অক্ষর পরপর যতি থাকবে তা ছন্দের সংজ্ঞায় প্রতীকী শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। অলংকারশাস্ত্রেধ্বনির রূপবৈচিত্র্য নির্দেশে এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ, রাশি-লগ্ন-ক্ষণ নির্ণয়ে জ্যোতির্বিদগণ প্রয়োগ করেছেন সংখ্যাপ্রকাশক প্রতীক শব্দ। এর সাদৃশ্যে সংস্কৃত কবিগণ তাঁদের কাব্যগ্রন্থে কালাঙ্ক নির্দেশে ব্যবহার করেছেন এই প্রতীকী শব্দসমূহ। আর এই সংস্কৃত কবিদের কৌশলপূর্ণ প্রতীকী শব্দের প্রয়োগে আকৃষ্ট হয়ে বা তাদের অনুকরণেই মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের কবি ও লিপিকরগণ কালাঙ্ক নির্ণয়ে প্রয়োগ করেছেন এই প্রতীকী শব্দসমূহ।

এরূপ হেয়ালীপূর্ণ শ্লোকের শব্দগুলি কল্পিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র, দেব-দেবী ও মানুষের নাম এবং তাঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদি, মাস-বৎসর, মুনি-ঋষির নাম, পার্থিব জগতের নানা বিষয়, প্রাচীন যুগের বিখ্যাত বিভিন্ন বিষয় প্রভৃতি থেকে। নিম্নে সংখ্যার ক্রমানুসারে বিভিন্ন সংখ্যাবোধক শব্দের একটি তালিকা প্রদত্ত হল।

ঘ. সংখ্যাবাচক শব্দের তালিকা

০—শূন্য, বিন্দু, রন্ধ্র, পঞ্চমভূত, রিক্ত, কান্তামধ্য, আকাশ, অনন্ত, ব্যোম, খ, অন্তরীক্ষ, নভঃ, বিয়ৎ, গগন, অম্বর, অভ্র, বিহায়স, ঘনাশ্রয়, সুরপথ, উড়ু পথ, মরুৎপথ, দ্যো,

দিব, দিব, গগনমণ্ডল, নভোমণ্ডল, গগনতল, বায়ুমণ্ডল, নভস্তল, গগনান্তরাল। দিবতল, চক্রবাল, ঘনাশ্রয়, অম্বরান্তরাল, শুক্তি, শ্বভ্র, খগপথ, ভ্রাষ্ট, বায়ুমান, দেবযান, সুরমার্গ।

১—অত্রিজাত, অত্রিনেত্রজ, অত্রিদৃগজ, অত্রিনেত্রপ্রসূত, অত্রিনেত্রভূ, অব্জ, অব্ধিজ, ইন্দু, ওষধীশ, ওষধীনাথ, ওষধীরপতি, কলাধার, কলানিধি, কলানাথ, কুমুদবান্ধব, কলাপ, খচমস, চন্দ্র, চন্দ্রমা, তুহিনকর, তুহিনদীধিতি, তুহিনাংশু, দ্বিজপতি, দ্বিজরাজ, দ্বিজেশ, দশাশ্ব, দশবাজী, তুষারকর, নক্ষত্রেশ নভশ্চমস, নভোমণ্ডলদ্বীপ, নিশামণি, নিশিরাজ, নিশাকর, নিশানাথ, নিশাপতি, নক্ষত্রপতি, বিধু, ভগ্নাত্ম্যা, ভুবন্যু, মৃগাঙ্ক, মৃগলাঞ্ছনা, যামিনীনাথ, যামিনীপতি, যামিনীভূষণ, রজনীকর, শশধর, শশী, শশাঙ্ক, শীতরশ্মি, শীতাংশু, শশবিন্দু, শশভৃৎ, শশলাঞ্ছন, শুচি, শুচিরোচি, শুভ্ররশ্মি, শুভ্রাংশু, সোম, সুধাকর, সবণ, সুধাংশু, হিমকর, হিমাংশু, বসুধা, ধরণী, ইলা, মহী, ক্ষিতি, ভূ, উর্বরা, অবনী, ধরা, ভূমি, পৃথ্বী, কু, বসুন্ধরা, বসুমতী, গো, পৃথিবী, সর্বংসহা, ধরিত্রী, ক্ষান্তমেদিনী, অবনি, ভূমণ্ডল, অক্ষর, ঈশ্বর, অদ্রীশ, অদ্রিশ, ব্রহ্ম, ধাতা, বিধাতা, অজ, ধ্রুব, আত্মা, কালেশ, বিধি, বিভু, জগৎপিতা, জগদীশ, ভগবান, পরমেশ, ঈশ, বিশ্বপতি, ব্যোমকেশ, মহাদেব, পিতামহ, পরমেশ্বর, রূপ, নায়ক, আদি, তনু, গুরু, অব্দ, উচ্চৈঃশ্রবা, শ্রীরাম, রাঘব, ঐরাবত, ত্রিদিব, ইন্দ্রহস্তী, ইন্দ্রাশ্ব, গজাস্যরদ, শুক্রদৃক্, শুক্রাক্ষি, বিঘ্নেশরদ, নরকায়া, নরগাত্র, কলেবর, উক্থা, শ্রীঃ।

২—দ্বিতীয়, দ্বি, দ্বৈত, দ্বয়, নদীকুল, যুগ, যুক্, উভ, নদীতীর, পাদ, নরশ্রুতি, নরভুজ, যামল, মিথুন, অসীধারা, রামনন্দন, হোরা, কপোল, নিতম্ব, অয়ন, উরু রাঘবাত্মজ, বড়বাস্তন, দ্বন্দ্ব, কুটুম্ব, রবিচন্দ্রৌ, জঙ্ঘা, গুল্ফ, ঈক্ষণ, নয়ন, অক্ষি, দৃষ্টি, চক্ষু, লোচন, নেত্র, অশ্বিন, অত্রিদৃক, অগ্নিচক্ষু, মাদ্রীনন্দন, করীদন্ত, কুঞ্জররদ, দ্বিপদন্ত, নাসত্য, যম, যমল, দস্র, করতল, পদতল, পক্ষ, পাখা, যুগল, জানু, যুগ্ম, বাহু, ওষ্ঠ, কর, কর্ণ, কুচ, ভুজ, ভ্রূ, অনিল, ষণ্ডামর্ক, বারণরদ, মাতঙ্গ, নারীস্তন, কপোল, সরিৎপুলিন, তটিনীতীর, সর্পজিহ্বা, অত্যুক্থা, স্ত্রী, নরপাণি, গজদন্ত, হস্তীরদ, প্রবাহিনীতট, বিষ্ণুপত্নী।

৩—ত্রয়, জরাঙ্ঘ্রি, লোক, ত্রি, কটু, কর্ম্ম, কার্য, কাল, কুল, বংশত্রয়, কূট, কোন, বর্গ, গর্ত্ত, গুণ, চক্র, নাথ, নেত্র, চক্ষু, লোচন, চীবর, জগৎ, ভুবন, বিষ্টপ, সংসার, জাতক, তত্ত্ব, ঋণ, কর্ম্মপাতক, ব্যাধি, দোষ, মদ, যুগ্মগুণ, তন্ত্রী, তাপ, দণ্ড, দিব, দেব, ধাম, ধার, পথ, পলাশবৃক্ষ, পাদ, পাপ, পাতকত্রয়, পারীণ, পিটক, পিটকত্রয়, পুর, পুরাসুর, তারকাসুর, পুরুষ, পুরুষত্রয়, পুষ্কর, বর্ণ, পুষ্করবার, ত্রিফলা, বর্ণক, বর্ষ্ম, বলি, বিদ্যা, বেদী, বিৎকরণ, ভূত, বৃৎকরণ, বেণী, মধু, মূর্ত্তি, কালত্রয়, বিষ্ণু, লোকেশ, লোকনাথ, লৌহক, শক্তি, দুর্গা, শিখত্রয়, শিরাত্রয়, শীর্ষক, মুণ্ড, সন্ধ্যা, মার্গ, শিবচক্ষু, শিবলোচন, শিবদৃক্, ত্রিবেদী, রাম, কার্ষিক, ত্রিক্, গণ, কালাগ্নি, কালিদাসকাব্য, গায়ত্রী, নারী, রুদ্রাক্ষি, ত্রিতয়, ঈশদৃক, শূলশিখা, মহীকোণ, মৃগ, ঋতু, রত্ন, শরণ, লোকী, ত্র্যক্ষ, ত্র্যক্ষর, প্রণব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়রথ, গ্রীবরেখা, গ্রীবলেখা, ত্রয়ী, সিদ্ধি, স্বর, অর্থ, বিষ্ণুপত্নী, প্রণাম, নমস্কার, নতিকরণ, ত্রিবিক্রমপদার্পণ, সহোদরা, তপনতনয়,

বিরূপাক্ষ, শিবাক্ষি, মধ্যা, নারী, মৃগী, অগ্নি, বহ্নি, হুতাশ, হুতাশন, জ্বলন, শিখী, বিষ্ণুর অঙ্ঘ্রি, কৃশানু, পাবক, বৈশ্বানর, দহন, বহ্নিচরণ, বিশ্বদেব, অগ্নিত্রয়, অগ্নিপাদ, অত্রি, বিভাবসু, সর্বভুক, সর্বশুচি, শুষ্মা, শুষ্ক, ভুজি, শুন্ধ্যু, গঙ্গা, ত্রিবেণী, তিরপুনি, গঙ্গামার্গ, সুরধুনী, ভাগীরথী, জাহ্নবী, তুষগ্রহ, তুষসার, বিষ্ণুপদ।

৪—বেদ, ব্রহ্মাস্য, অব্দি, হরিবাহু, স্বর্দন্তিদন্ত, ভদ্র, বিষ্ণুমূর্তি, চতুর্ব্যূহ, অঙ্গ, কর্ম্মযুগ, নারী, বামা, পূর্ণসৈন্য, সেনাঙ্গ, উপায়, যাম, যুগ, গোস্তন, অর্ণব, বর্গ, কাল, হস্তপদাদি, গাভীস্তন, অন্তরিন্দ্রিয়, স্নান, সিন্ধু, রত্নাকর, পুরুষার্থ, পশু, সমুদ্র, অম্বুধি, উদধি, আশ্রম, রমণী, কৃত, তুর্য, ধাম, বক্র, বর্ণ, কোষ্ঠ, দিশ, দিক্, সাধন, জলনিধি, সাগর, স্তিস্তি, প্রতিষ্ঠা, কন্যা, সতী, অর্থ, পয়োধি, বারিধি, পাথার, জলধি, ব্রহ্মাবক্র, চতুর্মুখ, বিষ্ণুর বাহু, ব্রহ্মানন, সম্প্রদায়, বৃন্দা, শ্রুতি, কাল, ভদ্র, অভিনয়, বৃত্তি, গোত্র।

৫—অনিল, সন্ধি, ভূত, উপাসক, কর্ম্ম, ইন্দ্রিয়, কল্যাণ, কষায়, কোল, কোষ, কোষবিদ্যা, গঙ্গা, পঞ্চগঙ্গা, গব্য, গুঁড়ি, গুণ, গৌড়, চূড়ক, জ্ঞানেন্দ্রিয়, তত্ত্ব, তন্ত্র, তন্মাত্র, তিক্ত, দেবতা, দ্রাবক, দ্রাবিড়, নখ, নদ, নদী, নিম্ব, পক্ষী, নীরাজন, পঞ্চপর্ব, পল্লব, পুষ্প, পাণ্ডব, পাত্র, পিতা, পিণ্ড, প্রদীপ, প্রাণ, প্রেত, বট, বক্র, বটী, বন্ধন, বর্ণ, বর্গ, বল্কল, বাণ, বায়ু, কামগুণ, ভদ্র, ম, মহানদী, মহাপাতক, মহাযজ্ঞ, মূত্র, মুদ্রা, রঙ্গ, রত্ন, রাজচিহ্ন, রূপ, লক্ষণ, পুরাণলক্ষণ, লবন, লোকপাল, লৌহ, শস্য, সুগন্ধিক, স্মরণীয়া, পঞ্চায়েত, অগ্নি, অঙ্ক, অঙ্গ, আল, আনন্দ, অপ্সরা, তীর্থ, নারীতীর্থ, আমরা, আয়ুধ, অমৃত, আম্র, অম্ল, কর্মেন্দ্রিয়, উপাচার, সায়ক, ইষু, বিশিখা, বিষয়, অর্থ, কোষ্ঠ, মধ্যশরীর, মহাভূত, কন্যা, পঞ্চবটী, বৃক্ষ, ন্যায়, মহামখ, প্রাণানিল, পঞ্চমূল, শিবাস্য, রুদ্রাস্য, শিবানন, পঞ্চানন, স্বরাস্য, সর্বজ্ঞানন, বৃহৎমূল, স্বল্পমূল, তৃণমূল, শতবর্ষাদিমূল, জীবকাদিমূল, বলাদিমূল, গোক্ষুরাদিমূল, গুড়ুচ্যাদিমূল, কণ্টকমূল, শর, সুপ্রতিষ্ঠা, বৃত্তি।

৬—বজ্রকোণ, ত্রিশিরোনেত্র, তর্কাঙ্গ, চক্রবর্তী, মহাসেনবদন, গুণ, চক্র, গঙ্গা, ফরিঙ্, প্রজ্ঞা, গয়া, দুর্গ, শাস্ত্র, শত্র, কর্ম, ভৃঙ্গপাদ, গুহানন, বর্গ, কায়, তর্ক, ঋতু, রস, ফসল, নন্দী, অরি, অঙ্গ, দর্শন, কুমার-আস্য, কায়া, কার্তিকের আনন, রিপু, রাজ্য, কুসুমলিট্‌পাদ, শক্র, ভাব, লবণ, বেদাঙ্গ, গব্য, গোজাত, ধূপ, ষড়ঙ্গক, ষড়জ, অভিজ্ঞ, ষড়াম্নায়, ভগ, শিবানুচর, গুহবক্র, আধ্যাত্মিকইন্দ্রিয়, বহিরায়তনইন্দ্রিয়, ষট্‌পদ।

৭—অগ্নি, জিহ্বা, অর্চ্চি, অংশু, তন্তু, বহ্নিশিখা, দীধিতি, জ্বাল, বহ্নিজিহ্বা, অত্রি, অশ্ব, তুরগ, বাজী, ঘোড়া, ঘোটক, তুরঙ্গম, হয়, অঙ্গ, রাজ্যাঙ্গ, স্বামী, লোক, ভুবন স্বর্গ, পাতাল, ভূতল, পরলোক, সমুদ্র, সাগর, অর্ণব, অব্ধি, জলনিধি, উদধি, জলধি, সিন্ধু, স্তিস্তি, বারিধি, পায়োধি, পাথার, পারাবার, রত্নাকর, গঙ্গাধর, সলিলধি, সলিলনিধি, পর্বত, কুলপর্বত, কুলাচল, অগ, অচল, বসুধর, মহীধর, মহী, ভূধর, পৃথ্বীধর, গিরি, ভূভৃৎ, বর্ষপর্বত, কলিন্দ, অব্দ, নগ, অদ্রি, শৈল, নরকাঞ্চী, সপ্তকী, পলাশপর্ণ, ছাতিমচ্ছদ, মুনি, ঋষি, সপ্তর্ষি, ঋষিমণ্ডল, সপ্তক, স্বর, স্বরগ্রাম, স্বরা, গ্রাম, রক্ত, ধাতু, সপ্তি, রথী, দ্বীপ, দ্বীপা, প্রকৃতি, ধী, সপ্তপদী, সাম, দ্বীপপতি, সপ্তাহ, বার, দিন,

চিত্রশিখণ্ডী, মাতা, ব্রীহি, চিরজীবী, সপ্তাংশু, বৃশ্চিকগ্রন্থি, অস্ত, মহর্ষি, আবরণ, তল, পৃথী, বীজ, স্ব।

৮—যোগাঙ্গ, ঈশমূর্তি, ব্রহ্মশ্রুতি, ব্যাকরণ, দিক্‌পাল, কাল, ধর্ম, ধাতু, জ্বর, দৃষ্টি, নায়িকা, ব্রহ্মশ্রোত্র, পরিষদ, নতি, মহিষী বামনরূপীবিষ্ণু, গুণ, ব্রহ্মাকর্ণ, দ্রব্য, ক্ষীর, ধৃর্ত্তি, মঙ্গলঘৃত, অষ্টশ্রবা, অনুষ্টুপ্, সিদ্ধি, তক্ষ, দিগ্‌গজ, দ্বিপ, ভূতি, মঙ্গল, সর্প, অহি, বসু, হস্তী, দণ্ডী, মাতঙ্গ, কুঞ্জর, নাগ, অঙ্গ, গজ, কুলাচল, দিক্, দিকরক্ষক, গজ, ঐশ্বর্য, লূতাপাদ, পাশ, বর্গ, দুর্গাভুজ, অষ্টভুজ, ভৈরব, মূত্র, মূর্ত্তি, লোকধর্ম, লৌহক, লৌহ, সখী, যোগিনী, সাত্ত্বিক, প্রণাম, বজ্র, মৈথুন, অর্ঘ্য, উপাচার, আয়ুর্বেদঅঙ্গ, সেনাঙ্গ, চণ্ডীমূর্তি, তক্ষক, ভোগী, অবয়ব।

৯—অঙ্গদ্বার, ভূখণ্ড, কার্তিকরাবণমস্তক, ব্যাঘ্রীস্তন, সুধাকুণ্ড, সেবধি, গ্রহ, সুধাকুণ্ড, কৃত্তবাবণমস্তক, গোপ্যখণ্ড, ধান্য, ধেনু, শিলা, ভক্তি, বীর, নন্দ, পবন, গো, অস্ত, অঙ্ক, ছিদ্র, দ্বার, রস, নব, রন্ধ্র, নিধি, নবপত্রিকা, প্রস্থান, বর্ষ, রঙ্গ, রত্ন, লক্ষণ, শক্তি, শায়ক, নবমী, দুর্গা, নট, উপাধ্যায়, পঞ্চমূল, স্থায়ীভাব, দ্রব্য, বৃহতি।

১০—হস্তাঙ্গুলি, শম্ভুবাহু, রাবণমস্তক, কৃষ্ণাবতার, বিশ্বদেব, অবস্থা, ইন্দুবাজী, বাবণমৌলি, স্থাণুবাহু, রাবণানন, চুম্বন, ধর্মপত্নী, ধূপ, উপাচার, চন্দ্রবাজী, কলাবাজী, অগ্নিকলা, অগ্নিমূর্ত্তি, নির্ঘণ্টু, সূত, রূপক, অবতার, ককুপ, কর্ম্ম, আশা, বিশ্ব, দিক্, রাবণমুণ্ড, দিশ্, অঙ্গুলী, পংক্তি, দিশা, রাবণশিব, দশক, দশকণ্ঠ, রাবণকণ্ঠ রাবণকন্ধর, রাবণগ্রীবা, রাবণাস্য, কর্মান্বিত, দশা, দিক্, দিক্‌পাল, নাম্নী, শাখা, পিণ্ড, প্রহরণ, বল, বুদ্ধবল, বাইচণ্ডী, দশভূজা, মহাবিদ্যা, শীল, হরা, অঙ্গধূপ, অশ্বমেধ, অশ্বমেধিক, ক্লেশ, সংস্কার, শিবকর্ণ, শিবনেত্র, দেবযোনি।

১১—মহাদেব, করণ, কুরুভূপতিসেনা, বৃষধ্বজ, ঈশ্বর, ঈশ, ভব, অক্ষৌহিণী, শূলী, ভর্গ, শিব, রুদ্রাক্ষর, ঈশান, হর, রুদ্র, তনু, মূর্তি, গণদেবতা, দ্বার, একাদশ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়দেব, ত্রিষ্টুপ, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা।

১২—অর্ক, রাশি, সংক্রান্তি, গুহবাহু, কলিন্দ, প্রভাকর, সবিতা, মিহির, অরুণ, অংশুমালী, দিনমণি, তুষিত, সারিকোষ্ঠক, সেনানীনেত্র, ক্ষ্মাপতিমণ্ডল, দিনপ্রণী, সাধ্য, আভাস্বর, জগতী, নভশ্চক্ষু, বিয়ন্মনি, অরুণসারথী, মাস, মার্তণ্ড, ব্যয়, দ্যুমণি, ভানু, ভাস্কর, অম্বরমণি, দিনবন্ধু, দিনপতি, দিনদেব, দিননাথ, দিবাবসু, তপন, কার্ত্তিকের চক্ষু, সহস্রাংশু, সূর্য, বংশস্থবিলম্, কার্ত্তিকবাহু, কুমারকর্ণ, মহাসেনকর, আদিত্য, কার্তিকেরকর, রবি, দিবাকর, দিনকর, সূর্যকলা, ভানুরশ্মি, ইন্দ্রিয়, কার্ত্তিকলোচন, আত্মা, দ্বাদশী, যাত্রা, মদ্য, মল, বন, পুত্র, অদিতি, দেবমাতা, সূত, ভগণ।

১৩—তাম্বুলগুণ, বীথ্যাঙ্গ, বিশ্ব, কশ্যপকামিনী, সামগাচার্য, প্রতিমুখাঙ্গ, অঘোষ, সত্য, অতিজগতী, বিশ্বদেব, মন্মথ, কাম, ত্রয়োদশ, মঞ্জুহাসিনী, মঞ্জুভাষিণী, রুচিরা, অতিজগতী।

১৪—যম, স্বরাট্, ধ্রুবতারকা, অন্বয়, অভিলয়, মৃগ, শক্র, লোক, ভুবন, মনু, ইন্দ্র, বিদ্যা, চতুর্দশ, পুরুষ, চতুর্দশী, যম, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-দেবতা, স্তবেষ্য, শর্করী, বসন্ততিলক।

১৫—সামিধেনী, কান্তাকলা, অহ, ঘস্র, দিন, পক্ষ, তিথি, ত্রিপঞ্চ, তৃণক, মালিনী, অতিশর্করী।

১৬—ইন্দুকলা, অম্বিকা, গৌরী, নাট্যচেষ্টার উপকারক, ভূপতি, চন্দ্রকলা, অষ্টি, নৃপ, ভূপ, কলা, শশীকলা, সোমকলা, মাতৃকা, কল্পিতমাতা, মাতা, ষোড়শী, অঙ্গধূপ, দান, উপাচার, বিদ্যাদেবী, সরস্বতী, নাড়ী।

১৭—সংস্কার, প্রাজাপত্যপশু, অত্যষ্টি, মন্দাক্রান্তা, সপ্তদশ।

১৮—দ্বীপ, বিদ্যা, পুরাণ, স্মৃতি, ধান্য, পীঠ, ধৃতি, পর্ব, উপদ্বীপ, ভারত, উপপুরাণ, গজেন্দ্রলতা।

১৯—দেববাদ্য, অতিধৃতি।

২০—অঙ্গুলি, রাবণনেত্র, রাবণকপোল, রাবণাক্ষি, রাবণকর, রাবণভ্রূ, রাবণভুজ, নখ, কৃতি, রাবণকর্ণ, উপসর্গ।

২১—উৎকৃতি, প্রকৃতি, স্বর্গ, মূর্ছনা, অনুস্মৃতি, সমিৎ, ত্রিসপ্ত।

২২—কৃতী, জাতি।

২৩—বিকৃতি।

২৪—ন্যায়গুণ, কেশব, গায়ত্রী, অর্হৎ, সিদ্ধ, জিন, তত্ত্ব, ভ, দণ্ড, সংস্কৃতি।

২৫—অতিকৃতি।

২৬—উৎকৃতি, বাক্যদোষ।

২৭—উড়ু, উদ, নক্ষত্র, ভ।

২৮—তত্ত্ব, উষ্ণিক্।

৩২—রদ, দন্ত, অনুষ্টুপ্।

৩৩—ত্রিদশ, সুর, অমর, দেব, ত্রয়স্ত্রিংশ, নভপতি, গগনপতি।

৪০—নরক, পঙ্ক্তি।

৪৩—ন্যায়।

৪৪—ত্রিষ্টুপ্।

৪৮—জগতী।

৪৯—তান, অনিল, বায়ু, উপপাতক, উপপাপ, মরুৎ, মারুত, পবন, মলয়।

৬৪—আভাস্বর, কলা।

১০০—ধার্তরাষ্ট্র, শতভিষক্তারকা, দূর্বাগ্রন্থি, পুরুষায়ু, রাবণাঙ্গুলি, অব্জদল, শক্রযজ্ঞ, অব্ধিযোজন, কুমুদদল, পদ্মদল, ব্রাহ্মণ, শতক্রতু, শতদ্রু।

১০০০—জাহ্নবীবক্ত্র, শেষশীর্ষ, অম্বুজচ্ছদ, রবিকর, বাণরাজের কর, বেদশাখা, ইন্দ্রদৃষ্টি, কার্তবীর্যার্জুনের কর, ভানুকিরণ, সূর্যরশ্মি, বোয়ালদংষ্ট্র, ইন্দ্রদৃক, ইন্দ্রাক্ষি।

ঙ. প্রতীকে দ্বাদশ মাস, বার ও নক্ষত্র

গাণিতিক সংখ্যার প্রতীকের মত দ্বাদশ মাসেরও প্রতীকী নাম প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যকে করেছে মাধুর্যমণ্ডিত। লিপিকরের পুষ্পিকাংশে কালাঙ্ক নির্দেশ এ প্রতীকের প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন—

মাস	প্রাচীন নাম
বৈশাখ	মাধব
জ্যেষ্ঠ	শুক্র
আষাঢ়	শুচি
শ্রাবণ	নভঃ
ভাদ্র	নভস্য
আশ্বিন	ঈশ
কার্ত্তিক	উর্য্য
অগ্রহায়ণ	সহঃ
পৌষ	অহস্য
মাঘ	তপ
ফাল্গুন	তপস্য
চৈত্র	মধু

যে যে মাসে যে যে নক্ষত্রে পূর্ণিমা হবে তার প্রতীকী নাম, যেমন

মাস	নক্ষত্র
বৈশাখ	বিশাখা
জ্যৈষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠা
আষাঢ়	পূর্বাষাঢ়া
শ্রাবণ	শ্রবণা
ভাদ্র	পূর্বভাদ্রপদ
আশ্বিন	অশ্বিনী
কার্ত্তিক	কৃত্তিকা
অগ্রহায়ণ	মৃগশিরা/মার্গশীর্ষ
পৌষ	পুষ্যা
মাঘ	মঘা
ফাল্গুন	উত্তর ফাল্গুনী
চৈত্র	চিত্রা

দিন	
রবিবার	আদিত্যবার
মঙ্গলবার	অঙ্গারকবার
বৃহস্পতিবার	গুরুবার
শুক্রবার	ভার্গববার
শনিবার	শনৈশ্চর

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠোদ্ধার পদ্ধতি

ক. পাণ্ডুলিপি পাঠ

আমাদের বর্তমান অস্তিত্ব স্বীকারে পূর্বপুরুষদের অবদান যেমন নিঃসন্দেহ তেমনি বর্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির গুরুত্বও অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। প্রাচীনযুগ আজকের মত যন্ত্রমুখর ছিল না বলে তখন কবি-প্রতিভার প্রকাশ হত গাছের বাকল, ভূর্জপত্র ইত্যাদিতে। আর তা লিখিত ও অনুলিপিকৃত হত হাতেই। তাই এর নাম পাণ্ডুলিপি বা পুথি। এই পাণ্ডুলিপিগুলি কিছুটা বিকৃতি (লিপিগত, ভাষাগত ও বানানগত) স্বীকার করে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন লিপিকরদের হাতে লিপিকৃত হতে হতে আমাদের সময় পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সক্ষম হচ্ছে না তার অস্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে আমাদের বিদ্বৎসমাজে। এর মুখ্য কারণ পাঠোদ্ধারের জটিলতা। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি যে অক্ষরে লেখা হয়েছে তা বর্তমান বাংলা লিপির অঙ্কুরাবস্থা। আজ আমাদের সংগ্রহে যে-সব বাংলা ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি রয়েছে তার সিংহভাগ বাংলা হরফে লেখা। কিছু কিছু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি দেবনাগরী (সংস্কৃত) অক্ষরে লেখা দেখা যায়। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত এই প্রাচীন বাংলালিপি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে করতে আধুনিক বাংলা বর্ণের আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন সময়ের এইসব পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন কবিগণ তাঁদের প্রতিভাপ্রসূত যে অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন তার কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যে, তবে অধিকাংশই রয়ে গেছে অজানার অন্ধকারে। এই রত্নরাজিকে অজানা থেকে জানার আলোকে প্রকাশ করা একান্তই বাঞ্ছনীয়। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে দেখা যাবে—প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য বিশ্বের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। প্রাচীন ভারতের প্রধান ভাষা ও সাহিত্য ছিল সংস্কৃত। তখনকার বিদগ্ধ ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষায়ই তাঁর বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিতেন। এই ভাষায় রচিত হয় নি—জ্ঞানের এমন কোনো দিক বা বিষয় নেই। বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র, শিল্প, সাহিত্য, চিকিৎসা, যুদ্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য,

ইতিহাস, রাজনীতি—কোন বিষয়েই এ ভাষার রচনা উপেক্ষণীয় নয়। কৌটিল্যের (চাণক্য) 'অর্থশাস্ত্র' বিশ্বরাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষভাবে অভিনন্দিত, তবে এ সবের অধিকাংশই আজও আবদ্ধ রয়েছে প্রাচীনকালের হাতে লেখা সেই পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায়। কিছু কিছু অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে আজ পর্যন্ত পাঠোদ্ধার-দূরূহ বেড়া ডিঙ্গিয়ে আধুনিক মুদ্রাযন্ত্রের অনুগ্রহে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পাতায় আপন স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মোট পাণ্ডুলিপির তুলনায় প্রকাশিত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা খুবই নগণ্য। সমস্ত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি যেদিন আত্মপ্রকাশ করতে পারবে সেদিন বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে দেখবে—বিশ্ব সাহিত্যে আজ যে ক'টি ভাষা ও সাহিত্য বিপুল ঋদ্ধির দাবীদার, তাদের তুলনায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য কোন অংশেই কম ঋদ্ধ নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে যা-কিছু রচিত হয়েছে তা সবই হয়েছে প্রাচীন যুগের হস্তলিখিত সেই পাণ্ডুলিপিতে। ছাপাখানা প্রবর্তনের পরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্পাদের হাতে নানা ধর্মগ্রন্থ, কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, স্মৃতি, তন্ত্র, জ্যোতিষ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি আমরা জানি না কত নাম না জানা কবির কাব্য, কত গূঢ়রহস্য, কত মূল্যবান বিষয় পাণ্ডুলিপির ধূলার স্তূপে আত্মগোপন করে আছে। পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার ব্যতীত এগুলি আমাদের কাছে থেকেও নেই, এগুলি মূল্যবান হয়েও মূল্যহীন। আমাদের বাংলাদেশের গ্রন্থাগারসমূহে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। সংগ্রহের পরিমাণও নিদেনপক্ষে কম নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়—বিভাগপূর্ব বাংলায় দুই একজনের নাম ছাড়া বিভাগোত্তর বাংলাদেশে কোন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে যে পণ্ডিতের অভাব তা নয়, তবে অভাব রয়েছে পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার চর্চার প্রয়াসের। সংস্কৃত ভাষা যেমন একটু কঠিন তেমনি জটিল তার পাণ্ডুলিপির লিখন পদ্ধতি, তাই স্বভাবতই সাধারণ পাঠকদের কাছে এক দুর্ভেদ্য কুহেলিকার সৃষ্টি করে রেখেছে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলি। তবে কোন জটিলতাই যে আর জটিল থাকে না—এর প্রমাণ আধুনিক বিশ্ব সব কিছুতেই রাখছে। পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেও এ সত্যের প্রমাণ দেখব বলে আমরা আশাবাদী। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক অনুশীলন এবং তার সুবন্দোবস্ত করা। আমাদের দেশে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির তিনভাগের দুভাগই সংস্কৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রায় চল্লিশ হাজার পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিশ হাজার সংস্কৃত, দশ হাজার বাংলা এবং বাকী দশ হাজার আরবী, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দি। এমনি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, যেমন—কুমিল্লার রামলালা, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ঢাকার জাতীয় জাদুঘর, বাংলা একাডেমী ইত্যাদি জায়গায় পাণ্ডুলিপির প্রচুর সংগ্রহ রয়েছে। কিন্তু এগুলি নিয়ে গবেষণা করা, সঠিকভাবে এদের পাঠোদ্ধার করার মত লোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দুই একজন ব্যতীত অন্য কোথাও নেই বললেই চলে। কিন্তু আধুনিক যুগের অর্থাৎ যে সভ্যতার যুগে মানুষ তার অতীত ইতিহাসকে জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করছে

এবং তারই সন্ধান করতে গিয়ে হাজার হাজার ফুট মাটির গভীরে খনন করে অনুসন্ধান চালাচ্ছে, সেই যুগের বৈশিষ্ট্য তো এটা নয়। অবশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাংলা পাণ্ডুলিপির স্বল্পতা সত্ত্বেও) বাংলা পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা এবং পঠন-পাঠনের বেশ অনুশীলন শুরু হয়েছে। পাঠসমালোচনা-বিদ্যার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাংলা সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠসমালোচনা বিষয়টি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির এত বিশালতা সত্ত্বেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কৃত বিভাগগুলি এ যাবৎ ছিল উদাসীন। অথচ সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার ব্যাপক স্বার্থে পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার এবং এর গবেষণা কার্যে সহযোগিতা কল্পে এক বিরাট ভূমিকা থাকা উচিত ছিল সংস্কৃত বিভাগগুলির। যাই হোক, অবলুপ্তির পথে অগ্রসরমান আমাদের এই সঞ্চিত সম্পদের সঠিক মর্যাদাদানে সংস্কৃত বিভাগগুলি বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশা পোষণ করতে পারি। এখানে উল্লেখ্য, সম্প্রতি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাঠ বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে এম. এ. শেষ বর্ষের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

খ. পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার পদ্ধতি (আক্ষরিক জ্ঞান)

অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিই বাংলা হরফে লেখা। অবশ্য কিছু কিছু দেবনাগরী অক্ষরেও লেখা হয়েছে। যে বাংলা হরফ বা লিপিতে পাণ্ডুলিপিগুলি লিখিত হয়েছে তা প্রাচীন লিপি। প্রাচীন বাংলা লিপি ও আধুনিক বাংলা লিপির মধ্যে রয়েছে এক বিরাট কালিক ব্যবধান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লিপিকৃত হয়েছে এই পাণ্ডুলিপিগুলি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লিপি-বৈশিষ্ট্যেও হয়েছে পরিবর্তন। তাই এক শতাব্দীর পাণ্ডুলিপির সঙ্গে অন্য শতাব্দীর পাণ্ডুলিপির বেশ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ কালের বিবর্তনের সঙ্গে বিবর্তিত হয় মানুষের রুচি ও হস্তলিখন-কৌশলের। মানুষের চিন্তা ধারারও পরিবর্তন ঘটে সময়ের পরিবর্তনে। ফলত এইসব পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে তার কাজে-কর্মেও। লিপির এই বিবর্তনহেতু আধুনিক বর্ণমালার অভিধানের মত পাণ্ডুলিপির বর্ণমালার একটি অভিধান তৈরী করা কঠিন ব্যাপার। কোন ভাষা শিখতে হলে প্রথমেই পরিচিত হতে হয় তার বর্ণমালার সঙ্গে। পাণ্ডুলিপি শিখতে হলেও প্রথমে তার থাকতে হবে বর্ণমালার পরিচয় জ্ঞান। এই মর্মে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে প্রাচীনতম যে-যে শতাব্দীর সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় সেই থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতি শতাব্দীর একটি করে বর্ণমালার ছক নিম্নে প্রদর্শিত হল। এর দ্বারা পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধারে আগ্রহী পাঠকদের পাণ্ডুলিপির সঙ্গে সুলভ-পরিচয় ঘটবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে প্রাচীন যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা হলো পঞ্চদশ শতাব্দীর, তাই পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই আমরা বর্ণমালার ছক শুরু করছি।

বর্ণমালার ছক

(পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত)

স্বরবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণ

পঞ্চদশ শতাব্দী	ষোড়শ শতাব্দী	সপ্তদশ শতাব্দী	অষ্টাদশ শতাব্দী	ঊনবিংশ শতাব্দী	আধুনিক বাংলা লিপি
ক	ক ক	ক	ক	ক	ক
খ	খ	খ	খ খ	খ	খ
গ	গ	গ	গ	গ	গ
ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ	ঘ
ঙ	ঙ	ঙ	ঙ	ঙ	ঙ
চ	চ	চ	চ	চ	চ
ছ	ছ	ছ	ছ	ছ	ছ
জ	জ জ	জ	জ	জ	জ
ঝ	ঝ	ঝ	ঝ	ঝ	ঝ
ঞ	ঞ	ঞ	ঞ	ঞ	ঞ
ট	ট	ট	ট ট	ট	ট
ঠ	ঠ	ঠ ঠ	ঠ	ঠ	ঠ
ড	ড	ড	ড	ড	ড
ঢ	ঢ	ঢ	ঢ	ঢ	ঢ
ণ	ণ	ণ	ণ	ণ	ণ
ত	ত	ত	ত	ত	ত
থ	থ	থ	থ	থ	থ

চিত্র

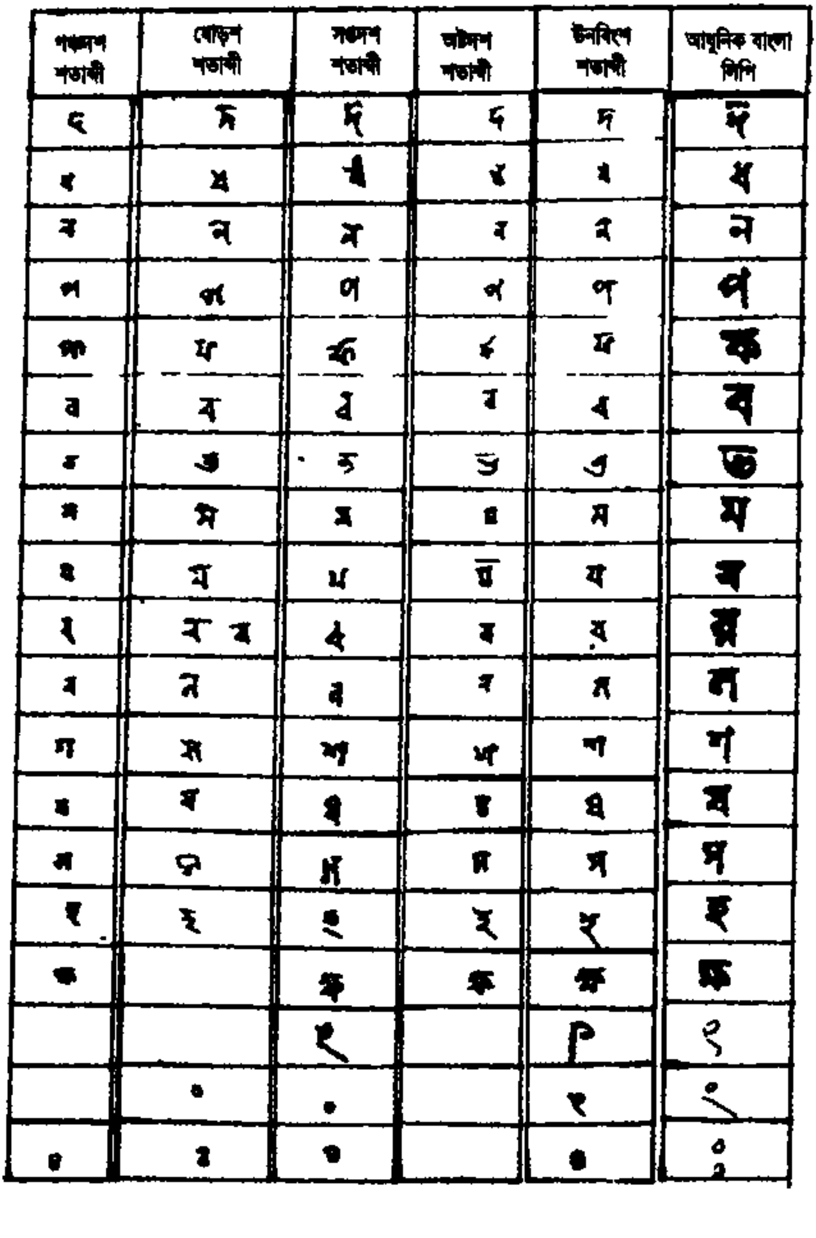
পঞ্চদশ শতাব্দী
ষোড়শ শতাব্দী
সপ্তদশ শতাব্দী
অষ্টাদশ শতাব্দী
ঊনবিংশ শতাব্দী
আধুনিক বাংলা লিপি

লিপির বিবর্তন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দ্বাদশ শতাব্দীতেই বাংলালিপি মোটামুটি একটা পূর্ণ আকার ধারণ করেছে। এরপরে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অন্ধকার যুগ। এই অন্ধকার যুগের অবসান অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা লিপির অধিকাংশ বর্ণই সম্পূর্ণ রূপে বর্তমান আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলা লিপির যে কাঠামো তৈরী হয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তার কোন কোন বর্ণ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা বর্ণের আকার ধারণ করেছে। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা অনেক সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে (বাংলা লিপিতে লিখিত) এর নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং সর্বশেষে উনবিংশ শতাব্দীতে এসে সবক'টি বর্ণই ধারণ করেছে আধুনিক বর্ণমালার আকৃতি। পূর্বোক্ত শতাব্দী অনুযায়ী ছক তার প্রমাণ রাখে। কিন্তু এই ক্রম বাংলা লিপিতে লিখিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপিতে এই ক্রম রক্ষিত হয় নি। ফলে দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলা লিপির যে আকৃতি তৈরি হয়েছে, দেখা গেছে ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত বাংলা পাণ্ডুলিপির বর্ণ তার থেকেও অপরিপক্ক। এ কারণে পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির (বাংলা লিপিতে লিখিত) পাঠ যতটা সহজ হতে পারে অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পাণ্ডুলিপির পাঠ তার চেয়ে অধিক জটিল হতে পারে। যেমন—

ক. 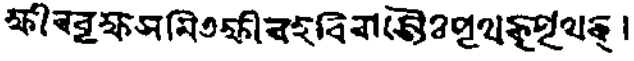

(ক্ষীরবৃক্ষসমিৎক্ষীরহবিরাজ্যৈঃ পৃথক্ পৃথক্) ঢা. বি. পা. সং ৪৬০৮, পৃ. ৮১ ক (১৪৩৯ খ্রি.)।

খ.

(প্রিথিবিতে জাইমু তুমার সংঙ্গতি) ঢা. বি. পা. সং, ২৮৮২, পৃ. ৫০খ (১৭৯২ খ্রি.)।

গ. 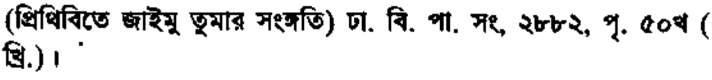

(তোমার হাতে সপীলুম য়াপনার প্রাণ) ঢা. বি. আ. ক. সং ৫৩১ পৃ. ৯২ (১৮৫৫ খ্রি.)।

এর পশ্চাতে প্রধান কারণ সম্ভবত শিক্ষা এবং অশিক্ষা। যাঁরা বাংলা লিপিতে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি লিখেছেন তাঁরা হয়ত সুপণ্ডিত ছিলেন। এবং যাঁরা বাংলা পাণ্ডুলিপি লিখেছেন বা অনুলিপি করেছেন তাঁদের ভিতর অনেকেই হয়ত তেমন বিদ্বান ছিলেন না। ফলে লিপির পূর্বের পূর্ণতা ব্যক্তি বিশেষে হয়েছে অপূর্ণতার শিকার। পরবর্তী সময়ে লিপিকৃত

পাণ্ডুলিপির এই বিভ্রান্তি শুধু বাংলা-পাণ্ডুলিপিতেই নয়, অনেক সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতেও পরিলক্ষিত হয় তবে তার সংখ্যা খুবই স্বল্প। এসব কারণেই সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন লিখনরীতির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাই কেবলমাত্র প্রতি শতাব্দীর একটি বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হলেই পাণ্ডুলিপির বর্ণপরিচয়ের সমাপ্তি ঘটবে না। অনেক সময় দেখা যায় একই শতাব্দীতে একই বর্ণ লিখিত হয়েছে বিভিন্ন আকৃতিতে। আবার এক শতাব্দীতে যে বর্ণ যে আকৃতিতে লিখিত হয়েছে অন্য শতাব্দীতে সেই একই আকৃতিতে হয়ত লিখিত হয়েছে অন্য বর্ণ। অতএব পাণ্ডুলিপির সঠিক পাঠোদ্ধারের জন্য সামগ্রিক জ্ঞান আবশ্যক। নিম্নে সংস্কৃত ও বাংলা পাণ্ডুলিপিতে একই বর্ণের যে সব বিভিন্ন রূপ বা আকৃতি সাধারণত দৃষ্ট হয় সেগুলির কিছু নিদর্শন প্রদর্শিত হল—

অ

১. 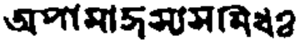

(অপামাঙ্গস্য সমিধঃ) ঢা. বি. পা. সং ৪৬০৮, পৃ. ৮ক (১৪৩৯ খ্রি.)।

২. 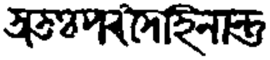

(অতঃপরং দেহিনাস্তু ...) ঢা. বি. পা. সং ৪৯৫, পৃ. ২৪৪খ (১৪৭১ খ্রি.)।

৩. 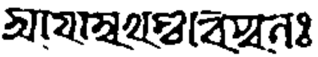

(অয়োমুখশ্চবিপুলঃ, ...) ঢা. বি. পা. সং ১৪ পৃ. ১৫২খ (১৫০৩ খ্রি.)।

৪.

(অহন্তে কথয়িষ্যামি চরিতং তস্যধীমতঃ) ঢা. বি. পা. সং ৩২৩, পৃ. ৪৭খ (১৬৬৬ খ্রি.)।

৫.

(কুমারে কহিলা আদি অন্ত জথ কথা) ঢা. বি. পা. সং ২৩৭, পৃ. ৯৩১।

৬. 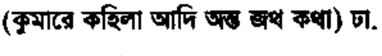

(অথ নামকরণং) রা. পা. সং. ৫৮১০, পৃ. ১৯ক

৭.

(পরিছে বিবিধ অলংকার) ঢা. বি. পা. সং. ৩৫৩. পৃ. ২৪খ।

৮.

(অম্বে ২ যুদ্ধ হইল মিলা) ঢা. বি. আ. সং. ৩৬, পৃ. ৪১ক।

৯.

(ব্রহ্মা আদি মুনি জত অমর মণ্ডল) ঢা. বি. পা. সং. ৫৮৮৮, পৃ. ৯

১০.

(অধিবাস হেতু আসিয়াছে দ্বিজগণ) ঢা. বি. পা. সং. ৫৮৮৮, পৃ. ৯।

১১.

(অনেনাগ্নেঃ পশ্চিমাতা দক্ষিনান্তা) রা. পা. সং ১২১৬, পৃ. ১৭ক।

আ

১. 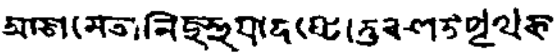

(আজামেতানি জুহুয়াদষ্টোত্তর-শতং পৃথক) ঢা. বি. পা. সং ৪৬০৮, পৃ. ৮১ ক (১৪৩৯ খ্রি.)।

২. 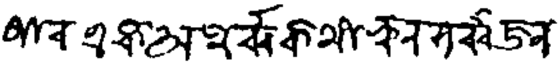

(আর এক অপূর্ব কথা সুন সর্ব্বজন) ঢা. বি. পা. সং. ৩০০৯. পৃ. ৩ (১৭৫৯ খ্রি.)।

৩. 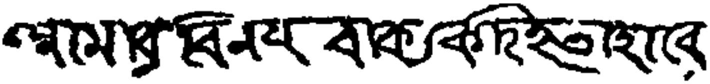

(আমার বিনয় বাক্য কহিহ তাহারে)—ঢা. বি. পা. সং ৬০৫৩, পৃ. ৩৪ খ

৪. 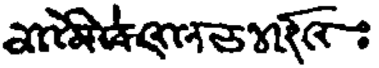

(আমিরে বোলন্ত জাইবে) ঢা. বি. পা. সং ৩৫৩, পৃ. ২৪খ।

৫.

(বুলিলেন্ত কহিসুন রছুল আল্লার) ঢা. বি. পা. সং. ২১৫, পৃ. ৪৪৫খ।

৬.

(তব আজ্ঞায় চিরদিন করিনু বসতি) ঢা. বি. পা. সং, ৫৮৮৮, পৃ. ৯।

৭.

(আরোজথ রাজা সব হই একত্তর) ঢা. বি. পা. সং, ৩৬৭, পৃ. ৪১খ।

৮. 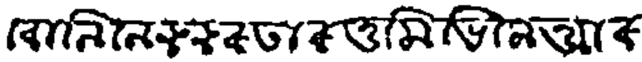

(বোলিলেক কর তার তুমি ভিনে আর) ঢা. বি. পা. সং. ২১৫, পৃ. ৪৪৫খ।

৯. 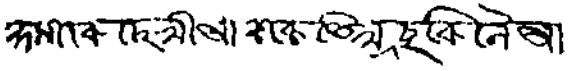

(কুমার দেখীআ করে তিপ্ন ছুরি লৈআ) ঢা. বি. পা. সং, ২৩৭, পৃ. ৯৩।

১০. 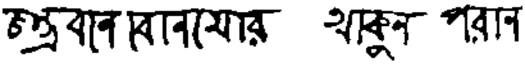

(চন্দ্রবলি বিনে মোর আকুল পরান) বা. এ. পা., সং. ২৭৬, পৃ. ৯।

১১. 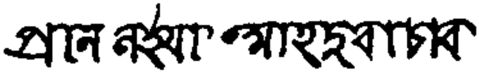

(প্রাণ লইয়া আহ দুরাচার) ঢা. বি. পা. সং.৩২৭৪, পৃ. ৪ক (ঊনবিংশ শতাব্দী)।

ই

১.

(ইত্যুজ্ঞাবিসসর্জ্জেনং) ঢা. বি. পা. সং. ৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ (১৪৭১ খ্রি.)।

২.

(ইতি খিলেষু হরিবংশে যযাতি-চরিতং) ঢা. বি. পা. সং. ১৪, পৃ. ১৫২, (১৫০৩ খ্রি.)।

৩.

(ইতিনিক্রান্তাঃ ...) ঢা. বি. পা. সং ৪৫১৮, পৃ. ৯৩খ (১৫৭২ খ্রি.)।

৪. 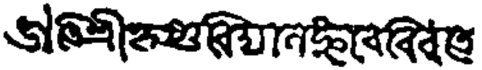

(ইতি শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার বিরতে ...) ঢা. বি. পা. সং. ৩৩, পৃ. ১২৯ (১৮৪৯ খ্রি.)।

৫.

(ইত্যেবমুক্তোমুনিনা রামঃ) ঢা. বি. পা. সং ৩২৩, পৃ. ৬৯ খ (১৬৬৬ খ্রি.)

৬. 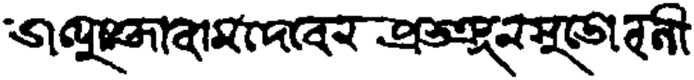

(ইত্যুক্তো রামদেবেন প্রভঞ্জন-সুতোবলী) ঢা. বি. পা. সং. ৩২৩, পৃ. ৯৩ (১৬৬৬ খ্রি.)।

৭.

(ইতিসঙ্কল্প্য প্রায়শ্চিত্ত) রা. পা. সং. ১২১৬ পৃ. ১৭ক

৮.

(এই মতে রছুলে মাগীলা প্রভু স্থানে) ঢা. বি. পা. সং ২১৫, (পৃ. ৪৫৫ক)।

৯.

(পাইয়া মানুষ জন্ম:) (ঢা. বি. পা. সং. ৬৫৮৩, পৃ. ৪খ (১৮৫৯ খ্রি.)

ঈ

১. 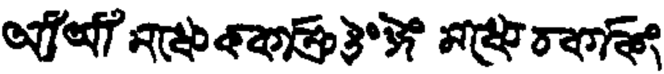

(আঁ আঁ মধ্যে ক বর্গন্ত ইং ঈং মধ্যে চ বর্গকং) ঢা. বি. পা. সং. ৮৫, পৃ. ৫ক।

২. 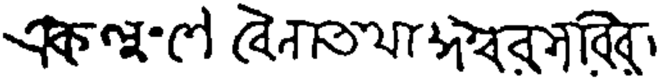

(এক অংশে রৈলা তথা ঈশ্বর সরির) ঢা. বি. পা. সং. ৬০৫৩ পৃ. ৩ক।

৩.

(ঈশানে মীন লগ্নেস্যাৎ) রা, পা. সং ৩২১৭, পৃ. ১।

উ/ঊ

১. 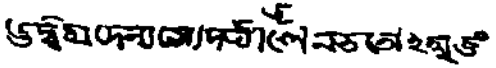

(উৰ্দ্ধচ্যদেন্যস্যোদর্ঘা (উ) শেনতভোহস্মুজং) ঢা. বি. পা. সং. ৪৬০৮, পৃ. ৮১ক (১৪৩৯ খ্রী:)।

২.

(ইতিশারদা-তিলকে ঊনবিংশঃ পটলঃ) ঢা. বি. পা. সং ৪৬০৮, পৃ. ৯৯খ

৩. 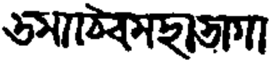

(উমা চৈব মহাভাগ ...) ঢা. বি. পা. সং ৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক (১৪৭১ খ্রি.)।

৪.

(ঊৰ্দ্ধন্তুষোড়শাদ্বর্ষা ...) ঐ ২৪৪ক।

৫.

(বৈশম্পায়ন উবাচ) ঢা. বি. পা. সং ১৪, পৃ. ১৫২ খ, (১৫০৩ খ্রি.)।

৬.

(উ ঊ মধ্যে ট বর্গস্তু এং ঐং মধ্যে ত বর্গকং) ঢা. বি. পা. সং ৮৫, পৃ. ৫ ক।

৭. 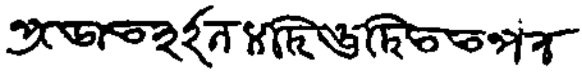

(প্রভাত হইল জদি উদিত তপন) ঢা. বি. পা. সং. ২৩৭, পৃ. ৯২

৮.

(ঊনবিংশে প্রভুর মুখ সংঘর্ষণ) ঢা. বি. পা. সং-২৯৯১, পৃ. ১৪১ ক।

৯. 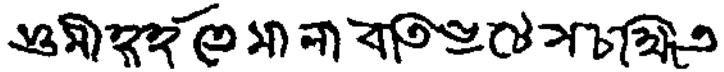

(ভুমী হইতে মালাবতি উটে সচম্বিত) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১ক।

১০. 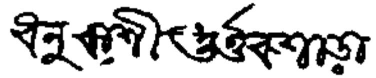

(ধনুবাশী উত্তবশাড়া) বা. পা. সং—৩২৪৭, পৃ. ৩ক।

১১.

(উজ্জল পুরানমতঃ) ঢা. বি. পা. সং—৩৬৭০, পৃ ৩ক।

১২.

(উত্তবিল সন্নিকটে দেবনারায়ণ) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৮৮, পৃ. ৯।

১৩. 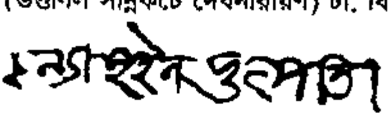

(কন্যা হইল উৎপতি) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৮৮, পৃ. ৯।

১৪.

(উত্থায়তৎপুরঃ স্থিত্বা কৃতা ...) ঢা. বি. পা. সং—৩২৩, পৃ. ৯৩।

১৫. 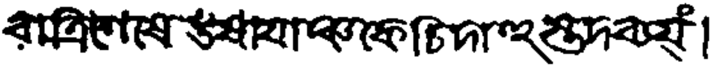

(রাত্রিশেষে উষায়াঞ্চকেচিদাহুস্তদব্যায়ং) ঢা. বি. পা. সং—২৩৯৭, পৃ. ৭৫খ।

১৬. 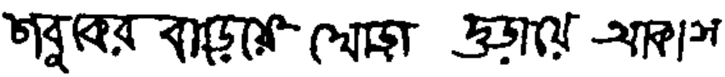

(চাবুকের বাড়িয়ে ঘোড়া উড়ায়ে আকাস) বা. এ. পা. সং—২৭৬, ১০।

১৭. 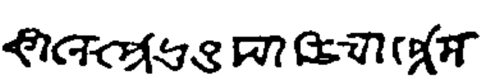

(... কালে প্রেভু উঘাড়িয়া প্রেম) ঢা. বি. পা. সং—৬৩৫২, পৃ. ৯খ।

১৮.

(সেহী হৈতে মন মোর উদাশ হইল) ঢা. বি. পা. সং—৬৩৭৩, পৃ. ১৪২খ।

১৯.

(গৌড়িআ উড়িআ জত প্রভুর ভক্তগণ) ঢা. বি. পা. সং—২৯৯১, পৃ. ৩ক।

২০. 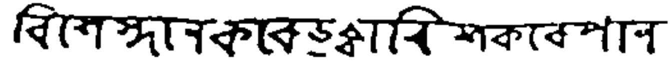

(বিশে স্নান করে উঝা বিশ করে পান) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ১১৬ক।

২১. 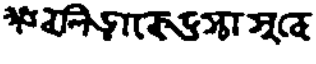

(কৃষ্ণবলি ডাকে উশ্চাস্বরে) ঢা. বি. পা. সং—১১৬৮. পৃ. ৭ক।

ঋ

১. 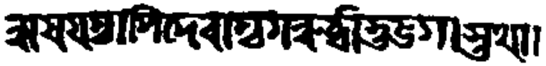

(ঋষয়শ্চাপি দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বাভুজগাস্তথা) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ (১৪৩৯ খ্রি.)।

২ 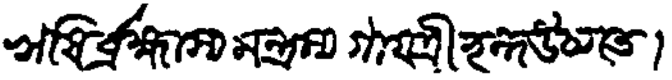

(ঋষির্ব্রক্ষাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রীছন্দ উচ্যতে) ঢা. বি. পা. সং—৮৫, পৃ—৫ক।

৩.

(যাত্রার্ক ঋষমেষছিদ্রে ...) রা. পা. সং—৩২৩১, পৃ. ৭৮খ।

৪.

(ঋক্ষঃ পর্ব্বত ভেস্যাড্ডল্লুকে ...) ঢা. বি. পা. সং—২৩৯৭, পৃ. ৭৫খ।

৫. 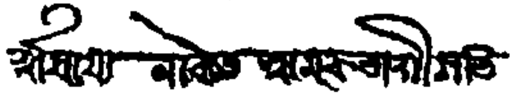

(ঋষয়োনবৈতে ত্বমেবত ভাশীর্সতি ...) ঢা. বি. পা. সং—২৯৫৫২, পৃ. ৩৪ক।

৬.

(ইতিঋতুনিরূপণং) রা. পা. সং-৪৯৪৪ পৃ. ২০

৭.

(... দেহ যুব্যাতী ঋতুমতি ...) ঐ, পৃ. ১০ক।

৮.

(ঋক্ষৈকমন্দির গতৌ ...) বা. পা. সং-৩২০৯

৯.

(ঋষানাগবলায়াং ...) ঢা. বি. পা. সং—২৩৯৭ পৃ. ৭৫

১০.

(... মাসাশ্চনৈঋতে) রা. পা. সং—২০২, পৃ. ২৪খ।

১১.

(ঋতুঃ স্বভাবিক স্ত্রীণাং ...) রা. পা. সং—২৪৫২।

১২.

(... দেবঋতুস্ত্রীনাং রাত্রয়ঃ ষোড়শঃ স্মৃতাঃ) রা. পা. সং—৩০২, পৃ. ১৫ক

১৩.

(ঋষিগায়ত্রী ছন্দোগ্নির্দ্দেবতা) রা. পা. সং-১২১৬, পৃ. ১৭ক

১৪.

(ঋষভঃ পর্বতশ্চৈব শ্রীমানৃষভসংস্থিতঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫ ২খ।

১৫.

(দেবান ঋষীন পিতৃশ্চৈব) রা. পা. সং—১১০৯, পৃ. ১১ক।

১৬. 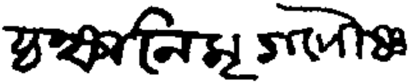

(... ঋক্ষানিমৃগপৌষ্ক ...) রা. পা. সং—২০২, পৃ. ১০ক

এ/ঐ

১.

(এবং পূজাদিভিঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৯৯খ

২. 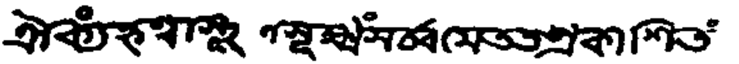

(ঐক্যংকৃত্বাস্থুল সূক্ষ্মং সর্ব্বমেতৎ প্রকাশিতং) রা. পা. সং—১১০৯, পৃ. ১১ক

৩.

(ঐসদে না মানে রুগি নিকেট মরন) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৩খ।

ও/ঔ

১.

(ও ঔ মধ্যে প বর্গন্ত ...) ঢা. বি. পা. সং—৮৫, পৃ. ৫ক

ক

১.

(খেটং বাণঞ্চ কার্মুকম্) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৯৯ (১৪৩৯ খ্রি.)।

২.

(রুদ্রপিনাকিনম্ ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ (১৪৭১ খ্রি.)।

৩.

(নক্ষত্রেপুংনপুংসকং) ঢা. বি. পা. সং—২৩৯৭, পৃ. ৭৫খ (১৪৯৯ খ্রি.)।

৪.

(পঞ্চনং কোষকারাণাং ...) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২খ (১৫০৩ খ্রি.)।

৫.

(করিলা সত্যের দোয়া যুগীর বচনে) ঢা. বি. পা. সং—৬৭, পৃ. ২খ (১৭৬৫ খ্রি.)।

৬. 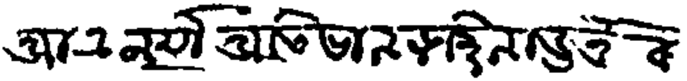

(আএ নৃর্প অতিভাল কহিলা উত্তর) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫ খ।

৭. 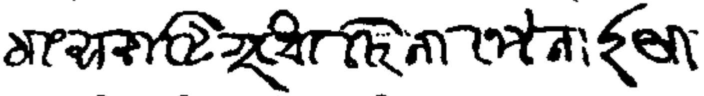

(মাংস কাটি গৃধো দিলা পেলাইআ) ঢা. বি. পা. সং—২৩৭, পৃ. ৯২ক।

৮.

(চন্দ্র সুদ্ধি কথনং ...) রা. পা. সং—৩২৪৭, পৃ. ৩খ।

৯.

(দেবকন্যা নাগ কন্যা সবসারি ২) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৮৮, পৃ. ৯।

১০.

(তে কারণে দেখীলাম ত্রিজগত পতি) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১ক।

১১. 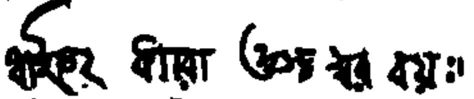

(ধাইতে ২ কারো উচ্চস্বর বয়) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৭খ।

১২.

(কান্দিতে লাগিল মৃগ আহিড় ভিতর) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১০ক।

১৩.

(কদাপী হরিস গর্ব মনে না করিবা) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৯৯।

খ

১.

(চক্রযুগ্মাৎ সমালিখেৎ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১খ (১৪৩৯ খ্রি.)।

২.

(যাতি দেবো যথা সুখম্) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক (১৪৭১ খ্রি.)।

৩.

(কৃষ্ণ মুখে তব গুণ য়নেক সুন্যাছি) ঢা. বি. পা. সং—৫৯৯৩, পৃ. ৪৯ খ।

গ

১. 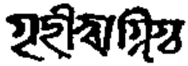

(গৃহীত্বাগ্নিশ্চ ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ (১৪৭১ খ্রি.)।

২. 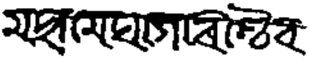

(মহামেঘ গিরিশ্চৈব ...) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২খ (১৫০৩ খ্রি.)।

৩.

(আগে পাছে সখী গণ ...) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১ক।

ঘ

১. 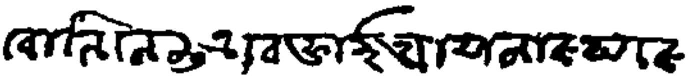

(বোলিলেন্ত এবে জাই আপনার ঘরে) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫খ।

২.

(ক্রমেণ ঘটস্থাপনাদিতবতাং) ঢা. বি. পা. সং—৩৩, পৃ. ২৩ক।

৩. 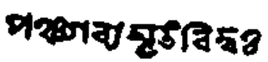

(পঞ্চগব্যঘৃতং বিদুঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক।

৪.

(শুভ্রপাণ্ডুর মেঘাভঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২খ।

৫. 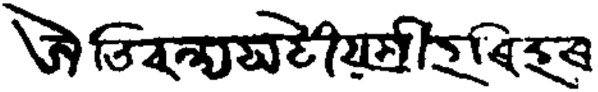

(ইতি বন্দ্যঘটীয় শ্রীহরিহর ...) রা. পা. সং-১২১৬, পৃ. ১৭খ।

৬.

(ঘর হোন্তে বাহির হইল) ঢা. বি. আ. সং—৩৫৩।

৭. 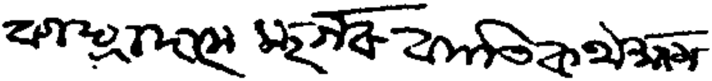

(ব্যাঘ্রদেসে মৃর্গর বসতি কথৰ্ক্ষণ) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৭২।

চ

১. 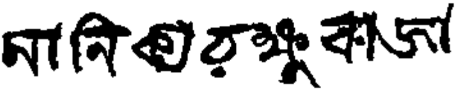

(... মানিক্য চক্ষু রাজা ...) ঢা. বি. আ. সং—২৯৫, পৃ. ২৭।

২.

(প্রেম ভাবি সেবামাত্র য়াচারি রহিবা) ঢা. বি. পা. সং—৫৩১, পৃ. ৯১।

৩.

(চামরেচাপি বায়ুশ্চ ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ।

৪.

(চন্দ্র দুই খণ্ড করি দেখাইতে সভার) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫খ।

৫.

(প্রেম ভক্তি পাবে তবে কৃষ্ণের চরণে) ঢা. বি. পা. সং—৫৮২৩, পৃ. ১৮ক।

৬.

(কিমতে নিবারিব চিত্ত কহো) বা.এ. পা. সং ২৭৬, পৃ. ১৩।

ছ

১.

(ছত্রপ্পপাণ্ডবং সোমস্তস্য ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক।

২. 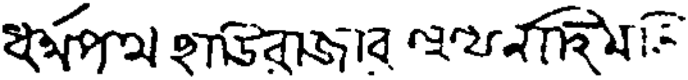

(ধর্ম্মপথ ছাড়ি রাজার অন্য নাহি মতি) ঢা. বি. পা. সং—৬০৫৩, পৃ. ৩খ।

৩. 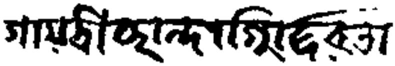

(গায়ত্রী ছন্দোগ্নির্দ্দেবতা ...) রা. পা. সং-১২১৬, পৃ. ১৭ক।

৪.

(এতকাল দিয়াছিলে ছিল জল ...) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৮৮, পৃ. ১০।

৫.

(কহিআ আছন্তুতারে) ঢা. বি. আ. সং—৩৫৩, পৃ ২৩খ।

জ

১.

(পীড়া তস্য ন জায়তে) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১।

২.

(বিজয়ো নাম রুদ্ধস্য যাতি) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬

৩.

(গুরু উপদেসে আক্ষি জানি সব) ঢা. বি. আ. সং-৩৫৩

৪.

(শৈস্কাকালে চলে জথা চেদি নরপতি) ঢা. বি. পা. সং—৬৪০৫, পৃ. ৯৬।

৫.

(যদি জীব ভানু শুক্রোগঃ) রা. পা. সং—৩২০৯, পৃ. ৩১খ।

৬. 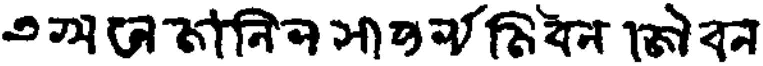

(তখনে জানিল সার্ফর্ল্য জিবন জৌবন) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১ক।

৭.

(কর জোড় প্রণাম) রা. পা. সং-৩২০৯, পৃ. ৩১খ।

৮.

(জানিল দৈবকি সেই মনে হেন ভয়ে) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১ক।

৯.

(জিব্রাইলে এক ছেল ধরি নিজ করে) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫ খ।

১০. 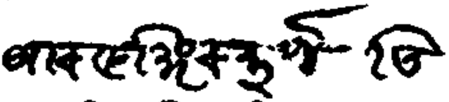

(আর জঙ্গির নৃর্পতি) ঢা. বি. আ. সং—৩৫৭, পৃ. ৪২খ।

১১.

(জাতীফলে নরশ্রেষ্ঠে ...) ঢা. বি. পা. সং—২৩৯৭, পৃ. ১২ক।

১২. 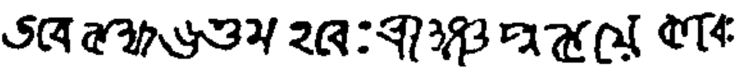

(তবে জন্ম উত্তম হবে : শ্রীকৃষ্ণ পুজয়ে জবেঃ)ঢা. বি. পা. সং—৬০১৮।

১৩. 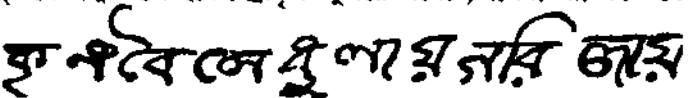

(কৃষ্ণ বৈলে ধুলায় গরি জায়) ব্যক্তিগত সংগ্রহ, পিরোজপুর।

১৪.

(জর্ন্মঃ সম্পদঃ ...) রা. পা. সং-৩২৪৭, পৃ. ৩খ

১৫.

(জাহার চরিত্রে সব লোক বস হয়) ঢা. বি. পা. সং—৫৬৭৫, পৃ. ৪ক।

১৬.

(জটায়ে তুলিয়া বান্দে নাগ উদয় কাল) ঢা. বি. পা. সাং—২৩৭, পৃ. ৯৩।

১৭.

(পশ্চাতে জতেক লোক কত সক্তি ধরে) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১০ক।

ঝ

১.

(উঝ্যল প্রদিপ তুক্ষি জগতের ভোগ) ঢা. বি., পা. সং—২৯৯, পৃ. ২৫খ।

২. 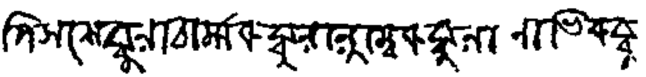

(পিসশে ঝুলা চর্ম্মের ঝুলা লুম্বের ঝুলা নাভির ঝুলা ...) রা. পা. সং—১১০৮, পৃ. ১।

৩. 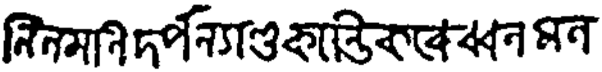

(নিলমণিদর্পণ গণ্ড কান্তি করে ঝলমল) ঢা. বি. পা. সং—৬১৮২, পৃ. ১৪৯ক।

৪.

(কত চন্দ্র জিনি মুখ উঝল হইব :) ঢা. বি. পা. সং—৫৯৩, পৃ. ৪ক।

৫. 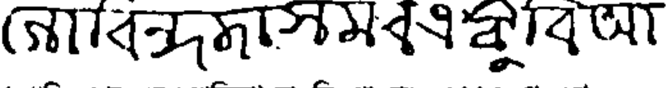

(গোবিন্দ দাস মরএ ঝুরিআ) ঢা. বি. পা. সং—৬১২৫, পৃ. ৩খ।

৬.

(মধুকরে করএ ঝঙ্কার) ঢা. বি. পা. সং—৬৬১২, পৃ. ৬ক।

৭. 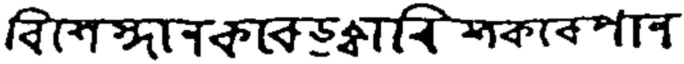

(বিশে স্নান করে উঝা বিশ করে পান) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ১১৬ক।

৮.

(মেঘেতে বিজুলি জেন করে ঝলমল) ঢা. বি. পা. সং—৪৬৬৭, পৃ. ১১খ।

৯.

(বৃস সাজাইয়া মরে দেও ঝাটে করি) ঢা. বি. পা. সং—৫৭১৭, পৃ. ১।

১০. 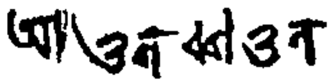

(আওল ঝাওল ...) ঢা. বি. পা. সং—২৯৫২৭

১১.

(তোহ্মারে বুলি ওঝা) ঢা. বি. পা. সং—৫৭১৭, পৃ. ১।

১২. 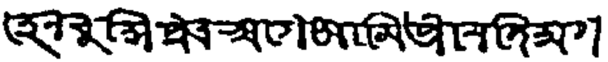

(হেন বুঝি পুত্র সুগে আমি প্রাণ দিমু) ঢা. বি. পা. সং—৬০২১, পৃ. ২৮৫।

ট

১.

(লিখেৎ টাস্তগতং সসাধ্যং..) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১খ।

২.

(কোটর হইতে ধরে পেচকের বশং) ঢা. বি. পা. সং—অপরিচায়িত, পৃ. ১।

৩.

(কুটী কষ্টে নহিবে নিস্তার) ঢা. বি. পা. সং—৬৫৮৩, পৃ. ৪খ।

৪. 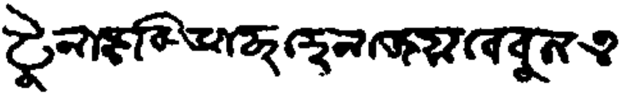

(টুনা করি আছ হেন জেসবে বুলএ) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫খ।

৫. 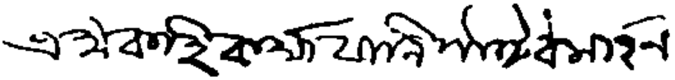

(এথ কহি কন্যা য়ানি পাটে বসাইল) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৯২।

ঠ

১. 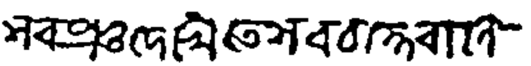

(..সব প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরানি) ঢা. বি. পা. সং—৬১৮২, পৃ. ১৯০ খ।

২. 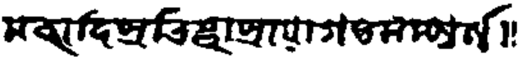

(মঠাদি প্রতিষ্ঠা প্রয়োগঃ সম্পূর্ণ) রা. পা. সং-১২১৬, পৃ. ১৭খ।

৩.

(সরূপ করিআ বোল আমার ঠাই) ঢা. বি. পা. সং—২৯, পৃ. ১৭৫।

৪. 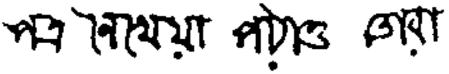

(পত্র লিখিয়া পঠাও তোরা) ঢা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৪ক।

৫. 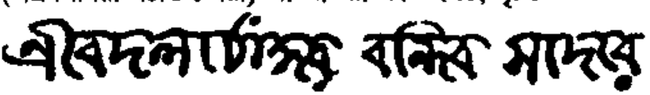

(শ্রীবদনা ঠাকুর বন্দিব সাদরে) ঢা. বি. পা. সং—৫৬৭৫, পৃ. ৪ক।

৬.

(পানি খাইতে মাগীলেন্ত খদিজার ঠাই) ঢা. আ. সং—৩৬৭, পৃ. ৫২।

ড

১.

(ডুবিলা সংসার মদেঃ) ঢা. বি. পা. সং—৬৫৮৩, পৃ. ২ক।

ঢ

১. 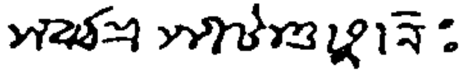

(সর্ব্বত্র পীটাও ঢুলি:) ঢা. বি. পা. সং—৬৫৮৩, পৃ. ৮খ।

ণ

১.

(কান্তিদং শুভদং স্ত্রীনাং ভূত ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক।

২.

(তস্যদক্ষিণতো ভাতি ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক।

৩.

(প্রাণ আকুল ভৈল বাঁসীর নাদে) ঢা. বি. পা. সং—২৯, পৃ. ১৭৪।

ত

১.

(সম্পাত সাধিতম্) ঢা. বি. পা. সাং—৪৬০৮, পৃ. ৯৯খ।

২.

(প্রথমে তোহ্মারে কহি) ঢা. বি. আ. সং—৩৫০ পৃ. ২৪খ।

৩.

(যবনাধিপতের্শ্বস্তর্কে তত) রা. পা. সং—৩২৩১, পৃ. ৪৩ক।

থ

১.

(এথ সুনি নবিবরে নিসব্দে রহিলা) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫খ।

২.

(কাচিন্থ্যথাভবেৎ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৯৮খ।

৩. 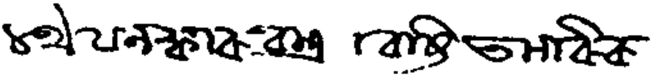

(জথ য়লঙ্কার বস্ত্র বেষ্টিত সরির) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৯১।

৪.

(জগন্যাথ লীলা খেলি কে বুজিতে পারে) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১ক।

দ

১. 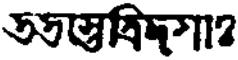

(ততস্তে ত্রিদশাঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ।

২.

(লক্ষীবান্ প্রিদর্শনঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২খ।

৩.

(দধ্যোদনেন মধুনা ক্ষুদ্র রোগাদি শান্তয়ে) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ৮১ক।

৪.

(ভয়াক্রিত হৈআ সব ধায়ে দসদিগে) ঢা. বি. পা. সং—৬৪০৫, পৃ. ৯৬।

৫. 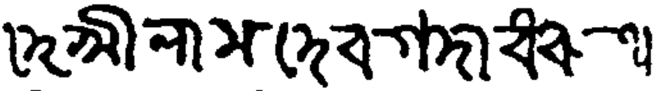

(দখীলাম দেবগদাধর) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩

ধ

১.

(সমিধো জুহুয়াদযুতাবধি) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক।

২.

(কৃতায়ুধ মহীরথম্) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ।

৩.

(মূৰ্দ্ধন্য ধারয়ত) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক।

৪.

(পর্বতো ধাতু মণ্ডিতঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২খ।

৫. 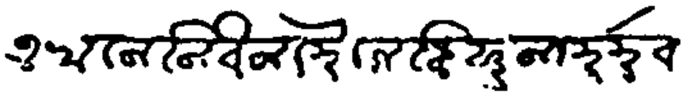

(এখনে নিধন হৈলে কিছু না হইব) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪।

৬. 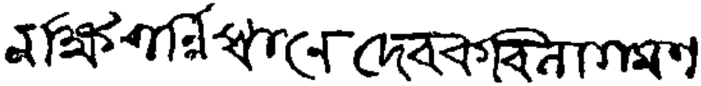

(লক্ষিসান্নিধানে দেব করিলাগমন) ঢা. বি. পা. সং—৬০৫৩, পৃ. ৩৪।

৭. 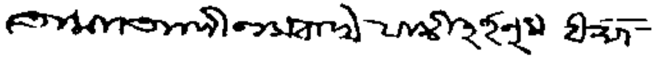

(তোমাতে সপীলুম বাপু য়াজী হইলুম ধন্য) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৯১।

৮. 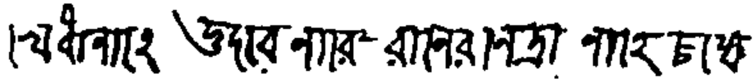

(খিধা নাহি উদরে নারি রানির নিদ্রা নাহি চক্ষে) বা. এ. পা. সং-২৭৬ পৃ. ১০।

ন

১.

(গৌরাঙ্গের বচন সুনিঃ) ঢা. বি. পা. সং—৬১০২

২.

(খাগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআ) ঢা. বি. পা. সং—২৯, পৃ. ১৭৪।

৩.

(লোহিতো নাম সাগরঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৭৪।

৪. 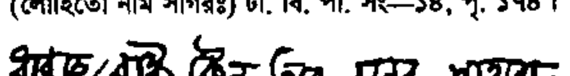

(ধরিতে বুদ্ধি কৈল তবে বনের সাহসে) বা, এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১০ক।

৫. 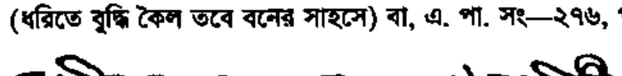

(রসিক নায়ক নবরাজ গুণনিধি) ঢা. বি. আ. সং—৫১৩, পৃ. ৯১।

প

১.

(পঞ্চগব্যেষু সর্প্পিষাং) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক।

২.

(খাইতে না পারে মাংস আপনা বিক্রম) ঢা. বি. পা. সং—২৩৭, পৃ. ৯২।

৩. 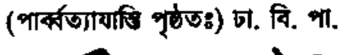

(পার্ব্বত্যাযাস্তি পৃষ্ঠতঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ।

৪. 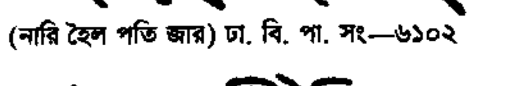

(নারি হৈল পতি জার) ঢা. বি. পা. সং—৬১০২

৫. 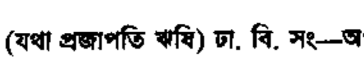

(যথা প্রজাপতি ঋষি) ঢা. বি. সং—অপরিচায়িত

৬.

(পীত্রিহিন এতিমের দয়াএ পালিবা) ঢা. বি. পা. সং—৫৩১, পৃ. ৯২।

ক

১.

(ফলত্রয়ষঞ্চ তৈঃ কষ্কৈঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক।

২. 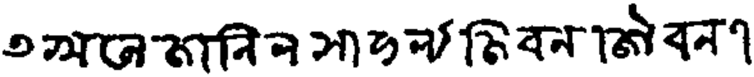

(তখনে জানিল সাফর্ল্য জিবন জৌবন) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১ক।

৩.

(অফল প্রেল্গুনা কর্ম্ম ...) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ৩৬।

খ

১.

(বিসর্জ্জিতৈ তত: ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক।

২. 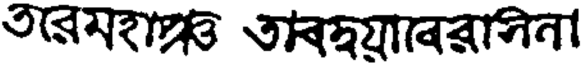

(তবে মহাপ্রভু তার দুয়ারে বসিল) ঢা. বি. পা. সং—৫৯৯৩, পৃ. ৪৯খ।

৩.

(গঙ্গাদাস বক্রেস্বর ...) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৪২, পৃ. ৯ক।

ভ

১.

(পুত্রদায়ী ভবেতৃণাং) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮৯খ।

২.

(ভয়ং ত্যজত ভদ্রং বঃ ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক।

৩.

(সুভখণে কৈন্যা জন্মিল সৈত্যবতি) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১ক।

৪.

(সেবা ভক্তিএ থাকিবা সর্বক্ষণ) ঢা. বি. পা. সং—৫৩১, পৃ. ৯১।

ম

১.

(সেমার্গমাণঃ ...) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২।

২.

(প্রেম ভাবি সেবা মাত্র য়াচরি রহিবা) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৯১।

য

১.

(অথ বাস্তু যাগ প্রমানং) রা. পা. সং—১২১৬, পৃ১৭খ।

২. 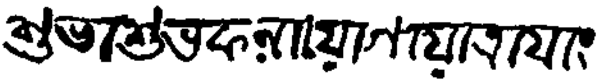

(শুভাশুভ ফলা যোগা যাত্রায়াং) রা. পা. সং-৩২৩১, পৃ. ৭৮।

৩.

(কার্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নীয়তং করমর্জ্জুন) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ৩৫খ।

য়

১.

(লোকস্যানন্দদায়কঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ ক।

২.

(ন্যায়ং মন্ত্রেণানেন সাধিতং) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক।

ৱ

১.

(পরিধানায় তৎপরম) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৯৮খ।

২.

(চারুরূপ বিরাঙ্গনাঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪ক।

৩.

(গিরিঃ পুষ্পিত কচৈব ...) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২খ।

৪.

(হরোভক্তিং করোত্যত্রত্বং) ঢা. বি. পা. সং—৩২৩, পৃ. ৯৩ক।

৫. 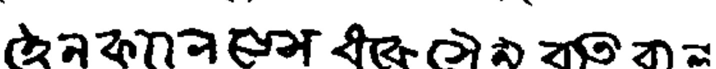

(হেন কালে ভেস ধরে সৈত্যবতিবালা) ঢা. বি. আ. সং—২৮০৩, পৃ, ৪১ক।

৬. 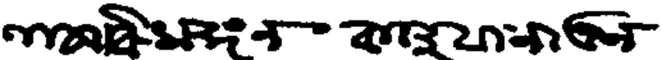

(লাচারি মঙ্গল কহে য়ালাওল) ঢা. বি. পা. সং—৫৩১, পৃ. ৯১।

ল

১.

(প্রলয়াগ্নি সমং চক্রং যস্য মূর্দ্ধনিচিন্তয়েৎ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক

২.

(লক্ষণঞ্চ মমানুজং) ঢা. বি. পা. সং—৩২৩, পৃ. ৯৩ক।

৩.

(ধনুর্ব্বান লয়া দল সেহি দিগে বেড়ে) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১০ক।

৪.

(ফলমাদি শান্তি ...) ঢা. বি. পা. সং—৫।

শ

১.

(শ্বেতকিংশুক সন্তবৈঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক।

২. 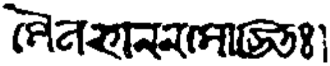

(শৈল কানন শোভিতঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২খ।

৩.

(বিভিন্ন শিরো দেহাঃ ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ খ।

৪. 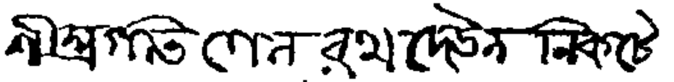

(শীঘ্র গতি গেল রথ দেউল নিকটে) ঢা. বি. পা. সং—৬০৫৩, পৃ. ৩৪।

৫. 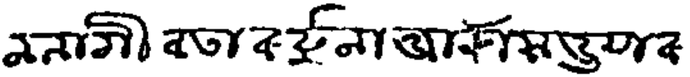

(ন লাগীব তার টুনা আকাশ উপর) ঢা. বি. পা. সং—২১৫ পৃ. ৪৪৫খ।

ষ

১.

(অভিষেকো যমাখ্যাতো ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৯৮খ।

২. 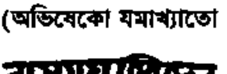

(ক্ষয়শ্চাপিদেব ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক।

৩. 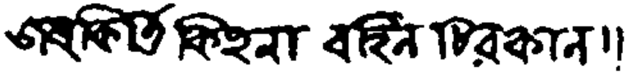

(জয়কির্ত্তি কিছুনা বহিল চিরকাল) ঢা. বি. পা. সং—৫৭৩৬, পৃ. ৪খ।

৪. 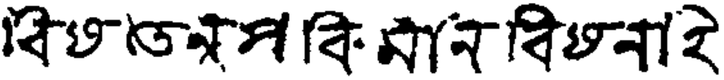

(বিষ েঁং পরিমান বিষনাই) ঢা. বি. পা. সং—২৯৫২৭।

স

১.

(অপামাঙ্গস্য সমিধঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক।

২.

(সপ্তমংমারুতস্কন্দং ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ খ।

৩.

(সদেবাঃ সাম্ববোগণাঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২খ।

৪. 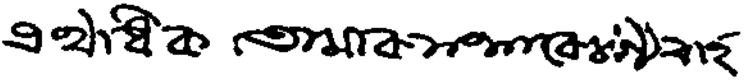

(এথধিক তোমার সংসারে জগ্য নাই) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৯১।

৫.

(সত্তের হাজার আর আসিছে সংহতি) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫খ।

হ

১. 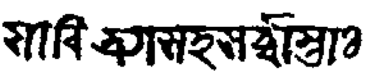

(সাবিত্র্যাসহ সর্ব্বাস্তাঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ।

২. 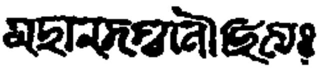

(মহানদশ্চ লৌহিত্যঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২খ।

৩.

(পর্য্যচরন্মহীং) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ ৪৩ক।

৪.

(সহস্রানীকস্য হরেরবতারং শ্রুণু ...) ঢা. বি. পা. সং—৩২৩, পৃ. ৪৭খ।

ক্ষ

১.

(ক্ষুদ্র রোগগ্রহাপহঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক।

২.

(নক্ষত্রাণাঙ্গণাশ্চৈব ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক।

৩. 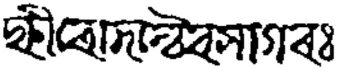

(ক্ষীরোদশ্চৈব সাগরঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২খ।

গ. স্বরমাত্রিক জ্ঞান

একটা পূর্ণাঙ্গ শব্দ লিখতে হলে তার সঙ্গে 'া',. 'ি', 'ু', 'ৃ', 'ে'-কার ইত্যাদি এবং বিভিন্ন 'ফলা' যুক্ত হয়। পাণ্ডুলিপিও এই নিয়ম বহির্ভূত নয়। তাই সেখানে এই বর্ণগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাও সবিশেষ লক্ষণীয়। অনেক পাণ্ডুলিপিতে 'া'-কার এবং 'ে' কারের পার্থক্য নির্ণয় করতে বেশ হিমশিম খেতে হয়। 'া'-কার অনেক সময় একটু বেঁকে 'ে'-কারের মত হয়ে গেছে। কিংবা 'ে'-কার না বেঁকে 'া'-কারের রূপ ধারণ করেছে। 'া'-কার এবং 'ি'-কারের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। অনেক পাণ্ডুলিপিতে 'ি'-কারের উপরের বাঁকা অংশটি বাদ দিয়ে অনেকটা 'া'-কারের মত করে 'ি'-কার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য 'ি' কারের উপরের অংশের বিনিময়ে ভিতরের দিকে একটা টান দিয়ে 'ি' কার বোঝানো হয়েছে। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে একটু কঠিন ও জটিল মনে হলেও ধৈর্যসহকারে, সচেতনতার সঙ্গে পরীক্ষা করলে পার্থক্য অবশ্যই দৃষ্টিগোচর হবে। উপরে বর্ণিত বর্ণগুলি শতাব্দীর কোন বিবর্তন ধারায় পড়ে না। অতি প্রাচীন যুগে কি ছিল তা আমাদের অজ্ঞাত। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় প্রাপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ

শতাব্দীর পাণ্ডুলিপিতে প্রচলন ছিল এ দুটি ধারারই। কখনো কখনো একটি পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত হয়েছে একটি রীতি, আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে একই সঙ্গে দুটো রীতি-ও ব্যবহৃত হয়েছে। দৃষ্টান্ত—

'া এবং ে'

ক. 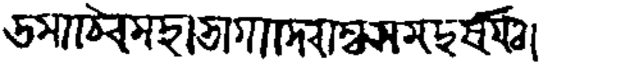

(উমা চৈব মহাভাগা দেবাশ্চ সমহর্ষয়ঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫. পৃ. ২৪৬ খ।

খ. 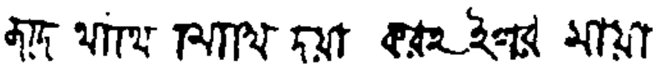

(জদি থাথে মোখে দয়া করহ ইহার মায়া) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৪খ।

গ. 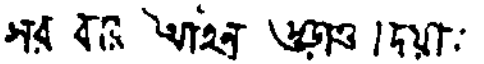

(সরববে আইল উড়াও দিয়া) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৪খ।

ঘ.

(বিজুলি সঞ্চারে জেনঅগ্নি খান খান) ঢা. বি. আ. ক. সং—৩৬৭. পৃ. ৪২ক।

ঙ. 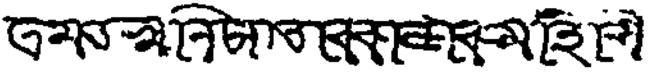

(এমত সুনিআ তবে রাজার মহিসি) ঢা. বি. পা. সং—৬৪০৫, পৃ. ৯৬ক।

উপযুক্ত উদাহরণগুলিতে 'া' এবং 'ে'-কারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এসব ক্ষেত্রে শব্দের অর্থানুসারে সঠিক পাঠটি উদ্ধার করতে হবে।

'া' এবং 'ী'

ক.

(পত্রেত লিখিবা মোর দুঃখের বিভরণ) বা. এ. পা. সং-২৭৬, পৃ. ১৪।

খ. 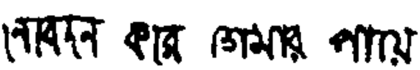

(নিবেদন করি তোমার পায়ে) ঐ

গ.

(কান্দিতে লাগিল তবে আহিড়ের ভিতর) ঢা. বি. পা. সং—৩৫৯, খ্রি. ১৮৭৫।

ঘ.

(পড়িয়া আপন সাস্ত্র বিচক্ষণ হৈল) ঢা. বি. পা. সং—৩৫৯, পৃ. ২ (১৮৭৫ খ্রি.)।

ঙ. 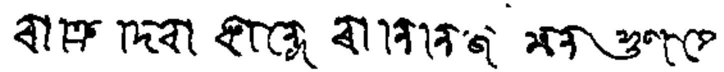

(রাত্রি দিবা কান্দে রানি নিজ মনস্তাপে) ঢা. বি. পা. সং—৩৫৯, পৃ. ১ (১৮৭৫ খ্রি.)।

এই উদাহরণগুলিতে আধুনিক 'ি'-কারের উপরিঅংশ একটিতেও নেই। সহজ দৃষ্টিতে 'ি'-কারকে 'ে' কার কিংবা 'া' কার ভাবাটাই স্বাভাবিক। তবে মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষা করলে 'া', 'ে' ও 'ি' কারের মধ্যে সামান্য পার্থক্য চোখে পড়বে। এসব ক্ষেত্রে পাঠক যে পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করতে যাবেন, প্রথমেই তিনি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করবেন তার পাঠ্য পাণ্ডুলিপির 'া', 'ি' এবং 'ে'-কার কোন রীতিতে লিখিত হয়েছে।

ক. 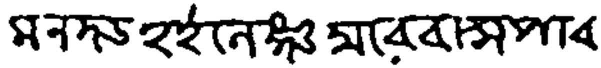

(মন দড় হইলে কৃষ্ণ ঘরে বসি পাব) ঢা. বি. পা. সং—৩৬৭০, পৃ. ৩ক (১৮২৭ খ্রি.)।

খ.

(এখানে ভজিব কৃষ্ণ সেথা কেন জাব) ঢা. বি. পা. সং—৩৬৭০, পৃ. ৩ক (১৮২৭ খ্রি.)।

গ.

(নাগর কাহ্নঞি সমে বিবিধ বিধানে) ঢা. বি. সং, সং—২৯, পৃ. ১৭৪ক (সপ্তদশ শকাব্দ)।

ঘ.

(বিভাষরাগঃ) ঢা. বি. সং, সং—২৯, পৃ. ২১৫ খ (সপ্তদশ শকাব্দ)।

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলির 'ি'-কারের উপরিঅংশের বিনিময়ে ভিতরের দিকে আড়াআড়ি ছোট রেখা ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এ রীতির ব্যবহারও প্রচুর দৃষ্ট হয়। আধুনিক 'ি'-কারের মত 'ি'-কারও পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হতে দেখা যায় সেই পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। অথচ পঞ্চদশ শতাব্দীর অনেক পরবর্তীকালের উপর্যুক্ত উদাহরণগুলির 'া', 'ে', 'ি'-কারগুলি আমাদের দৃষ্টিকে করে বিভ্রান্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীর কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হল।

ক. 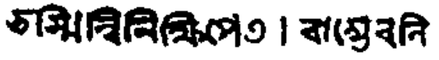

(তস্মিন্বিনিক্ষেপৎ/রাজ্যেবলি ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১খ (১৪৩৯ খ্রি.)।

খ.

(শ্রীদাম্নাসহ গোবিন্দঃ/নভঃ শিবস্তে ...) ঢা. বি. পা. সং—৬৩, পৃ. ১৪৮খ (১৪৬৬ খ্রি.)।

গ.

(প্রাবৃটকালে স্ত্রিয়াং ভূম্নিবিট স্ত্রীব্যাপন বিষ্ণয়োঃ) ঢা. বি. পা. সং—২৩৯৭, পৃ. ৭৬খ (শকাব্দ-১৪৯৯)।

আধুনিক বাংলা লিপিতে প্রতিটি 'বানান', 'ফলা' পৃথক করা হয়েছে সুস্পষ্টরূপে। কিন্তু প্রাচীনযুগে পার্থকীকরণ ব্যাপারে এতটা সচেতনতা ছিল না। ফলে আধুনিক যুগের পাঠকরা পাঠোদ্ধারকালে এই অসচেতনতার স্বীকার হচ্ছেন প্রতিক্ষেত্রে। যেমন, প্রাচীন পাণ্ডুলিপির 'উ'-কার এবং 'ব'-ফলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একই 'ব' বর্ণদ্বারা 'উ'-কার এবং 'ব'-ফলা নির্দেশিত হয়েছে। যেমন—

উ-কার

ক. 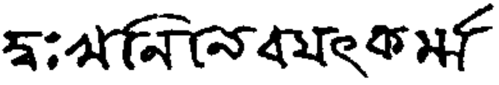

(দুঃখ নিত্যে বয়ৎ কর্ম্ম..) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ৩৫।

খ.

(মনুর্সের সক্তিয়েকি আমাক রাখিব ধরিয়া) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৯।

গ. 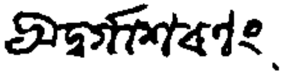

(শ্রীদুর্গাশরণং) রা. পা. সং-৩৯১, পৃ. ৩৭।

ঘ. 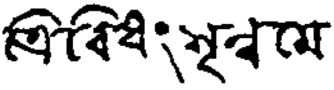

(ত্রিবিধং শৃত্বমে) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ৩৫।

ঙ.

(ব্যাঘ্র ভল্লুক গণ্ডা মহিস কেসরি) বা. এ. পা. সং-২৭৬, পৃ. ৮খ।

চ.

(সাধ্যাশ্চ বসুভিঃ সহ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ।

ছ. 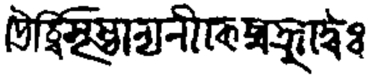

(তৈর্বির্বসৃষ্টান্যানীকেষুক্রুদ্ধৈঃ) ঐ

জ. 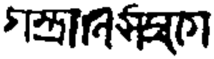

(শস্ত্রানী সংযুগে) ঐ

ঝ.

(দেবানাংবিমুখংবভৌ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ।

ব-ফলা

ক.

(অহোজরদ্বা ...) রা. পা. সং—৩৯১, পৃ. ৩৭।

খ.

(ভঙ্গদিইয়া পদ্মুগ জায় চতুরদ্বিগে) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৮খ।

গ.

(অম্বোয়ে চড়ি মাউত সব পসিল) ঐ পৃ. -৮ক।

ঘ.

(অথতদ্বিদ্রুতং সৈন্যং দৃষ্টবা দেবঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ।

দ্বিত্ব নির্দেশক 'ব'

ক. 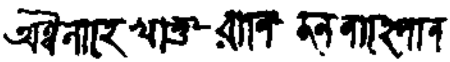

(অন্ন নাহি খাউ রানি জল নাহি পান) বা, এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৮খ।

খ.

(তাহারমাও দিগুকা কান্দে সম্ববাদ পাইয়া) ঐ পৃ. ৬খ।

গ.

(ব্যাক্লিস সুর-গিত আমাকে শিখাও) ঐ পৃ. ৪ক

ঘ. 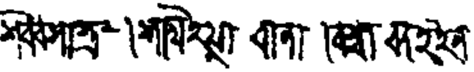

(সর্ব্বশাস্ত্র শিখিইয়া বালা বিষারদ হইল) ঐ পৃ. ৪খ

এক্ষেত্রে উক্ত লাইনের আগে-পরের শব্দের অর্থানুযায়ী সঠিক পাঠটি উদ্ধার করতে হবে। তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, সাধারণত দ, ন, প, ল, য, ম, ষ, স এই বর্ণগুলির ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ 'ব' বর্ণ দ্বারা 'উ'-কার লিখিত হয়েছে। 'ব' বর্ণ দ্বারা 'উ'-কার নির্দেশ রীতি সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে বেশী মাত্রায় প্রচলিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকের পাণ্ডুলিপিতে প্রচলন দেখা যায় এই রীতিরই। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এই রীতির সঙ্গে 'উ'-কারের ' ু '-এই রূপের ব্যবহার কিছু কিছু দৃষ্ট হয়। তবে ষোড়শ শতাব্দী থেকে কম-বেশী দুটো রীতিরই ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে একটি রীতি আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে একসঙ্গে দুটো রীতিরই ব্যবহার অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে 'উ' নির্দেশক 'ব'-রীতি লোপ পেয়েছে এবং ' ু '-রীতি স্থিতি লাভ করেছে।

ফলা নির্দেশক 'ব' বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেক বর্ণের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু দ্বিত্ব নির্দেশক 'ব' বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী লোপ পেতে পেতে বর্তমানে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছে।

ঘ. চিহ্নমাত্রিক জ্ঞান

যে কোন পাণ্ডুলিপির সঠিক পাঠোদ্ধার করতে হলে ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং প্রবল আগ্রহসহকারে তা পাঠ করতে হবে। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, পাণ্ডুলিপির কোন বর্ণ, কোন চিহ্ন অর্থহীন নয়। তাই প্রতিটি পত্রের প্রতিটি বর্ণ, প্রতিটি চিহ্ন সূক্ষ্মভাবে করতে হবে বিচার-বিশ্লেষণ। পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে কোন জটিলতার সম্মুখীন হলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুমাত্রিক ও পূর্ণমাত্রিক[১] বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক শব্দটি উদ্ধার করতে হবে। অনুমানের দ্বারা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এর ফলে অর্থের ভিন্নতা দেখা দিতে পারে। যেমন—

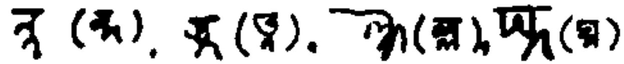

এখানে প্রথমে দেখতে হবে বর্ণটা কি, অন্য কোন্ বর্ণ এসে ঐ বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে সম্ভাব্য কি অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। এভাবেও সম্ভব না হলে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটির উপর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে এরূপ শব্দ আর কোথায় কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। উপর্যুক্ত 'দ', 'ন' ও 'ল'-এর মত আপাত দৃষ্টিতে একই রকম বর্ণ পাণ্ডুলিপিতে প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণের নীচে একই রকম কৌণিক চিহ্নের দ্বারা গঠিত যুক্তবর্ণ সম্বলিত যে-সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হল—

১. বিভিন্ন ফলা। কোন কোন বর্ণের নীচে কৌণিক চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত হত বিভিন্ন ফলা। সাধারণত 'ন' ফলা ও 'ল' ফলা বর্ণবিশেষে ধারণ করেছে কৌণিক চিহ্নাকৃতি।

   তবে 'ন' ফলা অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতেই প্রায় সব ক্ষেত্রে বর্ণের নীচেই কৌণিক চিহ্নের আকৃতিতে লিখিত হয়েছে, 'কিন্তু 'ল' ফলা বিশেষ বিশেষ বর্ণের নীচেই কৌণিক চিহ্নের আকৃতিতে লিখিত হয়েছে, যেমন—

ন-ফলা

ক.

(দগ্ধা সকগ্ধা) রা. পা. সং-৬১৬৭, পৃ. ১৭।

---

১ অনুমাত্রিক (microscopic) নিরীক্ষণ পদ্ধতি, অর্থাৎ কোন বর্ণের প্রতিটি চিহ্ন, আকৃতি বা বৈশিষ্ট্য ও জটিলতা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে পাঠোদ্ধার পদ্ধতি এবং পূর্ণমাত্রিক (macroscopic) বা সামগ্রিক নিরীক্ষণ পদ্ধতিতে একটি বিষয়কে সামগ্রিকভাবে বিচার করে পাঠোদ্ধার করা হয়।

খ. 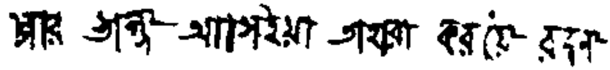

(চারি ভগ্নি আসিইয়া তাহারা করয়ে রদন) বা, এ. পা. সং-২৭৬, পৃ. ৫।

গ. 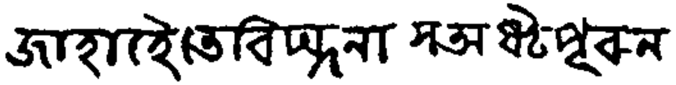

(জাহা হৈতে বিঘ্ননাস অষ্টপূরণ) ঢা. বি. পা. সং—২৯৯১, পৃ. ১।

ঘ. 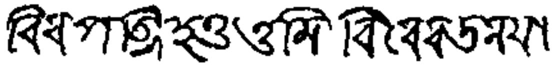

(বিরপত্নি হও তুমি বিরের তনয়া) বা, এ, পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৪খ।

ঙ.

(অতিদগ্ধাছাত্রেন অকারোশ্চরণং) রা পা. সং-৬১৬৭, পৃ. ১৭।

চ. 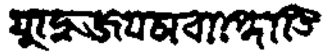

(যুদ্ধে জয়মবাপ্লোতি) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ।

ছ. 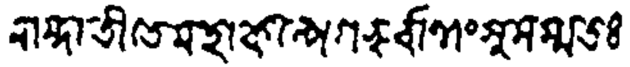

(নাম্নাতীতে মহা কল্পে গন্ধর্বাণাং সুসম্মতঃ) রা. পা. সং—১৩৪১, পৃ. ২৪খ।

জ.

(কৃষ্ণ কথা অমৃতের ধারা) আ. ক. সং—৩৬৭, পৃ. ৪২ক।

ঝ. 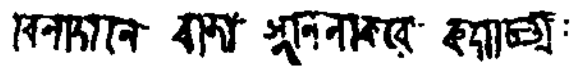

(বিনাদানে রাজা স্নান না করে কদাচিত্য) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১।

ঞ.

(লাবণ্য জোস্না ঝলমল) ঢা. বি. পা. শা সংগৃহীত অপরিচায়িত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ৩

ট.

(নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে ...) ঢা. বি. পা. সং—ঐ পৃ. ২৯ক।

ঠ. 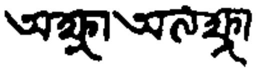

(অক্লা অত্যক্লা) রা. পা. সং—৬১৬৭, পৃ. ১৭।

ল-ফলা

ক. 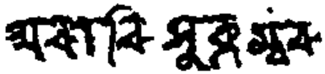

(মুরারি সুক্লম্বর) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৪২, পৃ. ৯৪।

খ.

(ফুল্লৈরাজ্য পরিপ্লুতৈঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১।

গ. 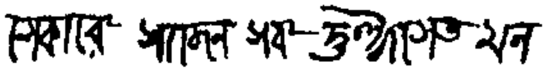

(সিকারে সাজিল সব উল্লসিত মন) বা, এ, পা, সং—২৭৬, পৃ. ৭খ।

ঘ. 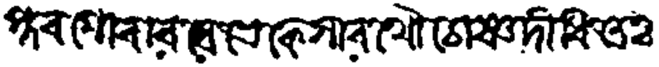

(প্লবগোবাররে ভেকেসারথৌ চোষ্কদীধিতেঃ) ঢা. বি. পা. সং—২৩৯৭, পৃ. ১২

ঙ. কৌণিক চিহ্নের ব্যবহার

(ক) ঞ্জ/ঞ্জ

(i) 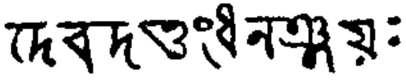

(দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ) ঢা. বি. সংগ্রহের অপরিচায়িত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ২৯ক।

(ii)

(দলিতাঞ্জন চিক্কনঃ) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৬, পৃ. ৩খ।

(খ) জ্জ

(i) 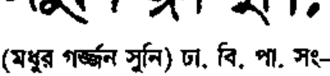

(মধুর গর্জ্জন সুনি) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৬, পৃ. ৩খ।

(ii)

(খুম্বর হুৰ্জ্জাজ) ঢা. বি. আ. ক. সং—৩৬৭, পৃ. ৪১ক।

(গ) ঞ্জ

(i)

(দুদ্দেব ঝঞ্ঝা পবনে) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৬, পৃ. ৩খ।

(ঙ) যজ

(i) 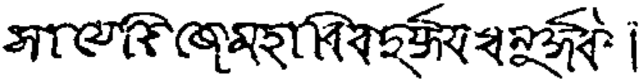

(সাত্যকি জে মহাবির দুর্য্যয় ধনুর্দ্ধর) ঢা. বি. পা. সং-৩২৭১, পৃ. ৪৯ক।

(চ) ন্দ

(i) 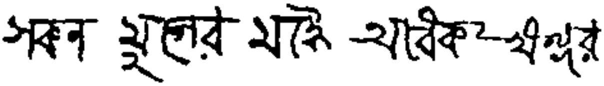

(সকল মৃগের মদ্ধে অধিক সুন্দর) বা. এ. পা. সং ২৭৬, পৃ. ৭।

(ii)

(কস্তুরির গন্দে জেন মৃর্গ ভ্রমে বণ) ঢা. বি. পা. সং—২৩৭, পৃ. ৯৩।

(iii)

(বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃ. ১৯৭

(iv)

(কুন্দ বিকাশ তুল্য) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৬, পৃ. ১।

(ছ) ন্ধ

(সচি করেন রন্ধন) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৪২, পৃ. ৯।

(জ) দ্দ

(i)

(রাজা নিহতং কর্দ্দমী কৃতং) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ১।

(ii)

(চতুর্দ্দশ ভুবণেতে ইন্দ্র অধিপতী) ঢা. বি. পা. সং—৩১১৫, পৃ. ৪২ক।

(ঝ) ঙ্গ

(পতঙ্গঃ শলভেশালী প্রভেদে শালি সূর্য্যয়োঃ) ঢা. বি. পা. সং—২৩৯৭, পৃ. ১২

(ঞ) জ্ঞ

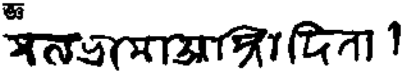

(সত্যভামা আজ্ঞা দিলা) ঢা. বি. পা. সং—২৯৯১, পৃ. ৩

(ট) দ

(i)

(এতেন মেঘশব্দাৎ সমভয়ং) ঢা. বি. পা. সং—৬৪০৫, পৃ. ৯৫।

(ii)

(সুভমস্তু সকাব্দা) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ৪২।

(ঠ) দ্ধ

(সার্দ্ধবৎসরং) রা. পা. সং-৫৮১০, পৃ. ৬১ক

চ. চিহ্ন দ্বারা সমাকৃতি বর্ণের পৃথকীকরণ

বিভিন্ন যুক্তবর্ণ এবং স্বরবর্ণ আপাতদৃষ্টিতে একই বলে ভ্রম হলেও সূক্ষ্মভাবে দেখলে কোন কোন ক্ষেত্রে এদের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় লিপিকর দুটি বর্ণের সাদৃশ্যের ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন। তাই পার্থক্য নির্দেশের জন্য বর্ণের উপরে বা নীচে বিভিন্ন চিহ্ন (' . ', '/') ব্যবহার করেছেন, যেমন—

'ন' ও 'ল'

(1)

(ন ঘেষ্টা কুশলং কর্ম্ম কুশলেন্নানুসর্জ্জতে) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ৩৬

(ii)

(বুদ্ধির্য্যস্য ন লিপ্যতে হিত্বাপি ...) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ৩৬

উপর্যুক্ত উদাহরণ দুটিতে 'ল' ও 'ন' বর্ণদুটি লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে। কিন্তু লিপিকরের সচেতনতার জন্য 'ল' ও 'ন'-এর পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ লিপিকর 'ন' ও 'ল' একই আকৃতিতে লিখলেও পার্থক্য জ্ঞাপনের জন্য 'ল'-এর নীচে বিন্দু চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। এরূপ পার্থক্য জ্ঞাপক চিহ্ন পাণ্ডুলিপিটির সর্বত্রই দৃষ্ট হয়।

'য' ও 'য়'

(i) 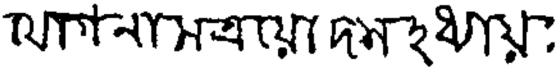

(যোগ নাম ত্রয়োদশহধ্যায়ঃ) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ৩৬।

(ii) 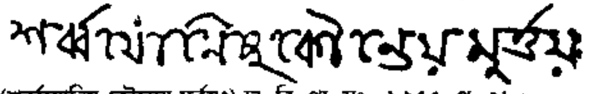

(শর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মুর্ত্তয়ঃ) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ৩৬।

এ উদাহরণ দুটিতে 'য' ও 'য়'-র আকৃতি একই রূপ হলেও পার্থক্য নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। 'য'-র উপরে এবং 'য়'-র নীচে বিন্দু চিহ্নের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে উভয়ের পার্থক্য।

(ii) 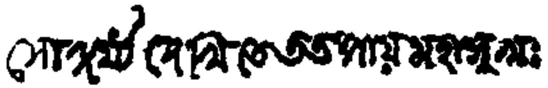

(সৌন্দর্য্য দেখিতে তত পায় মহাসুখ) ঢা. বি. সং-৫৮৪২, পৃ. ৯ক।

উক্ত পাণ্ডুলিপিটিতে 'য' এবং 'য়' লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে। ফলে দুটি বর্ণের পার্থক্যীকরণ হেতু 'য'-র উপরে একটি বিন্দু চিহ্ন এবং 'য়' বর্ণের নীচে একটি বিন্দু চিহ্ন (আধুনিক 'য়' বর্ণের ন্যায়) ব্যবহৃত হয়েছে)

'ক' ও 'ফ'

(i) 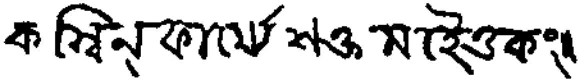

(কশ্বিন কার্য্যে শক্ত মহৈত্তকং) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫

(ফলত্যাগী সত্যাগিত্য বিধিয়তে) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫

(ii) 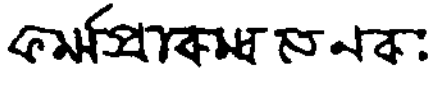

(কর্ম্ম প্রারম্ভতে নরঃ) ঐ

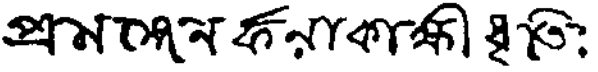

(প্রসঙ্গেন ফলা কাঙ্ক্ষীধৃতিঃ) ঐ

এখানে 'ক' ও 'ফ' বর্ণ দুটি অনেকটা একই আকৃতিতে লিখিত হয়েছে। তবে বিভ্রান্তির হাত থেকে পাঠকদের মুক্তিকল্পে 'ফ' বর্ণের উপরে একটি '^' রেফ চিহ্নের ব্যবহার করে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

'ত্ত,' 'ও' এবং 'তু'

(i) 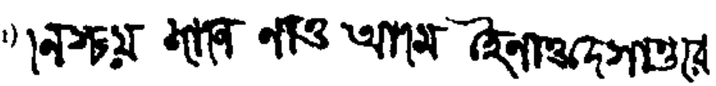

(নিশ্চয় জানি লাও আমি হৈলাও দেসান্তরি) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৩

(ii)

(সর্ব্ব শাস্ত্র পড়িয়া তুমি পুরুষ সুজান) ঐ, পৃ. ১৪

(iii)

(নিবারহো চিত্ত তুমি পিড়া পরিহরি) ঐ পৃ. ১৩

উক্ত ২৭৬ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিটির সর্বত্রই ত্ত, ও এবং তু লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে। এখানে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে 'ও' বর্ণটি বিভিন্ন বর্ণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—'ও' বর্ণের দক্ষিণ পার্শ্বে বিন্দুচিহ্নের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে 'তু' এবং ঊর্ধ্বদিকে আধুনিক 'উ' কারের উপরি অংশের ন্যায় চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে 'ত্ত'।

'জ্ঞ' ও 'দ্দ'

(i)

(জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বচো বা) রা, পা. সং—১৩৪১, পৃ. ২৪খ।

(ii)

(তাবদ্দাস্যামহংজজ্ঞে তত্রাপি ব্রহ্মবাদিনাং) রা. পা. সং—১৩৪১, পৃ. ২৫।

এখানে 'দ্ধ' এবং 'জ্ঞ' বর্ণ দুটি একই আকৃতির হওয়াতে লেখক/লিপিকর চিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা একটি থেকে অপরটিকে পৃথক করেছেন। যেমন—'জ্ঞ' বর্ণটির দক্ষিণ পার্শ্বের মাঝ বরাবর একটি বিন্দু চিহ্ন দ্বারা 'দ্ধ' বর্ণটি থেকে 'জ্ঞ' বর্ণটির পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

'দু' এবং 'দ্ব'

(i) 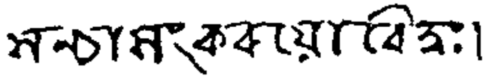

(সন্যাসং করয়ো বিদুঃ) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ৩৫খ।

(ii)

(অনুদ্বেগকরং বাক্যং) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ৩৪।

উক্ত পাণ্ডুলিপিতে লিপিকর 'দু' এবং 'দ্ব' বর্ণ দুটি একই আকৃতিতে লিখে 'দ্ব' বর্ণটির নীচে একটি বিন্দু চিহ্ন দ্বারা একটি থেকে অন্যটির পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

'দু' এবং 'ত্ব'

(i)

(... দুস্তরাস্তং যাবদুদকাঞ্জলি) রা. পা. সং-১২১৬, পৃ. ১৭ক

(ii) 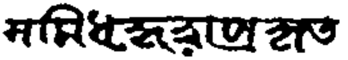

(সমিধকৃত্বাপ্রকৃত ...) রা. পা. সং—১২১৬ পৃ. ১৭ক

উক্ত পংক্তি দুটিতে 'দু' এবং 'ত্ব' লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে। অর্থাৎ প্রথম উদাহরণের 'দু' এবং দ্বিতীয় উদাহরণের 'ত্ব' বর্ণ দুটি অনেকটা একই আকৃতির হওয়াতে 'ত্ব' বর্ণটির নীচে বিন্দু চিহ্নের দ্বারা একটি থেকে অন্যটির পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে।

'ঘ' ও 'দ্ব'

(i)

(প্রভু রঘুনাথ পাদ ...) ঢা. বি. পা. সং—৯২৫৫, পৃ. ৪০,

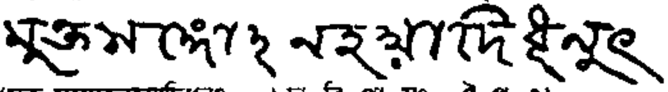

(মুক্ত সম্মোহনহস্বাদিধৃনুৎ ...) ঢা. বি. পা. সং—ঐ, পৃ. ৩৬

(ii) 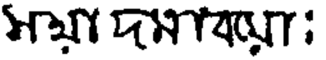

(সম্বাদমাবয়োঃ ...) ঐ. পৃ. ৪০

উক্ত উদাহরণগুলিতে সমাকৃতির বর্ণ দুটি হচ্ছে 'ম' এবং 'স্ব'। সমাকৃতি এইবর্ণ দুটির পার্থক্য নিরূপণ হেতু লিপিকর 'স্ব' বর্ণটির নিম্নাংশে একটি বিন্দু চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

'উ' ও 'ও'

(i)

(কিচক বসীল গিয়া পালঙ্গ উপর) ঢা. বি. পা. সং—৬৩৬৪, পৃ. ১৩খ

(ii)

(এত অপমান করি দণ্ড না পাইল) ঐ, পৃ. ১২খ

এই উদাহরণ দুটিতে কিংবা ৬৩৬৪ সংখ্যক পাণ্ডুলিটিপিতে 'উ'-কার এবং 'ও' অনেকটা একই আকৃতির হওয়াতে লেখক 'ও'-বর্ণটির নীচে বিন্দু চিহ্নের দ্বারা দুটি বর্ণের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

'ঠ' ও 'চ'

(i)

(লোহা হৈতে অধিক কঠীন ভিম কায়) ঢা. বি. পা. সং—৬৩৬৪, পৃ. ১৩খ

(ii)

(বৃকোদর চলিগেলা আগে নৃত্যালয়) ঐ

উপর্যুক্ত উদাহরণ দুটিতে 'ঠ' ও 'চ' একই আকৃতির হওয়াতে লেখক 'ঠ' বর্ণের নীচে বিন্দু চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে দুটি বর্ণের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। উক্ত পাণ্ডুলিপিটির সর্বত্রই এই রীতি অনুসৃত হয়েছে।

এরূপ অসংখ্য পাণ্ডুলিপিতে সমাকৃতির বিভিন্ন 'বর্ণ' ও 'শব্দ' লিখিত হয়েছে। যে-সব ক্ষেত্রে এরূপ একই আকৃতির বিভিন্ন বর্ণ দৃষ্ট হয় সে-সব ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি পাঠককে অত্যন্ত ধৈর্য এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিটি পাঠ পর্যালোচনা করতে হবে। একই আকৃতির একটি বর্ণের অনুমানে অন্যটি পাঠ করলে পাঠের অর্থ হবে বিপন্ন।

ছ. অনুস্বার অক্ষরের ব্যবহার

প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে 'অনুস্বাব' (ং) হরফটিও বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। এই অনুস্বার হরফটি একটি ছোট্ট গোলাকাব শূন্য চিহ্নেব (০) রূপ ধারণ করে কখনো বর্ণের মাথার উপর, কখনোবা বর্ণের ডান দিকে স্থিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি শাখায় প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় এই 'অনুস্বার' হরফটি বর্ণের ঠিক মাথা সোজাসুজি উপরে না থেকে বর্ণের উপরে একটু ডান পার্শ্বে কাঁধ বরাবর লিখিত হয়েছে। যেমন—

ক. 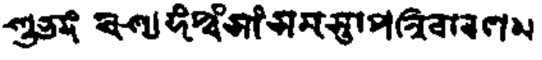

(শুভদং বশ্যদংপুংসাংসমস্তাপন্নিবাবণম্) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮৯খ।

খ. 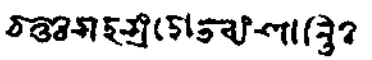

(চতুঃ সহস্রং হোতব্যং শান্তিঃ) ঐ, পৃ. ৮১ক

গ.

(কৃতোক্ষমংভবিষ্যতি) ঢা. বি.; পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২১১ খ

অনুস্বার হরফের এই আদলটি চলেছে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। যেমন—

ক. 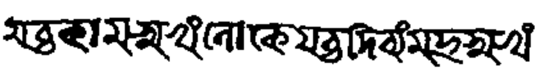

(যচ্চকামসুখং লোকে যচ্চদিব্যংমহসুখং) ঢা. বি. পা. সং—১৪ পৃ. ৪৩ক।

খ. 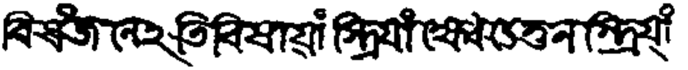

(বিষংজলে ইতি বিষায়াং স্ত্রিয়াং ক্ষেরতে তুন স্ত্রিয়াং) ঢা. বি. পা. সং—২৩৯৭ পৃ. ৭৬।

গ.

(আকর্ষণে পিপুংসি স্যাদামিষংপুংনপুংসকং) ঐ পৃ. ৭৬খ

ঘ

(নবশস্প্যাং সুখং ...) ঢা. বি. পা. সং—৬৩, পৃ. ১৪৮ ক

সপ্তদশ শতাব্দীতে এই অনুস্বার হরফটি বর্ণের আরও একটু ডানদিকে সরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছে। তবে পূর্ববর্তী রীতিও এই শতাব্দীর অনেক পাণ্ডুলিপিতে দৃষ্ট হয়। যেমন—

ক. 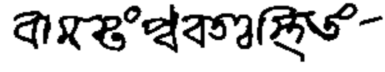

(রামস্তং পুরতঃ স্থিতং) ঢা. বি. পা. সং—৩২৩, পৃ. ৪৭খ

খ.

(আদ্যং মুক্তেতিহারীত বচনং) ঢা. বি. পা. সং—৪৪৫০, ঈ পৃ. ৩০

গ.

(এবং সপিণ্ডীকরণ ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৪৫০ ঈ পৃ. ৩০খ

ঘ. 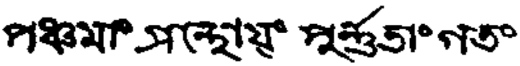

(পঞ্চমাং গ্রন্থোয়ং পূর্ণতাং গতং) ঢা. বি. পা. সং—২৪৮৭, পৃ. ৪৮খ

ঙ.

(বিরচয়তিনলোনির্ভরং সেতুবন্ধং) ঢা. বি. পা. সং—৫০০ ই পৃ. -৪২খ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অনুস্বার হরফটি বর্ণের উপরে না থেকে পার্শ্বের একটু নীচে নেমে অবস্থান নিয়েছে। যেমন—

ক. 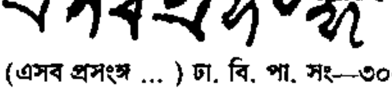

(এসব প্রসংঙ্গ ...) ঢা. বি. পা. সং—৩০০৯, পৃ. ৭খ।

খ. 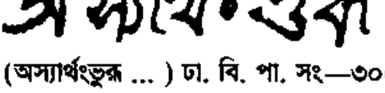

(অস্যার্থংভুক্ক ...) ঢা. বি. পা. সং—৩০০৯, পৃ. ৭ক।

এভাবে একটু একটু করে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হতে হতে উনবিংশ শতাব্দীতে এসে কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে এই আদলটির নীচে একটা বাঁকা ও লম্বা টান ' / ' (বর্তমান আধুনিক বাংলা অনুস্বার হরফের মত) ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এই শতাব্দীতে একই পাণ্ডুলিপিতে দুটো রীতির প্রচলনই সমভাবে দৃষ্ট হয়। যেমন—

(ক) 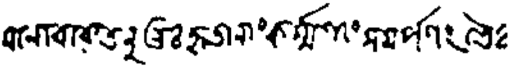

(মনোবাক্ তনুভিঃ কৃতানাং কর্ম্মনাং সমর্পণং তৈঃ) রা. পা. সং—১৩৪১, পৃ. ২৫ক।

(খ) 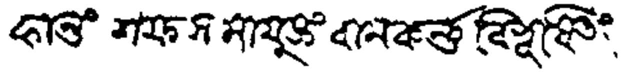

(কান্তং শক্রসমাযুক্তং বামর্কন্নবিভূষিতং) ঢা. বি. পা. সং—৮৫, পৃ. ৫খ।

জ. যুক্তবর্ণের ব্যবহার

পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জটিলতা সৃষ্টি করেছে যে বিষয় তাহলো যুক্তবর্ণের ব্যবহার। প্রাচীনযুগ ছিল আধুনিক যুগের বিপরীত। তাই বর্তমান যুগে যেমন চলছে যুক্ত অক্ষর ভেঙ্গে সহজ থেকে সহজতর করার পালা, তেমনি প্রাচীন যুগে ছিল একাধিক বর্ণযোগে যুক্তবর্ণ তৈরি করে তার ব্যবহারের প্রতিযোগিতা। প্রাচীন যুগের সংস্কৃত পুথি রচয়িতারা ছিলেন নিঃসন্দেহে পণ্ডিত ও ভাষাবিদ। সেই সব পণ্ডিত ব্যক্তির প্রতিযোগিতা ফসল যে কি হতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই আজ আমাদের এ যুগে বসে সে যুগের কবিদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় জানতে তাঁদের রচনার প্রতি লাইনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয় একাধিক বার। অসংখ্য যুক্তবর্ণ আমাদের দৃষ্টিকে করে তোলে বিভ্রান্ত। একটা বর্ণের সঙ্গে অন্য একটা বর্ণ এমনভাবে যুক্ত করে লেখা হয়েছে যা সহজ দৃষ্টিতে একটি বর্ণ বলেই ভ্রম হয়। ফলাযুক্ত যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তি ঘটে আরও বেশি। তবে অনুশীলনের দ্বারা যে কোন বিভ্রান্তির অপনোদন ঘটানো সম্ভব।

এমনিতেই পাণ্ডুলিপির বর্ণগুলি বিদঘুটে, তার উপর যখন সেই বর্ণ অন্য কোন বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তখনই তার কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাদ পড়ে ধারণ করেছে কিম্ভূত-কিমাকার রূপ। ফলে সেই সব যুক্তবর্ণ স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে জটিল থেকে জটিলতর। এমন কি 'ফলা' ছাড়া দুটো বর্ণের সংযোগও বিশেষ কৌতূহলপূর্ণ। যেমন—

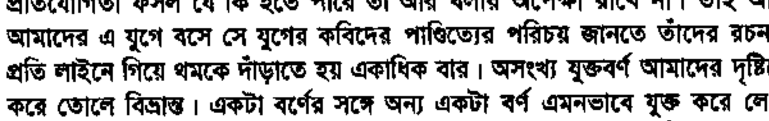
ইত্যাদি।

শুধু দুটো বর্ণের সংযোগই নয়, একাধিক বর্ণের সঙ্গে 'বানান', 'ফলা' ইত্যাদি যুক্ত করে একটা মাত্র শব্দ তৈরি করার প্রবণতাই ছিল যেন সবচেয়ে বেশি। যেমন (ঢ়ংভু) এখানে, ঢ়, ং, ভ এবং উ-কার এই চারটি বর্ণকে এক সঙ্গে করে লিখিত হয়েছে।

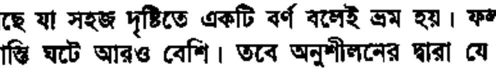

(উজ্জ্বল খংস নক্ষত্রং প্রমুঢ়ং ভুবনং ভূশম্) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ খ।

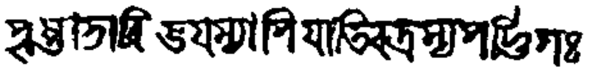

(পৃষ্টতো বিজয়স্যাপি যাতি রুদ্রস্য পট্টিশঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ ২৪৬ ক।

এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত উদাহরণগুলিও লক্ষণীয়।

(চ্ + ছ্ + ্র (র-ফলা) + উ = চ্ছ্রু

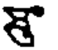 (ষ্ + ট্ + ্র + অ + ং) = ষ্ট্রং

(ঙ্ + গ্ + উ) = ঙ্গু

(ত্ + ম্ + উ) = ত্মু

(ষ্ + ট্ + উ) = ষ্টু

(ক্ + ঋ + ষ্ + ণ্ + অ) = কৃষ্ণ

(প্ + ্র + অ + ভ্ + উ) = প্রভু

(ষ্ + ট্ + ব্ + আ) = ষ্ট্বা

(ক্ + ত্ + ব্ + আ) = ক্ত্বা

(ভ্ + অ + ক্ + ত্ + অ) = ভক্ত

এরূপ অসংখ্য যুক্তবর্ণ পাণ্ডুলিপির পত্রগুলিকে করে রেখেছে জটিলতর। যেহেতু যুক্তবর্ণ তৈরি করা সংস্কৃত পণ্ডিতদের ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য সেহেতু শুধু 'বর্ণমালার' সঙ্গে পরিচিত হলেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাঠ সম্ভব নয়। একটা বর্ণ অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কতটুকু বিকৃতি ঘটেছে প্রতিট বর্ণ ধরে তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে হবে। কোন্ বর্ণের সঙ্গে কোন্ বানান, ফলা বা বর্ণ মিলে কিরূপ আকৃতি ধারণ করেছে এবং তা কতপ্রকার আকৃতিতে লিখিত হয়েছে নিম্নে তার নিদর্শন প্রদর্শিত হল।

(পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়ের লিখিত পাণ্ডুলিপির উদাহরণ এখানে দেখানো হল।)

উ (ু) কার

কু

১.

(কুন্তকন্তুমশোকা ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৯৯খ

২.

(পয়েন্মন্ত্রী কুম্ভাগ্নিভ্যামনন্তরম্) ঐ পৃ. ৮১ক

৩.

(নকুর্য্যাম সকৃৎ কিংনভাষসে ...) ঢা. বি. পা. সং—৩২৩, পৃ. ৯৩ক

৪. 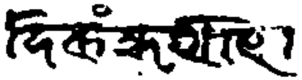

(দিকং কুর্য্যাৎ) রা. পা. সং—১২১৬, পৃ. ১৭খ

৫. 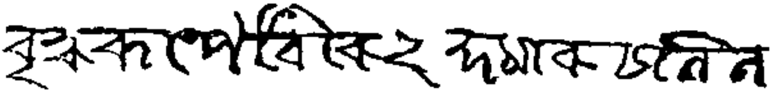

(বৃদ্ধরূপে ধিরে ধিরে কুমার চলিল) ঢা. বি. পা. সং—২৩৭, পৃ. ৯৩

৬. 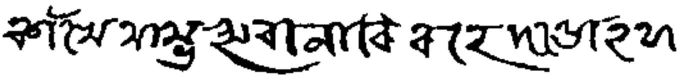

(কাঁখে কুম্ভ যুবা নারি রহে দাড়াইয়া) ঢা. বি. পা. সং—৬১০২,

৭.

(কুবের কৈলাস দিনে ধনের ঠাকুর) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৮৮, পৃ. ৯

৮.

(মকর কুণ্ডল কর্ন্নে তনু দুর্ব্বাদল) ঢা. বি. পা. সং—১২৩২ পৃ. ২৩ক

৯.

(পলাএ কুরঙ্গ ...) ঢা. বি. আ. সং—৩৬৭, পৃ. ৪১ক

১০.

(কান্দিয়া চলিল মৃর্গ কুমার লঙ্গিয়াঃ) ঐ, পৃ. ১০ক

গু

১.

(দিন ত্রয় যোজুহোতি গুনিকাঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১খ

২.

(গুণ্ডিচা মন্দিরে গেলা কিবা গেলা—ঢা. বি. পা. সং—২৯৯১, পৃ. ১২৫

৩. 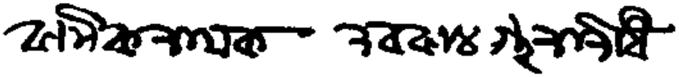

(রসিক নায়ক নবরাজ গুণনিধি) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৯১

ঘু

১.

(রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিরচিতো ...) রা. পা. সং—১২১৬, পৃ. ১৭খ

২.

(চৌরঙ্গ ঘুঙ্গুর পলে কান্দে ঘনে ২) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৭খ

চু

১. 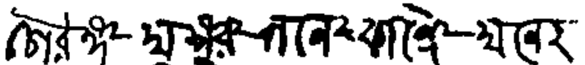

(ধানুকি বন্দুকি পাইক সাজিল প্রচুর) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৭খ

ছু

১. 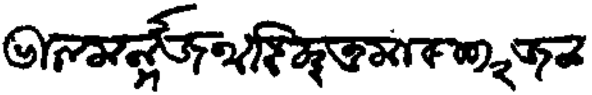

(ভাল মর্দ্দ জত কিছু তুমার শৃজন) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫কে

২.

(রছুল জর্ম্মিতে আইলা করিআ উল্লাশ) ঢা. বি. পা. সং—১৭৫৩, পৃ. ১১ক

৩.

(চিত্ত মোর কিছু না ভাবিয়ে মনেতে) বা. এ. পা. সং-২৭৬, পৃ. ১৪ক

জু

১.

(জুহুয়াদ যুতং মন্ত্রী নিশা স্ববলিমা হরেৎ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক

ঝু

১. 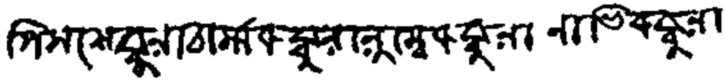

((পিসশে ঝুলা চর্ম্মের ঝুলা লুম্বের ঝুলা নাভির ঝুলা) রা. পা. সং-১১০৮, পৃ. ১

২. 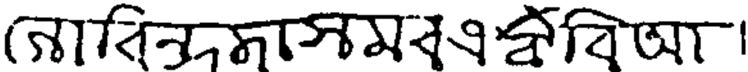

(গোবিন্দদাস মরএ ঝুরিআ) ঢা. বি. পা. সং—৬১২৫, পৃ. ৩খ

তু

১.

(দক্ষিণো তুরগং মন্ত্রী) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১খ

২. 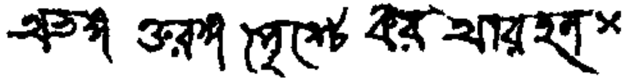

(অভঙ্গ তুরঙ্গ পৃষ্টে কর আরহনঃ) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৭খ

৩.

(তুমি মোর ধর তবে) ঢা. বি. আ. সং—৩৫৩, পৃ. ২৪খ

দু

১.

(জয়তৈ নান্ সুদুর্ব্বৃত্তান) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

২.

(পক্ষিবোলে বিধি এথ দুর্খ দিল তোক্ষা) ঢা. বি. আ. সং—২৩৭, পৃ. ৯৩

৩.

(হরনি দেখিয়া কুমার গেল বহুত দূরে) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১০ক

ন্

১.
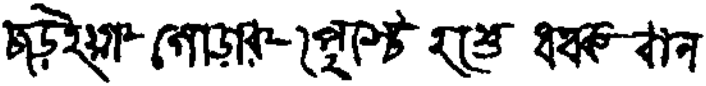
(চড়িইয়া গোড়ার পিৃস্টে হস্তে ধনুক বান) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৭ক

২.

(পতি বিনু সতির নাহিক গুরুজন) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৯১

৩.

(তবে কেন মুএগ্রী এত ঠেকিনু প্রমাদে) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৮৮, পৃ. ৯

৪.
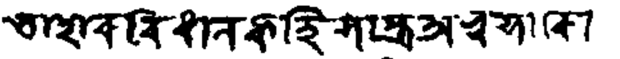
(তাহার বিধান কহি সাত্র অনুসারে) ঢা. বি. পা. সং—৩০০৯, পৃ. ৩

প্

১.

(পরিপুন্য ভক্তি পক্ষি বর তুষ্ট হৈল) ঢা. বি. পা. সং—২৩৭, পৃ. ৯৩

২.

(য়র্সপদ তলে কৈল রিপুকুলসিরে) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১. পৃ. ৭৩

৩.

(নিজ পুরি সহিতে পাইলা নারায়ণে) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১ক

৪.

(কহিবারে লাগীলেন্ত হই পুলর্কিত) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫ খ

৫.

(সৃজন্তঃ পুষ্প বর্ষানে ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক

৬. 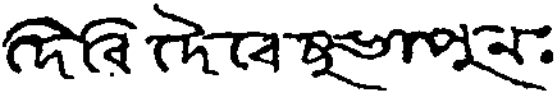

(দিবি দৈবে ষুভা পুনঃ ...) ঢা. বি. পা. সং—২৯৫৫২, পৃ. ৩৭

ভূ/ভু

১. 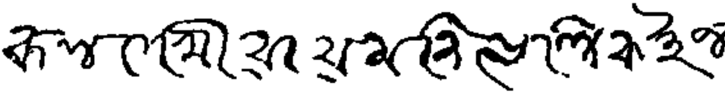

(রূপ দেখীয়া য়মনি ভূলি রইল) ঢা. বি. পা. সং—৬০০২

২. 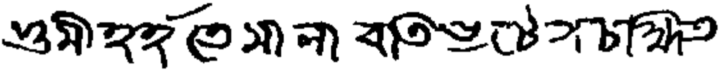

(ভূমী হইতে মালাবতি উটে সচক্ষিত) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১ক

৩.

(নিত্যানন্দ প্রভুবন্দ সদানন্দময়ঃ) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৮৬, পৃ. ১

৪. 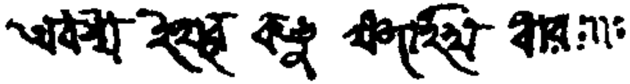

(অবস্য ইহার কভু সুজাইমু ধারঃ) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১০

৫.

(এক সমান ভুমি হইল উচ্চ নিচ্চ হেট) ঐ ৮

৬.

(ভুয়ো মণ্ডল মধ্যে ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ খ

ম্ব

১.

(বিমুখং শ্চাপ্রদৃশ্যাত) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক

২. 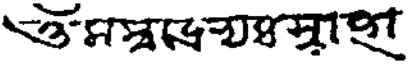

(ওঁ সমুদ্রেভ্যঃ স্বাহা ...) রা. পা. সং—১২১৬, পৃ. ৯ক

৩.

(জদিসে দেখীলা দেবি রছুলের মুখ) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫ক।

৪.

(কোন দোষে দোসি মুঞী নহো পাদ পদে) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৮৮, পৃ. ৯ক

৫. 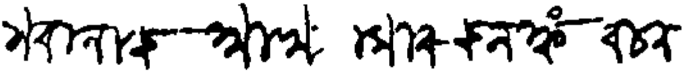

(সবলোক মুখে মোর কলঙ্ক বচন) ঢা. বি. পা. সং—অপরিচায়িত,

৬.

(কুমারকে সমুদিআ পুছে দুইজন) ঢা. বি. আ. সং—২৩৭ পৃ. ১০ক

৭. 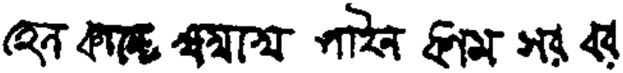

(হেনকালে সুমুখে পাইল কাম সরবর) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১০ক

য্ব

১.

(গোময়সংযুতাম) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮৯খ

২.

(পুত্রত্বং কশ্চিৎ কলি যুগে নরঃ) ঢা. বি. পা. সং—৩২৩, পৃ. ৪৭খ

৩. 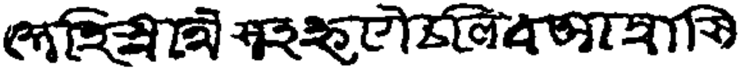

(সেহি স্বার্থসহ যুগে চলিব আস্বাসি) ঢা. বি. পা. সং—৬৪০৫, পৃ. ৯৬ক

৪. 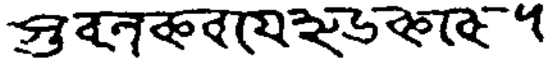

(স্তবন করয়ে যুড় করে) ঢা. বি. পা. সং—৬৩৫৮, পৃ. ১৫খ

৫. 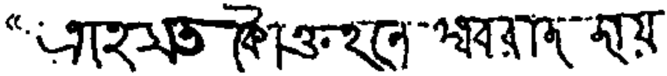

(এহিমত কৌতুহলে যুবরাজ জায়) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৮

৬.

(নগরের নর নারি যুবা যুবতি) ঢা. বি. পা. সং—৬১০২

৭. 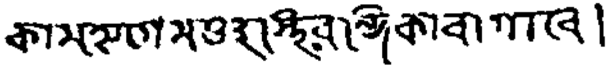

(কাম যুগে মত্ত হস্তি বন্দি কারাগারে) ঢা. বি. পা. সং—৬৪০৭, পৃ. ২২ক

৮. 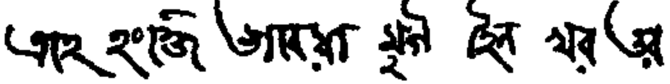

(এহি যুক্তি ভাবিয়া মৃগ হৈল খরতর) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১০

৯.

(সমুদ্রের তীরে আসি যুক্তি করিলা) ঢা. বি. পা. সং—২৯৯১, পৃ. ১২৫

১০.

(এমত নিলজ্যা কেনে হৈলা যুবরাজ) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৮

১১.

(যুর্দ্ধ সামান্য আকৃতি) ঢা. বি. আ. সং—৩৬৭, পৃ. ৪১

যু

১. 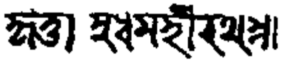

(কৃত্তায়ুধ মহীরথম্) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫ পৃ. ২৪৬ খ

রু/রূ

১. 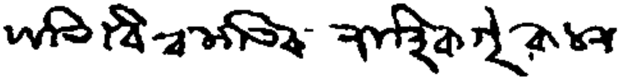

(পতি বিনু সতির নাহিক গুরুজন) ঢা. বি. আ. সং-৫৩১, পৃ. ৯১

২.

(চিত্রবিচিত্র রূপবেস সরির উপর) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৭ক

লু

১. 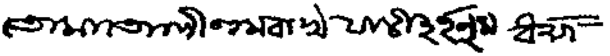

(তোমাতে সপীলুম বাপু য়াজী হইলুম ধর্ন্য) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৯২

২. 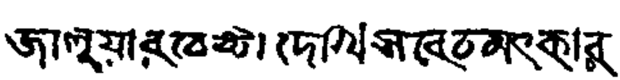

(জালুয়ার চেষ্টা দেখি সবে চমৎকার) ঢা. বি. পা. সং—২৯৯১, পৃ. ১২৫

শূ

১.

(শূলঃ স্বলংকৃতঃ ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ খ

ষু

১. 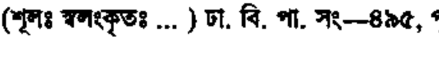

বিসসর্জ্জেনং পরিষুজ্য মহশ্বেরঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

২.

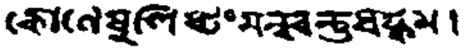

(কোলেষুশিষ্টং মন্বরন্তষট্‌কম্) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১খ

৩.

(বালা য়ঙ্গ দুতিএ হইল যুরচির) ঢা. বি. আ. সং-৫৩১, পৃ. ৯১

৪.

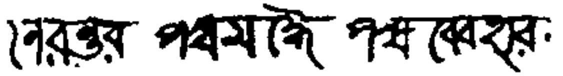

(নিরন্তর পম্নুমঙ্কে পম্নু বেবহার) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৭ক

সু

১.

(সুধাধারাভি বর্ষিণম) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক

২.

(জয়তৈনান্ সুদুর্বৃত্তান) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

৩.

(এথ সুনি নবিবর হইলা ছিৰ্স্তিত) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫ ক

৪.

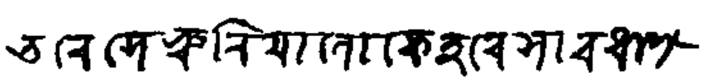

(তবে সে সুনিয়া লোকে হবে সাবধান) ঢা. বি. পা. সং—অপরিচায়িত।

৫.

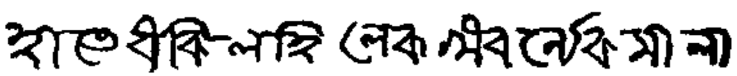

(হাতে ধরি লহিলেক সুবর্ণের মালা) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১ক

৬.

(ভয় পরিহরি আইস সুনরে অধম) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭৪, পৃ. ৪ক

—

১. 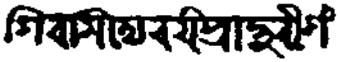

গিরমিত্যেবয়ং প্রাহুরীশং) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ ক

ঋ (ৃ)-কার

১. 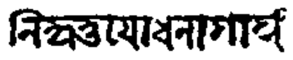

(নিকৃতুযোধনাগাশ্বং) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬

২

(উপকৃতা বিশ্বসৃষ্টির্হরি ...) রা. পা. সং—১৩৪১, পৃ. ২৫ক

৩.

(বন্দো কৃষ্ণ দাষ ঠাকুর) ঢা. বি. পা. সং—৫৬৭৫, পৃ. ৪ক

৪.

(মহাভ্যাং কৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত্ব) রা. পা. সং—১২১৬, পৃ. ১৭ক

৫.

(এথ শুনি দুই পক্ষি কৃপা মন হৈআ) ঢা. বি. পা. সং—২৩৭ পৃ. ৯২ক

৬.

(কৃষ্ণের মাত্র চাহিএ সন্তোষ) ঢা. বি. পা. সং—২৯৯১, পৃ. ১৩৭

৭. 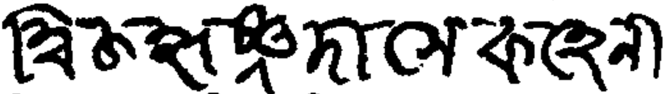

দ্বিজ কৃষ্ণ দাসে কহেলী..) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১খ

ঘৃ

১.

(নির্মল কস্তুন তনু ঘৃতের প্রতিমা) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৩খ

তৃ

১. 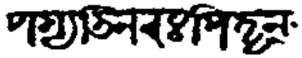

(পশ্যাতিনরঃ পিতৃন্) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৪ক

২.

(কতৃনাং সলৌ গ্রহণ সুত্তয়ার্থ) রা. পা. সং—৬১৬৭ পৃ. ১৭

৩. 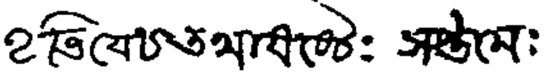

(তৃতিয়ে চ তথা ষষ্টেঃ সপ্তমেঃ) রা. পা. সং—৩২৪৭ পৃ. ৩খ

দৃ

১. 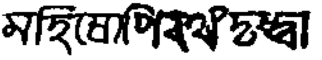

(মহিষোপিবথং দৃষ্টা) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

২. 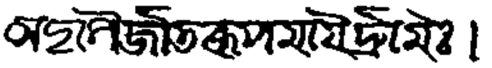

(সদৃশৈর্জাত রূপ মৱেদ্রর্মৈঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪ পৃ. ১৫২খ

ধৃ

১.

(কামার্থা ধৃত্যা ধারয়ো তের্জ্জুন) ঢা. বি. পা. পৃ. ৩৬

বৃ

১.

(দণ্ডোগচ্ছন্ শ্রিয়াবৃতঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ ক

ভৃ

১.

(নহিদেহভৃতা সক্যং ...) ঢা. বি. পা. পৃ. ৩৬খ

মৃ

১. 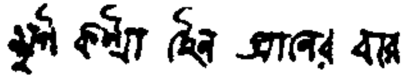

(মৃর্গ কর্ন্যা হৈল প্রানের বরি) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৪খ

শৃ

১.

(শৃণুভুপাল) ঢা. বি. পা. সং—৩২৩, পৃ. ৪৭খ

২.

(শৃঙ্গৈরঙ্গরোগণ সেবিতং) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২খ

৩. 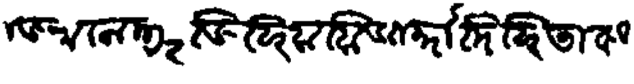

(জেখনে শৃজিছি সসি আজ্ঞা দিছি তার) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫কে

য (্য)-ফলা

ক্য

১.

(সুন যুব রাজ তুমি বাক্য দুই চারি) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৩ক

খ্য

১.

(তড়িঘোরম সংখ্যেয়ং জগর্জ্জ বিবিধা গিরঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ খ

২.

(খাস্তদ্বয়ং সমালিখ্য বহ্নি সংস্থং ক্রমেণহি) ঢা. বি. পা. সং—৮৫, পৃ. ৫খ

চ্য

১. 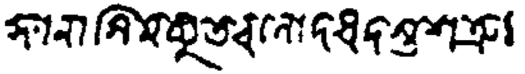

(জ্ঞানাসিমচ্যুত বলোদধদন্তশত্রু) রা. পা. সং—১৩৪১, পৃ. ২৪খ

২. 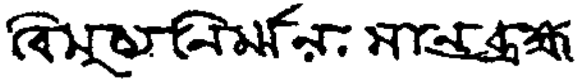

(বিমুচ্য নির্ম্মলঃ সাত্ত্বব্রহ্ম) ঢা. বি. পা. সং—অপরিচায়িতা পৃ. ৩৮

জ্য

১.

(পরিষুজ্যমহেশ্বরঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ খ

২.

(রাজ্যাং রাজ পুত্রস্য ধীমতঃ) ঢা. বি. পা. সং—৩২৩, পৃ. ৪৭খ

৩. 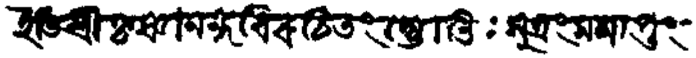

(ইতি শ্রীকৃষ্ণানন্দ বিরচিতং জ্যোতিঃ সুত্রং সমাপ্তং) রা, পা. সং—২০২, পৃ. ২৪খ

৪.

(কলাসারেন সংপূজ্য তর্পয়েত্তেন খেচরীং) ঢা. বি. পা. সং—১৯২, পৃ. ২৬৮ ক

৫.

(সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং..) রা. পা. সং—৩২৩২, পৃ. ১খ

৬.

(জ্যোতিঃ সাস্ত্রেষু ...) রা. পা. সং—২০১, পৃ. ১খ

৭.

(ইতি জ্যোতির্মঞ্জুরী সমাপ্তাঃ) রা. পা. সং—১০৮০, পৃ. ৫০এ

ত্য

১. 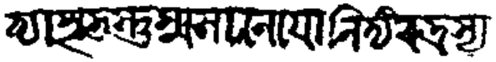

(ব্যাপৃতন্তু শ্মশানে যো নিত্যং রুদ্রস্য) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক

২.

(ইত্যুপক্রম্যবাপ্যা ...) রা. পা. সং—১২১৭, পৃ. ১৭ক

৩.

(স্ত্রীনাং প্রিয়তমো নিত্যংমত্তঃ) রা. পা. সং-১৩৪১, পৃ. ২৫ক

৪. 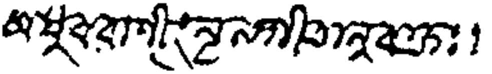

(মধুর বাণীং নৃত্য গীতানুবক্তঃ) রা. পা. সং—১১৬৯, পৃ. ১ক

৫.

(এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি ...) রা. পা. সং—২৬০, পৃ. ২৫খ

৬. 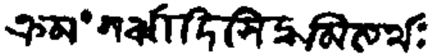

(ক্রমং সর্ব্বাদি সিদ্ধমিত্যর্থঃ) রা. পা. সং—১১৬৫, পৃ. ১৩খ

৭. 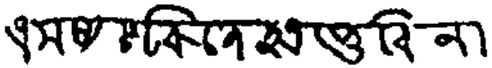

(এ সত্য করি জে দুএ ভুবিলা ...) ঢা. বি. আ. সং—১৫২

৮.

(সৈত্য বতি ধর্ন্য কৈর্ন্যা ধর্ন্য রার্জের্শ্বর) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১ক

৯.

(সমাগত্য কৃতঞ্চকিং) রা. পা. সং—২০২, পৃ. ১ খ

১০.

(ইত্যুষাযোগঃ) রা. পা. সং—২০২, পৃ. ৯খ

দ্য

১.

(যদ্যস্যবাহনিষিদ্ধং স্যাদ্যেন যত্র যতোনৃপ) রা. পা. সং—১৩৪১, পৃ. ২৫ক

২.

(গৌরী বিদ্যাথ গান্ধারী) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

ধ্য

১. 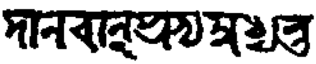

(দানবান্ প্রত্যমুধ্যস্ত) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ খ

ন্য

১. 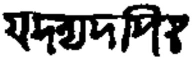

(যদন্যদপিক ...) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ ক

২.

(যথা বৎশূনুতান্যপিঃ) ঢা. বি. পা. পৃ. ৩৬

৩. 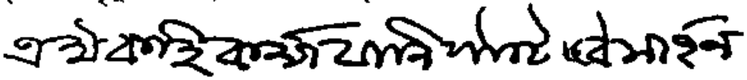

(এথ কহি কর্ন্যা য়ানি পাটে বসাইল) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৯২ক

৪.

(ভিন্য ছেদি খাও তথা নানা কতুহলে) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৫খ

প্য

১.

(দীনামপ্যত্তি) রা, পা. সং ১২১৬, পৃ. ১৭ক

ব্য

১.

(শক্রং কৃত্বা ব্যাপাশ্রয়ম) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ খ

ভ্য

১. 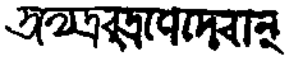

(অভদ্রেবদ্রণেদেবান্) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ খ

২.

(ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ নং তর্জনীভ্যাং ...) ঢা. বি. পা. সং—১৯২, পৃ. ৯১খ

৩. 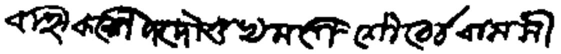

(বহ্নিরশি দদৌ তুভ্যমগি শৌর্বের্ববাসসী) রা. পা. সং—২৬০, পৃ. ২৫খ

৪.

(মহাভ্যা কৃতি হোম বিনিয়োগঃ) রা. পা. সং—১২১৬, পৃ. ১৭ক

৫. 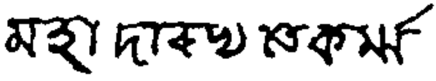

মহা দারুভ্য তে কর্ম্ম ...) ঢা. বি. পা. পৃ. ৩৬

স্য

১.

(তথাচমৎস্যপুরানেপি) রা. পা. সং-১২১৬. পৃ. ৯খ

হ্য

১. 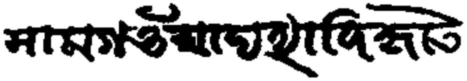

সামগ ওঁ অদ্যোহ্যাদিকৃতে ...) রা. পা. সং-১২১৬, পৃ. ১৭ খ

২

(সুরাঃ শস্ত্রানি গৃহ্যত) ঢা. বি. পা. সং-৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

র (্র)-ফলা

ক্র

১.

(চক্রবাশ্চগিরি শ্রেষ্ঠো ...) ডা. বি. পা. সং-১৪ পৃ. ১৫২খ

গ্র

১.

(অভিচার গ্রহোন্মাদান যন্ত্রমে) ঢা. বি. পা. সং-৪৬০৮. পৃ. ৮১ ক

২

(যাত্যগ্রেরাক্ষসোগ্রহঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক

ত্র

১. 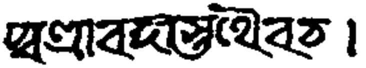

(পুত্রাবঙ্গাস্তথৈবচ) ঢা. বি. সং-১৪. পৃ. ১৫২খ

২ 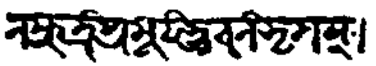

(নক্ষত্রং প্রমূঢ়ং ভুবনং ভৃশম্) ঢা. বি. পা. সং-৪৯৫. পৃ. ২৪৬ খ

দ্র

১.

(অভদ্রেবদ্রণে দেবান্ ভগবন্তশ্চ শঙ্করম্) ঢা. বি. পা. সং-৪৯৫. পৃ. ২৪৬ খ

প্র

১.

(মেধাকামেন হোতব্যং প্রসূনৈর্ব্রক্ষবৃক্ষজৈঃ) ঢা. বি. পা. সং-৪৬০৫, পৃ. ৮১ ক

২.

(অতিভংর্ত্তিমাগিলেন্ত প্রভুর গোছর) ঢা. বি. পা. সং-২১৫, পৃ. ৪৪৫ খ

৩.

(তুমি জান প্রভু জানে কি বুলীমু য়ার) ঢা. বি. আ. সং-৫৩১, পৃ. ৯২

শ্র

১.

(শ্রীকামো জুহুয়াৎ পদ্মৈঃ) ঢা. বি. পা. সং-৪৬০, পৃ. ৮১ ক

২. 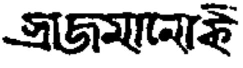

(শ্রীজমালোর্ক) ঢা. বি. পা. সং-১৪, পৃ. ১৫২খ

৩.

(ইতি শ্রীনারসিংহে ভূগোলঃ সমাপ্তঃ) ঢা. বি. পা. সং-৩২৩, পৃ. ৪৭খ

৪.

(শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণাভ্যানমঃ) ঢা. বি. পা. সং-৫৮৮৬, পৃ. ১

৫.

(শ্রী আচার্য্য চন্দ্র) ঢা. বি. পা. সং-৫৬৭৫, পৃ. ৪ক

৬.

(দেখিয়া লক্ষির কোপ হাসিলা শ্রীহরি) ঢা. বি. পা. সং-৬০৫৩, পৃ. ৩৪

স্র

১.

(মগধাশ্চ মহাস্রগাঃ) ঢা. বি. পা. সং-১৪, পৃ. ১৫২খ

হ্র

১. 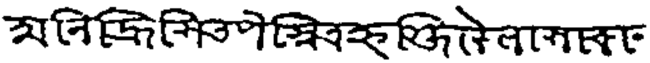

(মুনি হ্রিসি তপস্বিএ যুক্তি কৈলা সার) ঢা. বি. পা. সং-৬০২১, পৃ. ২৮ ক

২.

(সুনিলে দুঃখ পাইবে হ্রিদয়ে) বা. এ. পা. সং-২৭৬, পৃ. ১৩

ব-ফলা

ত্ব

১.

(দুর্ঘটত্বাদৈন্দ্রিয়কং তত্বদর্থ বিকল্পিতং) রা. পা. সং-১৩৪২, পৃ. ২৪খ

২.

(ঐকৈককশ্যেনানুপুর্ব্ব্যা ভুত্বা ভুত্বেহজায়তে) ঐ

৩.

(এষ আয়াতি সবিতা ত্বাং দিদৃক্ষুর্জগৎ পতে) রা. পা. সং-২০১, পৃ. ২৪

৪. 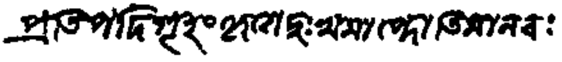

(প্রতিপদি গৃহং কৃত্বা দুঃখমাপ্লোতিমানবঃ) রা. পা. সং-২০২, পৃ. ২৪

৫.

(ইয়ং মুদ্রাক্ষুদ্রত্বাগরিষ বরং বিনা) ঢা. বি. পা. সং-৮৫, পৃ, ৫ক

৬.

(বিদ্যুত্বান্‌পর্বতঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২

ব

১.

(তথৈব তুড্রাঃ পৌন্ড্রাশ্চবামবুলাঃ) ঢা. বি. পা. সং-১৪, পৃ. ১৫২ খ

য

১. 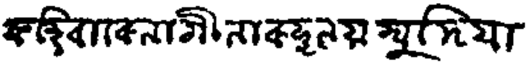

(কহিবারে লাগীলা রছুল সম্বুদিয়া) ঢা. বি. পা. সং-২১৫, পৃ. ৪৪৫ খ

২. 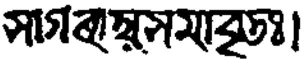

(সাগরাম্বসাবৃতঃ) ঢা. বি. পা. সং-১৪, পৃ. ১৫২ খ

শ

১. 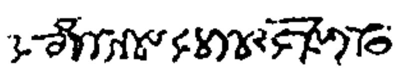

(অশ্বে ২ গজে ২ পদাতি ২) ঢা. বি. আ. সং-৩৫৩, পৃ. ২৪খ

২. 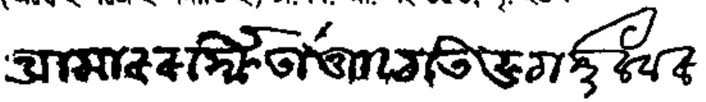

(আমার রক্ষিতা আচে তিজগ ইশ্বর) ঢা. বি. পা. সং-২১৫ পৃ. ৪৪৫ খ

৩.

(কারং যৎকৃতং বিশ্ব কর্ম্মণা) ঢা. বি. পা. সং-১৪, পৃ. ১৫২খ

৪. 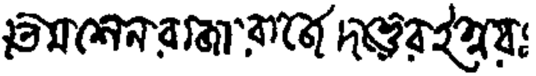

(ভিমশেন রাজা রার্জে দণ্ডের ইশ্বরঃ) ঢা. বি. পা. সং-৯৫, ঈ পৃ. ১

স্ব

১.

(পক্ষ স্বসাগবৈশ্য বাণঃ ...) রা. পা. সং-৩২১৭, পৃ. ১ক

২.

(স্বামিনোর্থৈকিং) ঢা. বি. পা. সং-৩২৩, পৃ. ৯৩ ক

৩.

(বিদ্যা স্বরূপাং জিহ্বাং ধ্যাত্বা জিহ্বা) ঢা. বি. পাং সং-৮৫, পৃ. ৫ক

৪.

(সরস্বত্যৈনমঃ) রা. পা. সং-৫৮১০, পৃ. / ৬৫ক

৫. 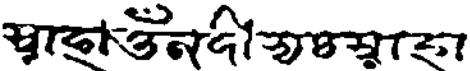

(স্বাহা ওঁ নদীভ্যঃ স্বাহা) রা. পা. সং-১২১৬, পৃ. ১৭ক

হ্ব

১. 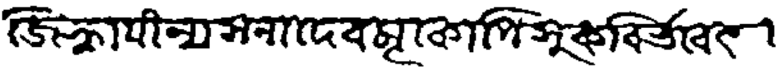

(জিহ্বায়াং ন্যাসনাদেব মূকোপি সুকবির্ভবেৎ) ঢা. বি. পা. সং-৮৫, পৃ. ৫ক

২.

(কেশিনীমিত্র সাহ্বয়া) ঢা. বি. পা. সং-৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

ত্ম

১.

(আত্মজায়াসুতাদীনামন্যেষাং সর্ব্বদেহিনাং) রা. পা. সং-১৩৪১, পৃ. ২৫ক

২.

(আত্মানমপরিচ্ছিন্ন বিভাব্য) ঢা. বি. পা. সং-১৯২, পৃ. ৪৬খ

দ্ম

১. 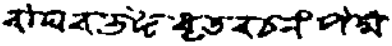

(রাঘব ভট্টাধৃতবাচনং পদ্মং) ঢা. বি. পা. সং-১৯২, পৃ. ৪৬ খ

ন্ম

১. 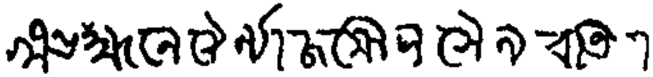

(সুভ ক্ষণে কৈন্যা জন্মিল সৈত্যবতি) ঢা. বি. পা. সং-২৮০৩, পৃ. ৪১ক

ম্ম

১. 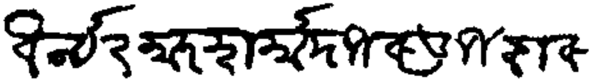

(ধন্য ২ মুহাম্মদ পর উপকার) ঢা. বি. পা. সং-২১৫, পৃ. ৪৪৫খ

যুক্তবর্ণ

ঙ্ক

১.

(শ্রীশঙ্কর উবাচ) রা. পা. সং-২০২৯, পৃ. ১ক

২.

(কুবেদৈর্ব্বিধায়াংঙ্ক যুগ্মোঃ) রা. পা. সং-৩২১৭, পৃ. ১ক

৩.

(সুঃ সূর্য্যা শঙ্কিতাঃ) ঢা. বি. পা. সং-৪৫২৩, পৃ. ১২৩ক

৪. 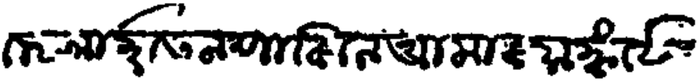

(দেখাইতে ন পারিলে আমার সঙ্কটে) ঢা. বি. পা. সং-২১৫, পৃ. ৪৪৫খ

৫.

(রত্ন য়লঙ্কার কন্যা দিব একসত) ঢা. বি. আ. সং-৫৩১, পৃ. ৯২

৬.

(পরিছে বিবিধ অলঙ্কার) ঢা. বি. আ. সং-৩৫৩, পৃ. ২৪খ

অ

১.

(তুমি শঙ্খ তুমি রাজা ...) ঢা. বি. পা. সং-২৯৫২৭

স

১.

(শ্রী গঙ্গা দাস শর্ম্মণঃ) রা. পা. সং-২০২

২.

(লিঙ্গানুশাসনং) রা. পা. সং-৬৭৩৯, পৃ. ১খ

৩.

(শুশ্রুষয়ানুষঙ্গেণ প্রাপ্তোহংব্রহ্মপুত্রতাং) রা. পা. সং-১৩৪১, পৃ. ২৫ক

৪.

(ভোজাঃ পাণ্ড্যাশ্চ বঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তামনিগুকাঃ) ঢা. বি. পা. সং-১৪, পৃ. ১৫২খ

৫.

(মৃদুবচন সুশীলঃ কোমলাঙ্গঃ সুকেশোবদতি) রা. পা. সং-১১৬৯, পৃ. ১

৬.

(তেষুকিং বালিখেঙ্গেববাসদেবঃ ...) রা. পা. সং-২০২৯. পৃ. ১ক

৭.

(তার সঙ্গে প্রেম করি হাসাল্যাম জগত) ঢা. বি. পা. সং-৩৬৭০, পৃ. ৩ক

৮.

(ধবল অঙ্গের পরে আরহন করি) ঢা. বি. পা. সং-২১৫, পৃ. ৪৪৫ খ

ঞ

১. 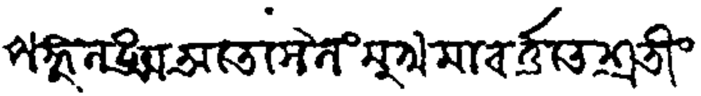

(পঙ্গু লজ্ঞঅতে সৈলং মুখমাবর্ত্ততে শ্রতীং) ঢা. বি. পা. সং-২৯৫২৭

ঞ্চ

১.

(শরচ্চন্দ্র নিভং সান্তং) ঢা. বি. পা. সং-৪৬০৮, পৃ. ৮১ক

২.

(উর্দ্ধ স্বরে করয়ে রোদন) ঢা. বি. পা. সং-৬১০২

জ্ঞ

১.

(দুষ্ট সব সংহারিতে প্রভু আজ্ঞা দিছে) ঢা. বি. পা. সং-২১৫, পৃ. ৪৪৫খ

২.

(আজ্ঞা দিছে নিরঞ্জনে নিধন করিতে) ঐ

৩. 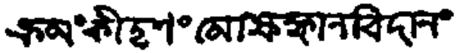

(ক্রমং কীদৃশং মোক্ষজ্ঞান বিদানং) রা. পা. সং-১১৬৫, পৃ. ৩১খ

৪.

(জ্ঞানাসিমচ্যুত বলোদধদন্ত শক্রঃ) রা. পা. সং—১৩৪১, পৃ. ২৪খ

৫.

(ধ্যাত্বাতম্মধ্যস্থ জ্ঞানাগ্নৌ জুহুয়াত) ঢা. বি. পা. সং-১৯২, পৃ. ৪৬খ

৬. 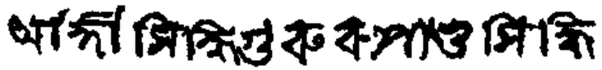

(আজ্ঞা সিদ্ধি গুরুর পাও সিদ্ধি) ঢা. বি. পা. সং-২৯৫২৭

৭.

(জ্ঞানায়ং তত্র প্রাচ্যাং দীপ শিখায়া) রা. পা. সং—১২১৬, পৃ. ১৭খ

৮.

(গুরু শ্রী রামের আজ্ঞা) ঢা. বি. পা. সাং—২৯৫২৭

৯.

(অজ্ঞান তিমিরান ধুভ্য জ্ঞানঞ্জন) ঢা. বি. পা। অপরিচায়িত।

ঞ্চ

১. 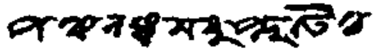

পঞ্চলক্ষং মধুপুতৈঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৯২, পৃ. ৯১খ

২.

(কাঞ্চন জিয়া কান্তি রসে যর ২) ঢা. বি. পা. সং-৬১০২

১.

(নিরঞ্জনে পাঠাইচে কারণে তুমার) ঢা. বি. পা. সং-২১৫, পৃ. ৪৪৫খ

২.

(আঞ্জনে রঞ্জিত আখি) ঢা. বি. পা. সং-৩৫৩, পৃ. ২৪খ

দ্দ

১. 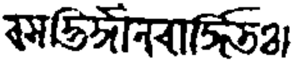

(বসন্তির্দ্দানবার্দ্দিতঃ) ঢা. বি. পা. সং-৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

২.

(অনেনাগ্নির্দ্দক্ষিনতঃ) রা. পা. সং-১২১৬, পৃ. ১৭ক

৩. 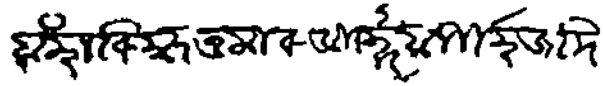

(সংহারিমু তুমার আর্দ্দেস পাই জদি) ঢা. বি. পা. সং-২১৫, পৃ. ৪৪৫খ

দ্ধ

১.

(বিক্রমে বুদ্ধিং মাবঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

২.

(কীদৃশং সুশুদ্ধং শোভন প্রকারেণ শুদ্ধং) রা. পা. সং—১১৬৫, পৃ. ৩১খ

৩. 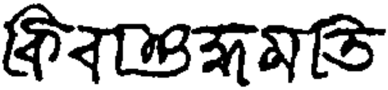

(কিবা শুদ্ধমতি) ঢা. বি. পা. সং—৩০০৯, পৃ. ৩খ

৪.

(সিতা উদ্ধারিল রাম রাবনের মারি) ঢা. বি. পা. সং-৬৩৬৪, পৃ. ১৩খ

৫.

(দসম দিনের জুর্দ্ধ হইল সমাপন) ঢা. বি. পা. অপরিচায়িত

ণ্ড

১.

(বৃক্ষ সাখা লই হস্তে করিলেক দণ্ড) ঢা. বি. আ. সং—২৩৭, পৃ. ৯৩

২.

(মেরুদণ্ডে লাতি দিয়া তুলিব সে নিন্দে) ঢা. বি. আ. সং—১৫২

ন্ত

১.

(ঘরে গীয়া দেখীলেন্ত খদিজা দুআরে) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫ক

স্ত

১. 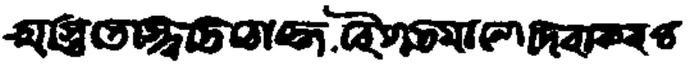

(স্বস্তিতেস্থিচোক্তে বৈপতমানো দিবাকরঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ৪৩ক

ন্দ

১.

(ওঙ্কারং বিন্দৌনাদেতং তত্ত্ব প্রাণে মহুত্যমুং) রা. পা. সং ১৩৪১, পৃ. ২৪খ

২.

(শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিরচিতং) রা. পা. সং—১২১৬, পৃ. ৯ক

৩. 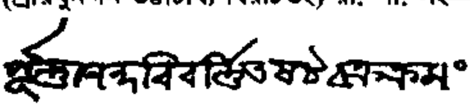

(পুর্ণ্নানন্দ বিবর্ণ্নিত ষটচক্র ক্রমং) রা. পা. সং—২১৬৫, পৃ. ৩১খ

৪.

(হেরি মোহা য়ানন্দিতে) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৯১

৫. 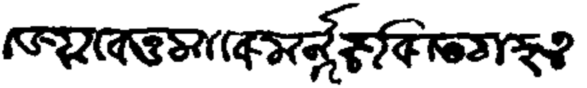

(জে সবে তুমারে মন্দ করিতে চাহএ) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫খ

৬. 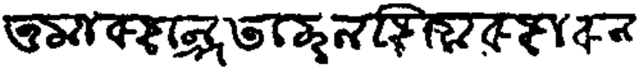

(তুমার কান্দত ছেল কিসের কারণ) ঐ

৭. 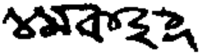

(জমকছন্দ) ঢা. বি. আ. সং—৫৩১, পৃ. ৭১

খ

১. 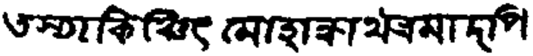

(তস্যা কিঞ্চিৎ মোহান্ধাথ ভ্রমাদপি) রা. পা. সং—১১৬৫, পৃ. ৩১খ

২. 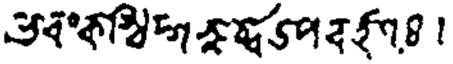

(ভবং কশ্চিদগন্ধর্ব্ব উপবর্হণঃ) রা. পা. সং—১৩৪১, পৃ. ২৫ক

৩.

(আর্জুনিসি সন্ধ্যাকালে এসব দেখাইলে) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫ ক

৪.

(সমাগুশ্চায়ং সপ্তকন্ধং) রা. পা. সং—১৩৪১, পৃ. ২৫খ

গ

১. 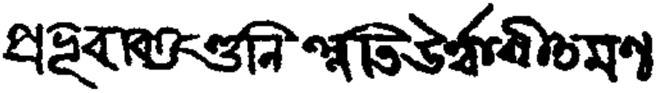

(প্রভুবাক্য শুনি অতি উল্লাশীত মন) ঢা. বি. পা. সং—৬০৫২, পৃ. ৩৪

২. 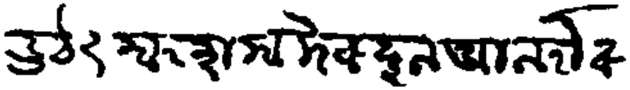

(উঠ ২ মুহাম্মদ রছুল আল্লার) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫খ

শ্চ

১.

(পাবিপাত্রশ্চপর্বতঃ) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২

২. 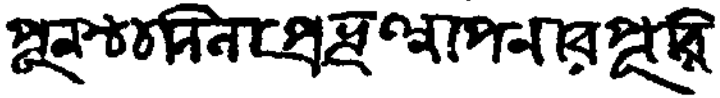

(পূনশ্চ চাঁলিলা প্রভু আপনার পুরি) ঢা. বি. পা. সং—৬০৫৩, পৃ. ৩৪

৩. 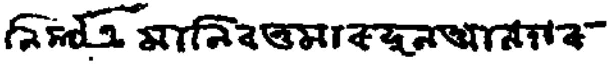

(নির্শ্চএ মানিব তুমা রছুল আল্লার) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫ক

জ্যা 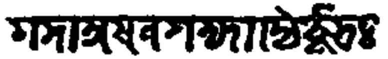

(গদামুষল শক্ত্যাদ্যৈর্বৃতঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

গ্জ্যা

(প্রাগ্জ্যোতিষপু ...) ঢা. বি. পা. সং—১৪, পৃ. ১৫২খ

ষ্টা

(ততস্তদ্দরুণং দৃষ্ট্বা ক্ষুভিতঃ শঙ্করস্তদা) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

ধ্রু

(ন হি তস্য পতিংধ্রুবা) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

ষ্ট

১.

(ইষ্টদেব্যা চরণার বিন্দে অবশ্যং ...) রা. পা. সং—১১৬৫, পৃ. ৩১খ

২.

(অষ্টাদশ পুরাণানি তথাচোপুরাণকং) রা. পা. সং—২০২৯, পৃ. ১ক

৩.

(দুষ্ট সবে নানামতে কহএ কপটে) ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪৫খ

৪.

(তং বিলোক্য জনা দুরাতে জসামুষ্ট দৃষ্টয়ঃ) ঢা. বি. পা. সং—২৫৯৮

৫. 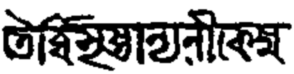

(তৈর্ব্বিসৃষ্টান্যনীকেষু) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

ঠ

১.

(অত্যর্থং নৃত্যতি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ) রা. পা. সং—১১৬৫, পৃ. ৩১খ

২.

(পরিতোহং মুনি শ্রেষ্ঠ ...) ঢা. বি. পা. সং—৩২৩, পৃ. ৪৭খ

৩.

(ওঁ ক্রীং ঘং দুর্গায়ৈ কনিষ্ঠাভ্যাং ...) ঢা. বি. পা. সং—১৯২. পৃ. ৪৬খ

শতাব্দী অনুযায়ী কৃষ্ণ শব্দ

১.

(ক্রিয়মানন্ততঃ কৃষ্ণমিদম্বনেমব্রবীৎ) ঢা. বি. পা. সং—১৪৮ খ, (১৪৬৬ খ্রি.)

২. 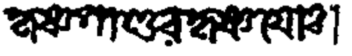

(কৃষ্ণপাণ্ডব কৃষ্ণয়োঃ) ঢা. বি. পা. সং—২৩৯৭, পৃ. ৭৬খ (১৪৯৯ খ্রি.)

৩. 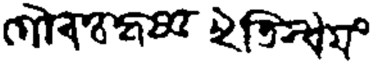

(গৌরঃ কৃষ্ণ ইতিস্বয়ং) ঢা. বি. পা. সং—৪৫১৮, পৃ. ৮৬ক (১৫৭২ খ্রি.)

৪.

(শ্রী কৃষ্ণায় সংসার মহীরুহস্য বীজায়) ঢা. বি. পা. সং—৫২৫ উ পৃ. ১ (১৬৯৪ খ্রি.)

৫. 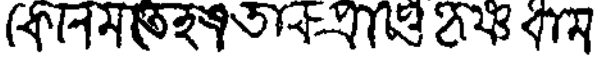

(কোন মতে হএ তার প্রাপ্তি কৃষ্ণ ধাম) ঢা. বি. পা. সং—৩০০৯, পৃ. ৭ (১৭৫৯ খ্রি.)

৬.

(সানন্দ মানন্দ আর কৃষ্ণ দাস ভাই) ঢা. বি. পা. সং—৬৭, পৃ. ৭ক (১৭৬৫ খ্রি.)

৭. 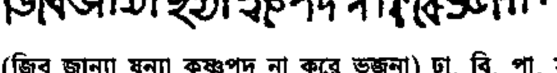

(জিব জান্যা মুন্যা কৃষ্ণপদ না করে ভজনা) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৫৬, পৃ. ১খ (১৭৮০ খ্রি.)

৮.

(শ্রীকৃষ্ণ রাম মীস হরি ...) ঢা. বি. পা. সং—২৮৮২, পৃ. ৫০খ (১৭৯২ খ্রি.)

৯.

(কৃষ্ণ প্রণমিয়া দেবি করেণ স্তবন) ঢা. বি. পা. সং—৬০৫৩, পৃ. ৩৪ (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ)

১০.

(বৈকণ্টেতে কৃষ্ণ পিবা করি মহাধির) ঢা. বি. পা. সং—২৯৫৫৪, পৃ. ৫৯৫ (১৮০০ খ্রি.)

১১.

(কৃষ্ণ পরে বন্ধু নাহি ত্রিজগতে আর) ঢা. বি. পা. সং—৩১১৬, পৃ. ২৩ক (১৮০০ খ্রি.)

১২.

(কৃষ্ণ জিবনে কহে করিয়া পরিহার) ঐ

১৩. 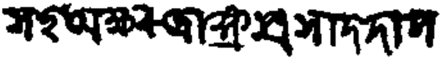

(সহঅক্ষর শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদদাস) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৮১, পৃ. ১৩ (১৮০৯ খ্রি.)

১৪. 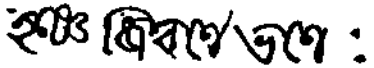

(কৃষ্ণ জীবনে ভনেঃ) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭১, পৃ. ৩৯ (১৮১০ খ্রি.)

১৫.

(কৃষ্ণ পাদপদ্ম বিরহ দেয় ভাবিয়া) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭৬, পৃ. ২৯খ (১৮১১ খ্রি.)

১৬.

(কৃষ্ণঃসনে আমি তোমা রাখীব জতনে) ঐ পৃ. ২০খ

১৭.

(হরসিতে কৃষ্ণার্জ্জুন করি আলিঙ্গন) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭৫, পৃ. ১০খ (১৮১২ খ্রি.)

১৮.

(কৃষ্ণ প্রণমিয়া গেলা জননি সদন) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭৩, (১৮১৩ খ্রি.)

১৯.

(কৃষ্ণ নাম বলি পিতা দিলেক আমায়) ঢা. বি. পা. সং—৩১১৫, পৃ. ৪২ক, (১৮১৪খ্রি.)

২০.

(কত বল রহিতে নারিবে কৃষ্ণবিনু) ঢা. বি. পা. সং—৩৬৭০, পৃ. ৩খ (১৮২৭ খ্রি.)

২১.

(কৃষ্ণানুরাগ হৃদয়ে জ্ঞেয়ো ভাগবতোত্তমঃ) রা. পা. সং—৫৭৬৩, পৃ. ১৭খ (১৮২৯ খ্রি.)

২২.

(কৃষ্ণহ বলি ডাকে ঃ) ঢা. বি. পা. সং—৬৩৩২, (১৮৪২ খ্রি.)

২৩.

(কৃষ্ণকে প্রণাম করি সব দেবগণ) ঢা. বি. পা. সং—২৮০৩, পৃ. ৪১খ (১৮৫৩ খ্রি.)

২৪.

(শ্রী শ্রী কৃষ্ণঃ) ঢা. বি. পা. সং—৫৬৯৭; পৃ. ১ (১৮৫৮ খ্রি.)

২৫. 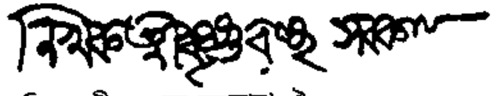

(লিখক শ্রীকৃষ্ণ বসু সরকার) ঐ

২৬. 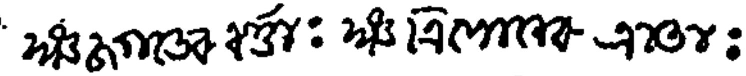

(কৃষ্ণ জগতের কর্ত্তা ঃ কৃষ্ণ ত্রিলোকের ত্রাতাঃ) ঢা. বি. পা. সং—৬৫৮৩, পৃ. ৩খ (১৮৫৯ খ্রি.)

২৭. 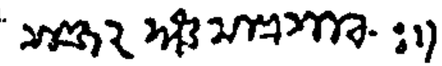

(সত্ত ২ কৃষ্ণ মাত্র সার) ঐ পৃ. ২ক

২৮.

(শ্রী শ্রীকৃষ্ণ। গোচিৎসা) ঢা. বি. পা. সং—৫৬৩৯., পৃ. ১ (ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ)

২৯. 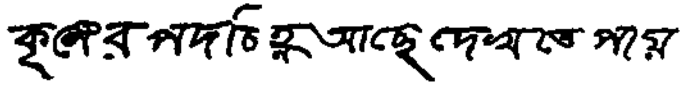

(কৃষ্ণের পদচিহ্ন আছে দেখতে পায়) ব্যক্তিগত সংগ্রহ, পিরোজপুর, (উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ)

৩০.

(কৃষ্ণ গুণ গায়ে মুখেতে ঐ

প্রভু

১.

(মহাপাত্রেরে মহাপ্রভু করিলা বিদায়) ঢা. বি. পা. সং—৬১৮২, পৃ. ১৯৯ক

২

(প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডম্বুরা বাজায়) ঢা. বি. পা. সং—৫৯৯৩. পৃ. ৪৮ ক

এরূপ অসংখ্য যুক্তবর্ণ পাণ্ডুলিপির পত্রগুলিকে জটিল করে রেখেছে। যেহেতু যুক্তবর্ণ তৈরি করা সেকালের পণ্ডিতদের ছিল বৈশিষ্ট্য সেহেতু শুধু 'বর্ণমালার' সঙ্গে পরিচিত হলেই পাণ্ডুলিপি পাঠ সম্ভব নয়। একটা বর্ণ অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কতটুকু বিকৃতি ঘটেছে প্রতিটি বর্ণ ধরে তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে হবে।

ঝ. একই পাণ্ডুলিপিতে একই বর্ণ বা শব্দের ভিন্নরীতি

পাণ্ডুলিপির লিখনরীতি কোন বাঁধাধরা নিয়মে কখনো আবদ্ধ ছিল না। তাই এক শতাব্দীতে এক রীতি, অন্য শতাব্দীতে অন্য রীতির প্রচলন ছিল—পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে একথা বলার কোন অবকাশ নেই। মানুষের জ্ঞান ও রুচি অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন রীতির ব্যবহার। দেখা গেছে কোন কোন বর্ণ কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে পরপর কয়েক শতাব্দী ধরে লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে। আবার কোন কোন বর্ণ এক শতাব্দী থেকে পরবর্তী শতাব্দীতে লিখিত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতিতে। এমনও দেখা যায় যে, কোন কোন বর্ণ বা শব্দ একই শতাব্দীতে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন আকৃতিতে লিখিত হয়েছে। আবার একই পাণ্ডুলিপিতে কোন কোন বর্ণ বা শব্দের একাধিক আকৃতির লিখন-রীতি পরিদৃষ্ট। যেমন—

(ক)

(কপলাবণ্যজ্জত ...) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭১, পৃ. ৪৯ক

(খ) 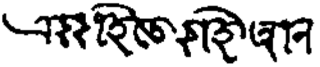

(এককহিতে কহি আন ...) ঐ

উক্ত উদাহরণ দুটি একই পাণ্ডুলিপির একই পত্র থেকে গৃহীত হয়েছে। উদাহরণ দুটির 'ক' বর্ণটি লিখিত হয়েছে দুই আকৃতিতে। এরূপ দুই আকৃতির 'ক' পাণ্ডুলিপিটির সর্বত্রই দৃষ্ট হয়।

১. রূপ ...

(ক)

(এতহান বলরাম কৃষ্ণর বচন) ঢা. বি. পা. সং—৬০৫৩

(খ)

(ভকতের ইচ্ছায় কৃষ্ণর জত কর্ম্ম) ঐ

উক্ত পংক্তি দুটি ৬০৫৩ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ৩৪ নম্বর পত্রের অন্তর্গত। এখানেও একই পাণ্ডুলিপিতে দুই আকৃতির 'কৃষ্ণ' শব্দ লিখিত হয়েছে।

(ক)

(গতি নাহি কৃষ্ণবিনে) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭১

(খ)

(সুন সুন কৃষ্ণ ভগবান) ঐ

(গ) 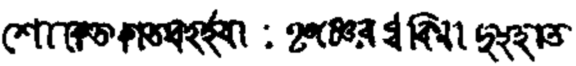

(শোকেত কাতর হইয়া কৃষ্ণের ধরিলা দুই হাত) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭১

উক্ত উদাহরণ তিনটি ৩২৭১ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ৪৯ক পৃষ্ঠার। এখানে কৃষ্ণ শব্দটি একই পত্রে লিখিত হয়েছে তিন আকৃতিতে।

(ক) 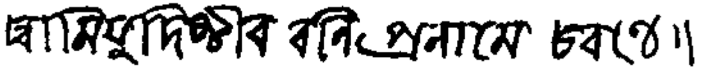

(আমি যুধিষ্টীর বলি প্রণামে চরণে) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭৩

(খ)

(যুধিষ্টীর বোলে তবে করি নিবেদন) ঐ

উক্ত পংক্তি দুটি ৩২৭৩ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ৩৪ক পত্রের অন্তর্ভুক্ত। এখানে যুধিষ্টীর শব্দের 'যু' বর্ণটি লিখিত হয়েছে দুটি পংক্তিতে দুই রীতিতে। অর্থাৎ একই পত্রে দুই প্রকার লিখন রীতির ব্যবহার।

(ক) 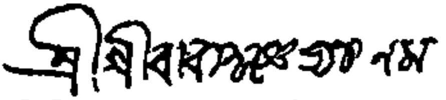

(শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণভ্যাংনম) ঢা. বি. পা. সং—৫৬৭৫

(খ) 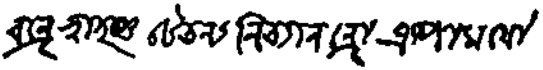

(বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দো কৃপাময়ো) ঐ

(গ)

(শ্রীকৃষ্ণ চৈতৈন্য নিত্যানন্দ অবতারে) ঐ

এখানেও একই পত্রে 'কৃষ্ণ' শব্দ লিখনে ব্যবহৃত হয়েছে তিনটি লিখন রীতি। উক্ত পংক্তি তিনটি ৫৬৭৫ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ১ক পৃষ্ঠার অন্তর্গত।

(ক)

(অর্ঘ্যপাদ্যাসনৈরাজাতমভ্য) ঢা. বি. পা. সং—৩২৩

(খ) 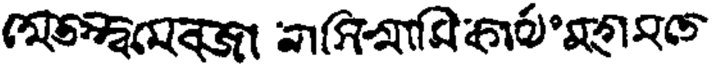

(অন্তস্তমেবজানাসিস্বামি কার্য্যং মহামতে) ঐ

এখানে একই পাণ্ডুলিপির একই পত্রে 'অ' বর্ণটি লিখিত হয়েছে দুই রীতিতে। ৩২৩ সংখ্যক পাণ্ডুলিপির ৯৩ক পত্রেই শুধু নয়, এরূপ দুই রীতির ব্যবহার এ পাণ্ডুলিপিটির সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়।

কেবলমাত্র একই পাণ্ডুলিপি বা একই পত্রে নয়, একই পংক্তিতেও একাধিক রীতির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যেমন—

(ক)

(শবর্ব শন্য শঙ্গে কৃষ্ণ রহিলা বাহিরে) ঢা. বি. পা. সং—৬০৫৩

৬০৫৩ সংখ্যাক পাণ্ডুলিপির ৩৪ পত্রের উক্ত পংক্তিতে 'র' বর্ণটি লিখিত হয়েছে দুই রীতিতে।

(খ)

(সুন সুন কৃষ্ণ ভগবান) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭১, পৃ. ৪৯ক

এখানে 'সু' বর্ণটি লিখনে ব্যবহৃত হয়েছে দুটি আকৃতি। অর্থাৎ একই পংক্তিতে দুই রীতির ব্যবহার।

(গ)

(অর্শ্ব গজপদাতি জথেক সন্য) ঢা. বি. পা. সং—৩৫৩, পৃ. ২৩খ

এ উদাহরণটিতে 'জ' বর্ণটি লিখিত হয়েছে দু'রকম আকৃতিতে।

এরূপ একই পাণ্ডুলিপিতে একই বর্ণ বা শব্দের ভিন্ন রীতির ব্যবহার প্রচুর দৃষ্ট হয়। কাজেই একটি বর্ণের একটি লিখন রীতি দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় যে অমুক রীতি অমুক শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য।

ঞ. একই আকৃতির ভিন্নার্থক বর্ণ ও শব্দ

অনেক সময় পাণ্ডুলিপিতে একই আকৃতিতে লিখিত বর্ণ বা শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। পাণ্ডুলিপির এই লিখন রীতিও কোন শতাব্দীর বিবর্তন—ধারায় আবদ্ধ নয়। সম্ভবত লেখকের জ্ঞান বা শিক্ষাই এর মুখ্য কারণ। অনেক সময় এক শতাব্দীর কোন কোন বর্ণের সঙ্গে অন্য শতাব্দীর অন্য কোন বর্ণের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এক শতাব্দীতে ই, উ, কু, কৃ, ল, ন, র প্রভৃতি বোঝাতে যে আকৃতির চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে অন্য শতাব্দীতে হয়তো সেই আকৃতির চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হয়েছে অ, ভু, কৃ, ভৃ, প, ল, ব কিংবা অন্য কিছু। যেমন—

(ক) 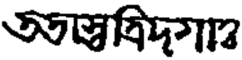

(ততস্তেত্রিদশাঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ খ (পঞ্চদশ শতাব্দী)

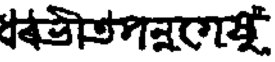

(ধরভীতপন্নগেষু) রা. পা. সং—১১০৫, পৃ. ১খ (ঊনবিংশ শতাব্দী)

উপর্যুক্ত উদাহরণের প্রথমটির 'শ' এবং দ্বিতীয়টির 'গ' একই আকৃতির। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর 'শ' এবং উনবিংশ শতাব্দীর 'গ' লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে।

(খ)
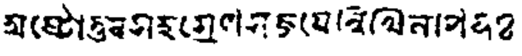

(অষ্টোত্তব সহস্রেণ সজয়েন্নিখিলাপদঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক (১৪৩৯ খ্রি.)

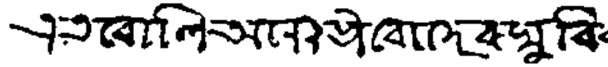

(এত বোলি অনেক প্রবোদে রঘু বির) ঢা. বি. পা. সং—২৮৮২, পৃ. ৫০ক (১৭৯২ খ্রি.)

(সে বলে কৃষ্ণে মঙ্গল) ঢা. বি. পা. সং—৬৩৩২, পৃ. ৪খ (১৮৪২ খ্রি.)

উপরোদ্ধৃত প্রথম উদাহরণের 'ণ' এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় উদাহরণের 'ল' বর্ণ একই আকৃতির। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর 'ন' এবং অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর 'ল' বর্ণ লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে।

(গ)
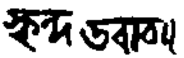

(স্কন্দ উবাচ ॥) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ (১৪৭১ খ্রি.)

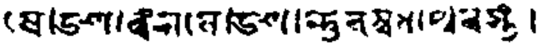

(ষোড়শাবংস ষোড়শান্ত বসুধা পুরস্তং) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮১ক (১৪৩৯ খ্রি.)

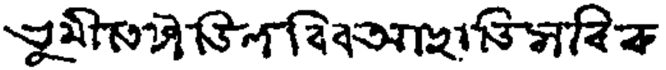

(ভূমীতে পড়িল বির আছাড়ি সরির) ঢা. বি. পা. সং—২৮৮২, পৃ. ৫০ক (১৭৯২ খ্রি.)

উক্ত উদাহরণগুলির প্রথমটির 'উ' বর্ণ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির 'ড়' বর্ণ একই আকৃতির। অর্থাৎ একই আকৃতির ভিন্নার্থক বর্ণ লিখিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

(ঘ)
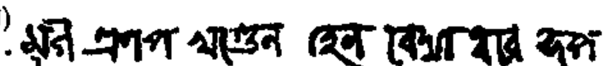

(মৃগ শাপ খণ্ডিল হেন বিদ্যাধরি রূপ) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১০খ (উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)

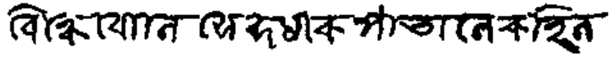

(বিন্ধে বোলে সে কুমার পাতালে রহিল) আ. ক. সং—২৩৭, পৃ. ৯৭ (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ)

এখানে প্রথম উদাহরণের 'ন্ধ' বর্ণ এবং দ্বিতীয় উদাহরণের 'কু' একই আকৃতির, অর্থাৎ দুই শতাব্দীর দুই পাণ্ডুলিপিতে একই আকৃতির ভিন্নার্থক বর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে।

(ঙ)

(ঋষয়শ্চাপি দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বাভুজগাস্তথা) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ক (১৪৭১ খ্রি.)

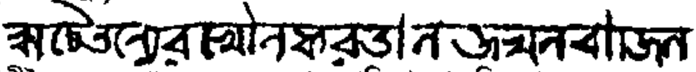

(শ্রীচৈতন্যের খোল করতাল জখন বাজিল) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৮৬, পৃ. ১ (অষ্টাদশ শতাব্দী)—

উক্ত উদাহরণ দুটির 'ঋ' এবং 'শ্রী' একই আকৃতির। অর্থাৎ প্রথম উদাহরণের পঞ্চদশ শতাব্দীর 'ঋ' এবং দ্বিতীয় উদাহরণের অষ্টাদশ শতাব্দীর 'শ্রী' একই আকৃতিতে লিখিত হয়েছে।

(চ)

(জে কারণে আমার তুমি বহুত উপকার) বা এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১০

(আকাশ পাতাল ভুমি দেবনাগ নর) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৮৮, পৃ. ৯

এ উদাহরণ দুটির প্রথমটির 'উ' এবং দ্বিতীয়টির 'ভু' বর্ণ লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে।

(ছ) 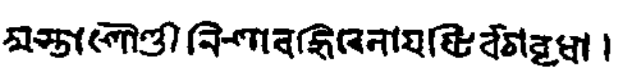

(মুস্তা শৌণ্ডী নিশা বহ্নি বেলা যষ্টির্বচাবৃষা) ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, পৃ. ৮৯খ, (১৪৩৯ খ্রি.)

(অথ বাস্তুযাগ প্রমাণ) রা. পা. সং—১২১৬, পৃ. ৯ক (সপ্তদশ শতাব্দী)

উক্ত উদাহরণ দুটির প্রথমটির 'মু' বর্ণ এবং দ্বিতীয়টির 'অ' বর্ণ লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে রীতিতে 'মু' বর্ণ লিখিত হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীতে সেই রীতিতে লিখিত হয়েছে 'অ' বর্ণ। এমনি করে সপ্তদশ শতাব্দীর অন্য কোন পাণ্ডুলিপিতে অন্য কোন বর্ণ হয়ত লিখিত হয়েছে এই 'অ' বর্ণের আকৃতি বা রীতিতে। বিভিন্ন শতাব্দীর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এমনি একই আকৃতির ভিন্নার্থক শব্দ বা বর্ণের ব্যবহার প্রচুর পরিলক্ষিত হয়।

শুধু বিভিন্ন শতাব্দীই নয়, কখনো কখনো একই শতাব্দীর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতেও একই আকৃতির ভিন্নার্থক বর্ণ বা শব্দের ব্যবহার পরিদৃষ্ট। এমনকি একই পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন পত্রে কিংবা একই পত্রে একই আকৃতির ভিন্নার্থক বর্ণ বা শব্দের লিখন রীতির অসংখ্য পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেমন—

(ক)

(এতেক কহিয়া কৃষ্ণ বিদায় হইয়া) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭১, পৃ. ৪৯

(কুন্তিদেবি এই কইয়া) ঐ

এখানে একই পাণ্ডুলিপিতে কু ও কৃ বর্ণ দুটি অবিকল একই রূপে লিখিত হয়েছে। প্রথম উদাহরণের কৃষ্ণ শব্দের 'কৃ' এবং দ্বিতীয় উদাহরণের কুন্তি শব্দের 'কু' বর্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

(খ)

(আপনাতে আছে স্বামি বিচারি ভুবন) ঢা. বি. পা. সং—২৩৭, পৃ. ৯৩

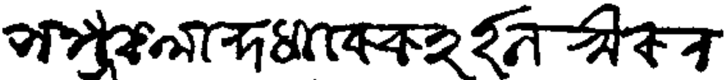

(স্বপ্ন কথা কুমারের হইল স্মরণ) ঐ

উক্ত উদাহরণদুটির 'স্ব' এবং 'স্ম' বর্ণ দুটি লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে। অর্থাৎ প্রথম উদাহরণের 'স্বামী' শব্দের 'স্ব' এবং দ্বিতীয় উদাহরণের 'স্মরণ' শব্দের 'স্ম' বর্ণ দুটি ভিন্নার্থক হলেও ধারণ করেছে একই আকৃতি।

(গ)

(চতুর্থে দ্বাদশে চন্দ্রেন কুর্য্যাদ্রাহুদর্শনং) রা. পা. সং—২০২, পৃ. ২৩ক

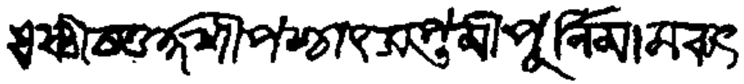

(ষষ্ঠী চতুৰ্দ্দশী পশ্চাৎ সপ্তমী পূর্ণিমা মরুৎ) ঐ

এখানে প্রথম উদাহরণের 'কূর্য্যাৎ' শব্দের 'কু' এবং দ্বিতীয় উদাহরণের 'চতুৰ্দ্দশী' শব্দের 'দ্দ' এই ভিন্নার্থক বর্ণ দুটি লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে।

(ঘ)

(কুন্তির করুনা তাহে সুনিয়া জনার্দ্ধন) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭১, পৃ. ৪৯

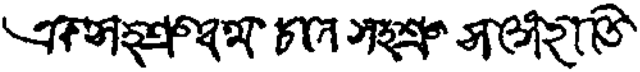

(এক সহস্র রথ চলে সহস্র সঙ্গে হাতি) ঐ পৃ. ৭০

এখানে প্রথম উদাহরণের 'কুন্তি' শব্দের 'কু' ও 'জনার্দ্ধন' শব্দের 'দ্ধ' বর্ণ এবং দ্বিতীয় উদাহরণের 'সঙ্গে' শব্দের 'ঙ্গ' বর্ণ তিনটি ভিন্নার্থক অথচ লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে।

(ঙ)

(কৃত্তায়ুধমহারথম্) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫ পৃ. ২৪৬খ

(দেবানাং বিমুখং বভৌ) ঐ

উক্ত উদাহরণ দুটিতে 'য়ু' এবং 'মু' লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে। অর্থাৎ প্রথম উদাহরণের 'কৃত্তায়ুধ' শব্দের 'য়ু' এবং দ্বিতীয় উদাহরণের 'বিমুখং' শব্দের 'মু' বর্ণ দুটি একই আকৃতির।

(চ)

(অপতদ্দৰ্ভভুয়িষ্ঠং মহদ্রুমবনং যথা) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ খ

(কুরুধ্বং বিক্রমে বুদ্ধিং মা বঃ) ঐ

উক্ত পাণ্ডুলিপির 'দ্দ' এবং 'কু' বর্ণ দুটি একই আকৃতির। অর্থাৎ প্রথম উদাহরণের 'অপতদ্দৰ্ভ'-র 'দ্দ' এবং দ্বিতীয় উদাহরণের 'কুরু'র 'কু' বর্ণ দুটি ভিন্নার্থক কিন্তু লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে।

শুধু দুটি পংক্তি বা একাধিক ভিন্ন পংক্তিতেই নয়, একটি পংক্তিতেও একই আকৃতির একাধিক ভিন্নার্থক 'বর্ণ' লিখিত হয়েছে। যেমন—

(ছ) 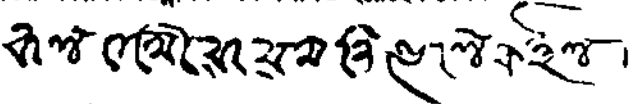

(রূপ দেখীয়া য়মনি ভুলি রইল।) ঢা. বি. পা. সং—অপরিচায়িত।

এ পংক্তিটিতে 'প' ও 'ল' একই আকৃতির। অর্থাৎ 'রূপ' শব্দের 'প' এবং 'ভুলি' ও 'রইল' শব্দের 'ল' বর্ণ দুটি লিখিত হয়েছে অবিকল একই আকৃতিতে।

(জ) 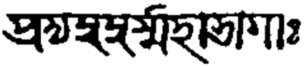

(প্রত্যদ্যযুর্শ্বহাভাগাঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬ খ

এ উদাহরণটিতে 'দ্য' এবং 'যু' এই ভিন্নার্থক বর্ণ দুটি লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে।

(ঝ) 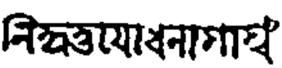

(নিকৃন্তযোধনাগাশ্বং) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

এখানে 'গ' এবং 'শ' বর্ণ দুটি ভিন্ন হলেও লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে।

(ঞ) 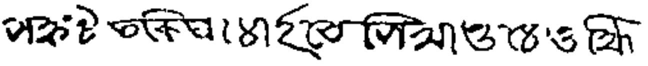

(সঙ্কট তরিআ জাইতে সিখাও জে তুম্বি) ঢা. বি. পা. সং—২৩৭, পৃ. ৯২

উক্ত উদাহরণের 'ও' এবং 'তু' বর্ণটি লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে। এ পাণ্ডুলিপির সর্বত্রই এই লিখন রীতি ব্যবহৃত হয়েছে।

(ট) 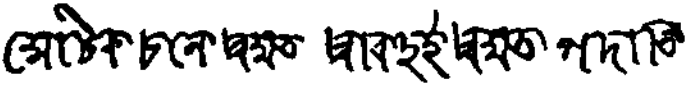

(ঘোটক চলে অযুত আর দুই অযুত পদাতি) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭১, পৃ. ৭০খ

এখানে 'ঘোটক' শব্দের 'ঘ' এবং 'অযুত' শব্দদ্বয়ের 'যু' লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে।

(ঠ)

(সঙ্গেজত ধনুর্দ্ধর) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭১, পৃ. ৭০খ

উক্ত উদাহরণের 'সঙ্গে' শব্দের 'ঙ্গ' এবং 'ধনুর্দ্ধর' শব্দের 'দ্ধ' বর্ণ দুটি অনেকটা একই আকৃতিতে লিখিত হয়েছে।

(ড)
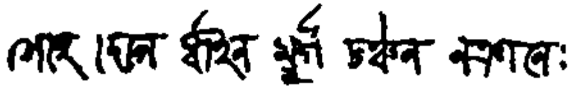

(সেহি দিগে ধাইল মৃগ চঞ্চল নঞানে) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১০ক

উক্ত পাণ্ডুলিপির সর্বত্রই 'ল' ও 'ন' বর্ণ দুটি লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে। যেমন—'ধাইল' ও 'চঞ্চল' শব্দদ্বয়ের 'ল' এবং 'নঞানে' শব্দের 'ন' বর্ণ অবিকল একই আকৃতির।

(ঢ)

(মাউতের ঘোড়ার মুখে রক্তপড়ে ধারে) ঐ

এখানেও 'ঘ' ও 'মু' বর্ণ দুটি লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে। এ লিখন রীতি পাণ্ডুলিপিটির সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

(ণ)

(আজ্ঞা পাইয়া উঠিয়া ডাগুইল জোর কবে) ঢা. বি. পা. সং—৫৮৮৮, পৃ. ৯

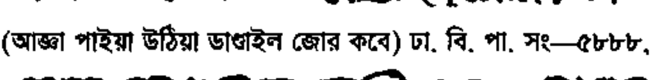

(আকাস পাতালভুমি দেবনাগনর) ঐ

উক্ত পাণ্ডুলিপিটিতেও একই আকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ লিখিত হয়েছে। যেমন—প্রথম উদাহরণের 'উঠিয়া' শব্দের 'উ' এবং দ্বিতীয় উদাহরণের 'ভুমি' শব্দের 'ভু' বর্ণ দুটি অবিকল সমাকৃতি বিশিষ্ট।

(ত)

(বিক্রমে বুদ্ধিং মা বঃ কাচিদ্ব্যথা ভবেৎ) ঢা. বি. পা. পৃ. ২৪৬ খ

এখানে 'দ্ধ' এবং 'দ্ব' বর্ণ দুটি ভিন্নার্থক অথচ লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে।

(থ)
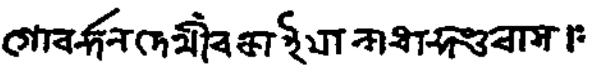

(গোবর্দ্ধন দেখীব জাইয়া রাধা কুণ্ডবাস) ঢা. বি. পা. সং—৩০০০, পৃ. ৩ক

উক্ত উদাহরণে 'গোবর্দ্ধন' শব্দের 'দ্ধ' বর্ণ এবং 'কুণ্ড' শব্দের 'কু' বর্ণ লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে।

(দ)

(ওঙ্কারং বিন্দৌ নীদেতং তত্ত্ব প্রাণে মহত্যমুং) রা. পা. সং—১৩৪১, পৃ. ২৪খ

উক্ত পাণ্ডুলিপির সর্বত্রই 'র' এবং 'ব' বর্ণটি লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে। অর্থাৎ 'ওঙ্কারং' শব্দের 'র' এবং 'বিন্দৌ' শব্দের 'ব' বর্ণ দুটি অভিন্নাকৃতির।

শুধুমাত্র একই আকৃতির দুটো বর্ণের ব্যবহারই নয়, একই আকৃতির ভিন্নার্থক দুয়ের অধিক বর্ণের ব্যবহারও হয় পরিলক্ষিত। যেমন—

(ক)

(i)

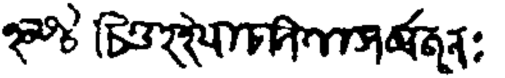

(হৃষ্ট চিত্ত হইয়া চলিলা সর্ব্বজন) ঢা. বি. পা. সং—৬৪৩৩, পৃ. ২৬খ

(ii)

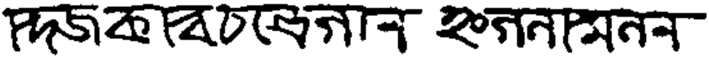

(দিজ কবি চন্দ্রেগান যুগল মিলন) ঢা. বি. পা. সং—৩৬৭০, পৃ. ১৩ক

(iii)

(যুর্দ্ধ সামান্য আকৃতি) ঢা. বি. আ. সং—৩৬৭, পৃ. ৪১

(iv)

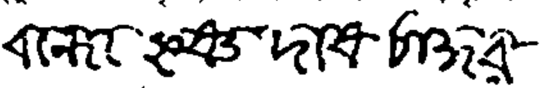

(বন্দো কৃষ্ণদাষঠাকুর) ঢা. বি. পা. সং—৫৬৭৫, পৃ. ৪ক

(v)

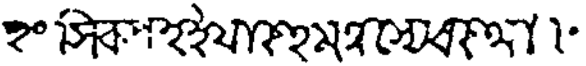

(হংসি রূপ হইয়া কহ মনুষ্যের কথা।) ঢা. বি. পা. সং—৬৪৩৩, পৃ. ১২খ

উপর্যুক্ত উদাহরণ চারটির 'হৃ', 'যু', 'কৃ', এবং 'হং' বর্ণগুলি একই আকৃতির। অর্থাৎ প্রথম উদাহরণের 'হৃষ্ট' শব্দের 'হৃ', দ্বিতীয় উদাহরণের 'যুগল' শব্দের 'যু', তৃতীয় উদাহরণের 'আকৃতি' শব্দের 'কৃ', চতুর্থ উদাহরণের 'কৃষ্ণ' শব্দের 'কৃ' বর্ণ চারটির লিখন রীতি অবিকল একই এবং পঞ্চম উদাহরণের 'হংসি' শব্দের 'হং' বর্ণটিও অনেকটা একই আকৃতিতে লিখিত হয়েছে।

(খ)

(i)

(কাকুতি করিআ বোলে খেমা করে মনে) ঢা. বি. মা. ২৯ পৃ. ১৯৭ক

(ii)

(হরি উদ্দেশে কত বেড়ায়িব আক্ষি) ঐ

(iii) 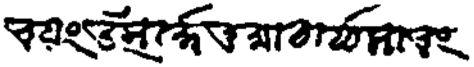

(... ত্রয়ং উৎসর্গে তুমাচার্য্যমাত্রং ...) রা. পা. সং—১২১৬ পৃ. ৯খ

(iv) 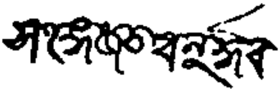

(সঙ্গেজত ধনুৰ্দ্ধর) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭১, পৃ. ৭০খ

(v)

(উন্মাদ্যতিসত্তক্ষিপ্রং জ্ঞেয়ঃ) ঢা. বি. পা. সং—৪৯৫, পৃ. ২৪৬খ

(vi)

(এতেক কহিয়া কৃষ্ণ বিদায় হইয়া) ঢা. বি. পা. সং—৩২৭১, পৃ. ৪৯

(vii) 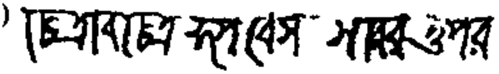

(চিত্রবিচিত্র রুপ বেস সরির উপর) বা এ. পা. সং ২৭৬, পৃ. ৭ক

উপর্যুক্ত উদাহরণগুলিতে দেখা যাচ্ছে, কু, দ্দ, গ্ন, ঙ্গ, দ্ধ, জ্ঞ, কৃ ও রু বর্ণগুলি লিখিত হয়েছে একই আকৃতিতে।

এরূপ একই আকৃতির ভিন্নার্থক বর্ণ বা শব্দের অসংখ্য ব্যবহার বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে পরিদৃষ্ট হয়।

ট. পাঠশিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

পূর্বে পাণ্ডুলিপি পাঠোদ্ধারের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এবার এর অন্যতম প্রয়োজনীয় 'ভাষাজ্ঞান' সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধারের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা তা হল ভাষাজ্ঞান। ভাষার উপর ভাল দখল না থাকলে সেই সব প্রাচীন যুগের মনীষীদের জ্ঞানভাণ্ডারের ব্যাপকতা সম্ভব নয় হৃদয়ঙ্গম করা। অন্তত সাধারণভাবে পাঠোদ্ধারের জন্যও ভাষার উপর বেশ দখল থাকতে হবে। প্রাচীন যুগের সংস্কৃত কবিদের লেখার বৈশিষ্ট্য ছিল দীর্ঘ সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদ তৈরি করা এবং এইভাবে যিনি যত বড় পদ তৈরি করতে পারতেন—পাণ্ডিত্যের কৃতিত্ব তাঁর তত বেশি ছিল। এর সঙ্গে তাদের লেখার আর একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল

পরিচিত সহজ শব্দ বর্জন করে অপরিচিত কঠিন শব্দ ব্যবহার করা। যিনি যত বেশি কঠিন ও অসাধারণ শব্দ ব্যবহার করতে পারতেন, ভাষাজ্ঞানের পরিচয় তাঁর তত বেশি প্রকাশিত হত। এই সব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সন্ধি ও সমাস মিলে পাণ্ডুলিপির পত্রে পত্রে যে সব দীর্ঘপদ সৃষ্টি হয়েছে, সংস্কৃত ভাষায় অধিকার না থাকলে তার ভিতর প্রবেশ করা অসম্ভব। যেমন—

(বিহঙ্গরাজাঙ্গরুহৈরিবায়তৈর্হিরুন্ময়োর্ব্বীরুহবল্লিতন্তুভিঃ)

এছাড়া খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে লেখা বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন, উক্ত কথা কতখানি সত্য। 'কাদম্বরী'তে সন্ধি ও সমাস করে করে পদটাকে এত দীর্ঘ করা হয়েছে যে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গেলে পূর্বপ্রান্তের কথা আর মনে থাকে না; এর কর্তা-ক্রিয়াও অনেক সময় খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হয়ে পরে; এ সব পদের অর্থ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। জার্মান পণ্ডিত ওয়েবারের মতে বাণভট্টের 'কাদম্বরী' ভারতীয় গভীর অরণ্যের মত, এর মধ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর, যদিও বা দুএকটা গাছ কেটে কোন রকমে প্রবেশ করা যায় তো 'শব্দরূপ'-ব্যাঘ্রের ভয়ে আর অগ্রগামী হওয়া যায় না।

সংস্কারকৃত 'সংস্কৃত' ভাষা আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। যে-'ছকে' সে যুগে সংস্কৃত সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল আজও আমরা সংস্কৃত সাহিত্য পড়তে গিয়ে সেই ছকের মধ্যেই ঘোরাফিরা করছি। কাজেই যেহেতু সংস্কৃত ভাষার কোন বিবর্তন নেই সেহেতু ভাষাজ্ঞান থাকলে এ যুগে বসেও সে যুগের কবিদের লিখিত কীর্তিকে হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। সংস্কৃত পুথির 'লিপি' এবং 'ভাষা' আলাদা হলেও একটি অন্যটির পরিপূরক। যেহেতু 'লিপি' বিবর্তিত সেহেতু তার সঙ্গে চলে আসা অবিবর্তিত 'ভাষার' মাধ্যমে তার (লিপির) বিবর্তনের ধারাটিকেও স্পষ্ট করা সম্ভব। অতএব, পাণ্ডুলিপির সঠিক পাঠোদ্ধারের জন্য ভাষা জানতে হবে। বিশেষ করে ব্যাকরণ। কারণ, ব্যাকরণের সঙ্গে অপরিচিত থেকে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাঠ করতে যাওয়া মরুভূমিতে বারি সন্ধানের মতই কষ্টদায়ক ও পণ্ডশ্রম মাত্র।

সপ্তম অধ্যায়

পাণ্ডুলিপির লিখন রীতি

ক. পাণ্ডুলিপির বানান ভুল প্রসঙ্গ

প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় লেখক বা লিপিকররা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বানান ভুল লিখতেন। এই বানান ভুলের একাধিক কারণ অনুমেয়। অধিকাংশ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি বাংলা লিপিতে লিখিত হলেও বাংলা ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির বানান ভুলের কারণগুলি পৃথক প্রকৃতির। বাংলা ভাষার যখন অঙ্কুরাবস্থা সংস্কৃত ভাষা তখন এক পরিপূর্ণ মহীরুহ। বাংলা ভাষা একটু একটু করে পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে বহু শতাব্দী পরে, আর সংস্কৃত ভাষা পূর্ণতা নিয়েই অপূর্ণ বাংলার সঙ্গে সঙ্গে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। বাংলা ভাষার উদ্ভব গৌড়ী অপভ্রংশ ভাষা থেকে। এর পূর্বে ছিল গৌড়ী প্রাকৃত। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই বাংলা ভাষায় প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব কাটাতে সময় লেগেছে অনেক। এ ছাড়াও বাংলা ভাষা সমৃদ্ধশালী সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে চলতে গিয়ে সংস্কৃতের কাছে যেমন ঋণী হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীদের এদেশে অবস্থানের ফলে তাদের ভাষার (যেমন—পর্তুগীজ, ইংরেজি, ডাচ, ডেনিশ, ফার্সী) প্রভাবে হয়েছে প্রভাবান্বিত। ফলে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে লিখিত হয়েছে বাংলা পাণ্ডুলিপি। যেমন—

(ক) প্রাকৃত ও বাংলার মিশ্রণ
(খ) সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণ
(গ) পর্তুগীজ ও বাংলার মিশ্রণ
(ঘ) ফার্সী ও বাংলার মিশ্রণ
(ঙ) আরবী, ফার্সী ও বাংলার মিশ্রণ
(চ) প্রাকৃত, সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্রণ ইত্যাদি।

প্রাচীন যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলা সাহিত্যের চর্চা বা বাংলা পাণ্ডুলিপির অনুলিপি করতেন। অসংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষায় যে সব পদ রচনা করেছেন তাতে প্রাকৃতের প্রভাব পড়েছে বেশি। এই প্রাকৃতের প্রভাব থেকে বাংলা ভাষার জন্মাবধি, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারে নি। আধুনিক যুগের গোড়ার দিকেও গ্রামাঞ্চলে অল্প শিক্ষিত কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রাকৃতের

প্রভাব কোথাও কোথাও বিদ্যমান ছিল। ফলে সেই প্রাচীন যুগ বা বাংলা ভাষার উদ্ভবের সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে প্রাকৃতের প্রভাব লক্ষণীয়।এবং এই সব পাণ্ডুলিপিতে বানানের বিকৃতি বা বানান ভুল অধিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

(ক) য়াল্লাহু গনি মোহাম্মদ নবি।
প্রথমে য়াল্লার নাম করিএ সোরন ॥[১]

(খ) মরিআ না মরে ফকির দুনিআই মাঝার ॥[২]

(গ) দোআ জে ফর্ম্মাইল নবি হস্ত দিয়া গাএ ॥[৩]

(ঘ) নিমাএআ নিঠুর হে আগো প্রাণ নাত ॥[৪]

(ঙ) আহ্মা ছারি এথ কাল কথাতে আছিলা ॥[৫]

(চ) তোহ্মারে বধিছে ছারে
দেহে প্রাণ থাকিতে আহ্মার ॥[৬]

(ছ) কুমারকে সমুদিআ পুছে দুই জন।[৭]

(জ) মাংস কাটি গৃধো দিলা পেলাইআ।[৮]

(ঝ) প্রথিবিতে দাতা নাহি তাঁহার সমান।[৯]

(ঞ) জাঁর ঘরে জম্মিলা আপনে নারায়ণ।[১০]

(ট) ইতি মুক্তুল হোচএন পুস্তক সমাহাপ্ত।[১১]

(ঠ) মুঞি ক্ষুদ্রমতি তাহান তনএ।
নিন্দা চর্চ্চা নিন্দা হিঙ্গসা না করএ ॥
মোহাজনে পাইলে দোস ডাকিয়া রাকএ।
ক্ষুদ্র জনে পাইলে দোস প্রচার করএ ॥
পোস্তক মাজারে বহু ওসুদ্ধ আছএ।
পণ্ডিতে পাইলে দোস খীপীবা নিশ্চএ ॥[১২]

(ড) সপ্পন ব্রেতান্ত কহে জননির স্থান।[১৩]

(ঢ) সপ্পনে সদাএ জাএ মন বান্ধা দিআ।

নিবিছিল মনের আনল কে দিল জালিআ।[১৪]

(ণ) কলঙ্কে উঝল চন্দ্র তিমির নাসএ।[১৫]

(ত) স্যামি সঙ্গে নানা রঙ্গে নিসি বসি জাগে।[১৬]

(থ) সমএ গঞিতে আছে কি কর কামিনি।
অমূল্য রত্তন জান আশ্বাসিতে জাএ।[১৭]

(দ) ছাদতুল্লা নিবেদন সভার চরণে।
য়সুদ্ধ বচন যদি পাও কোন খানে ॥
য়সুদ্ধ করিবা সুদ্ধ বচন প্রবিসি।
সভাত বসিয়া কেহো না করিবা হাসি ॥

কেত্যব দেখিয়া আমি কহিব কাহিনী।
সত্য মিত্যা কথা আমি কীছু নহে জানি ॥
ফারছিত আছিল লেখা বাঙ্গালা করিব।
বুঝিলে সে বোঙ্গ দেসে কীছু বেহাক্ষ্যা পাবো।[১৮]

(ধ) সঅন করাইল নিআ খাটের উপরে।[১৯]

সংস্কৃতজ্ঞ যে-সব পণ্ডিত বাংলা সাহিত্য চর্চা করেছেন বা বাংলায় পদ রচনা করেছেন তাতে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব পড়েছে বেশি। এ সব লেখকের রচিত কাব্যে বানান ভুল কম। অনেক ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে।

সাধারণত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে যে বানান ভুল দৃষ্ট হয় তা লিপিকরকৃত অনুলিপি গ্রন্থে। দেখা গেছে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করেছেন। এদের ক্ষেত্রে যে ভুল হত তা সম্ভবত লিপিকরের অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞতা বা অন্য কারণে নয়। তবে তার সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত লোকেরাই পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করতেন। কারণ এক সময় পাণ্ডুলিপি প্রতিলিপিকরণ ছিল একটা জীবিকার্জনের পন্থা। ফলে অর্থের কারণে অনেক অপণ্ডিতের হাতে পাণ্ডুলিপিতে একের পর এক ভুলের সংখ্যা হয়েছে বর্ধিত। সাধারণত যে যে কারণে পাণ্ডুলিপিতে ভুল বানান লেখা হত তা হলো—

১. লিপিকরের অজ্ঞতাজনিত ভুল

সংস্কৃত ভাষা যতটা জটিল ততোধিক জটিল তার লিখন-প্রণালী। সন্ধি ও সমাসের সমন্বয়ে পদগুলি যেমন হত দীর্ঘ তেমনি হত তা দুর্বোধ্যও। বিশেষ করে প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে শুধু দুটি বর্ণের সংমিশ্রণেই নয়, দ্ব্যধিক বর্ণ যুক্ত করে তৈরি করা হত একটি যুক্ত বর্ণ। শুধু তা-ই নয়, একাধিক শব্দ যুক্ত করে এমনভাবে একেকটি বাক্য গঠন করা হত যে সন্ধি, সমাস ও শব্দার্থে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে তা বোঝা কোনরূপেই সম্ভব নয়। যেমন—

(ক)
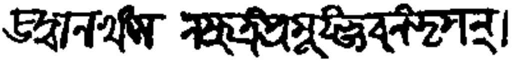

জজ্বাল খং সনক্ষত্রং প্রমূঢ়ং ভুবনং ভৃশম্ ॥[২০]

(খ)

পৃষ্টতো বিজয়স্যাপি যাতি রুদ্রস্য পত্নিশঃ ॥[২১]

এসব পাণ্ডুলিপি যখন কোন অপণ্ডিত না বুঝে 'মাছি মারা কেরানীর' মত লিখে যেতেন তখন তা হত বিকৃত। হস্তাক্ষরের পার্থক্য এবং অস্পষ্টতার জন্য কোন পাণ্ডুলিপির কোন বর্ণ তার অনুলিপিতে হয়তো ভিন্ন কোন বর্ণ বলে প্রতিভাত এবং

লিখিত হত। ফলে ঐ বর্ণযুক্ত সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থই হত বিনষ্ট। এরূপ পাণ্ডুলিপি অন্যকোন অল্পজ্ঞানী লিপিকর যখন পুনরায় লিপি করতেন তখন তিনি পুনরায় ভুল করতেন। এভাবে লিপি-পরম্পরায় পাণ্ডুলিপিতে সংঘটিত হয়েছে ভুলের ভুল। মধ্যযুগের শেষের দিকে লিপিকৃত পাণ্ডুলিপিতেই বানান ভুলের সংখ্যা অধিক। কারণ ঐ সময়ে পাণ্ডুলিপির লিপিকরণ জীবিকার্জনের অন্যতম অবলম্বনরূপে বেশি ব্যবহৃত হত। অনেক ক্ষেত্রে একটি পরিবারের অনেকেই এ কাজে লিপ্ত হতেন। একজন পাঠ করতেন এবং অন্যজন তা শুনে শুনে লিখতেন। যিনি লিখতেন তিনি বানান লিখতেন তার বিদ্যানুসারেই। কখনো কখনো একটি পাণ্ডুলিপি একটু একটু করে অনেকে মিলে লিখতেন। এ হেতু একই পাণ্ডুলিপিতে একই বানানের অনেক সময় বিভিন্নতা ঘটত।

২. লিপিকরের বোঝার ভুল

অনেক সময় লিপিকররা পাণ্ডুলিপির সঠিক পাঠোদ্ধার করতে না পেরে ভুল বানান লিখতেন। যেহেতু পাণ্ডুলিপি হাতে লেখা সেহেতু ব্যক্তির ভিন্নতায় লেখার বিভিন্নতা দেখা দিত। এ হেতু এক পাণ্ডুলিপির 'শ' হয়ত অন্য পাণ্ডুলিপির 'স' এর মত হত। এরূপ দুটি পাণ্ডুলিপি কোনো একজন লিপিকর লিপি করতে গিয়ে ভুল শব্দটি সঠিক ভেবে 'শ' এর ওলট-পালট করে ভুল বানান লিখতেন। এমনিভাবে বিভিন্ন বর্ণ, যুক্তবর্ণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে লিপিকর বোঝার ভুলে সঠিক বানানের স্থলে লিখতেন ভুল বানান।

৩. অনুমানগত ভুল

অনুমানগত ভুল লিপিকরদের হাতেই সংঘটিত হত। পাণ্ডুলিপিতে এমন কতগুলি বর্ণ এবং শব্দ আছে যে-গুলির অর্থ ভিন্ন, কিন্তু আকৃতির দিক থেকে অভিন্ন। যেমন—ত, ন, ল, ব, র, য, য়, ত্য, ন্য, য্য, জ্য, স্ব, ম্ব, মু, দা, প্ম, খ, ঋ, খু, স, সু, স্ব, ষ্ব, শ্ব, শ্ব, ু, ূ, া, ি, কৃষ্ণ ইত্যাদি। এ-সব ক্ষেত্রে কোন অনভিজ্ঞ বা ভাষাজ্ঞানহীন লিপিকর তার সময় থেকে বহু শতাব্দী পূর্বের কোন পাণ্ডুলিপির অনুলিপি করতে বসে অর্থবোধ ছাড়াই অনুমানের দ্বারা অন্য কিছু লিখতেন। যেমন—লেখক হয়ত লিখেছেন স্য, জ্য, ত্য, কিন্তু লিপিকর অনুমানে লিখলেন শ্য, য্য, ন্য। ফলে সৃষ্টি হত বানান ও অর্থের বিপর্যয়। এভাবে লিপিপরম্পরায় ঘটেছে বানানের বিভ্রান্তি। এ জাতীয় ভুল সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেই বেশি ঘটত। কারণ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির সন্ধি ও সমাসবদ্ধ দীর্ঘ পদগুলি এমনই জটিলভাবে লেখা হত যার সঠিক পাঠোদ্ধার অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যতীত ছিল দুরূহ। অথচ লিপিকরদের অধিকাংশই ছিলেন স্বল্প শিক্ষিত। এ কারণেই লিপিকালে কোন জটিলতার সম্মুখীন হলে তাঁরা অনুমান দ্বারা পরিচালিত হতেন এবং সৃষ্টি করতেন বিভিন্ন প্রকার ভুল ভ্রান্তির।

৪. নিজস্ব জ্ঞান

নিজস্ব বা ব্যক্তিগত জ্ঞানের দ্বারাও বানানের পরিবর্তন হত। কখনো কখনো কোন লিপিকর লিপি করতে গিয়ে পূর্বের লিপিকরের ভুল বানান সংশোধন করে লিখতেন।

আবার কখনো কখনো হয়ত কোন লিপিকর তার নিজের বিদ্যানুসারে সঠিক বানান শুদ্ধ করতে গিয়ে ভুল লিখতেন। এভাবেও ঘটত বানানের বিপর্যয়।

দেখা গেছে, সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি থেকে বাংলা পাণ্ডুলিপিতে বানান ভুলের সংখ্যা বেশি। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির বানান ভুলের পশ্চাতে কারণ ছিল প্রধানত দু'টি—লিপিকরের বোঝার ভুল এবং অনুমানগত ভুল। বাংলা পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে অজ্ঞতাজনিত ভুলই বেশি। এর সঙ্গে বোঝার ভুল এবং অনুমানগত ভুলও রয়েছে। লিপিকরদের কেউ কেউ যে অল্প শিক্ষিত ছিলেন তা তাঁদের লিপিকৃত গ্রন্থের শেষে লিখিত পুষ্পিকা অংশ থেকে জানা যায়। অনেক লিপিকর নিজেদের অজ্ঞতা স্বীকার করে পুষ্পিকাংশে নানা কথা লিখে রাখতেন। আবার অনেকের পুষ্পিকা অংশে ভুলের পরিমাণ দেখেও অনুমান করা যায় যে তাঁরা কতটা বিদ্বান ছিলো। যেমন—

ক. ইতি সবে মেহেরাজ পুস্তক সমাপ্ত। ভিমস্যাপি মোনিনাপি মতিভ্রম জথা দ্রিষ্টি তথা লিখীনং ... শ্রী নানোবর পুত্র জান মাহাম্মদ ছগীর তাহান ঔরসে জন্ম হইলুম অস্তির। মোঞি হিন অল্প বোদ্ধি সেবক জানিআ ॥ শ্রী তোনা আলি বালকে লিখি পুস্তক করিআ। মোঢ়মতি অল্প বোদ্ধি সেবক জানিআ। মোহাজনে দোস ঢাকি গোন (গুণ) প্রচারিআ। অসুদ্ধ হইলে পদ গালি নহি দিবা। হিন তোনা আলির দোস সকলে খেমিবা ॥ গোর (গুরু) জন সবেরে প্রণামি বারে বারে ॥ গালি না দিবারে মাগি জুরি দুই কর। সাক সুন সত ১৬৮২ মঘি ১১২২ মঘি তারিখ ৫ আশ্বিন রোজ শুক্রবার শ্রী এই পুস্তকের মালিক তোনা আলি।[২২]

খ. হিন কমর আলি কহে রিতের বাঢ়মাস।
খুদ্র বুদ্ধি য়ল্প গ্যান আর হেন জন।
বেদ শাস্ত্র কীছু মাত্র মোর নাই গ্যান।
বাঢ়মাস পদবন্ধে করিলুম রছন।
য়সুদ্ধ পাইলে দোষ খেমীবা [সুজন]।
শুনি জেবা গাএ জেবা সুনে রিতের বাঢ়মাস।
সর্ব্বত্রে কুসল তার আপদ বিনাস।[২৩]

গ. ইতি গুচিয়ৎনামা পুস্তক সমাপ্ত।
এবে কালিদাস দোস খেমিবা গুনিগণ।
য়পরাদ মাগি স্বামি সভার চরণ।
ইকার আকার অক্ষর পরিআ থাকএ
পণ্ডিত সকলে দোষ খেমিবা নির্চএ ॥
য়াসলেত জেইয়াছে লেখীছি সেই পদ।
গালি না পারিয় সবে করিএ তেমৎ ॥
জদি সে য়সুদ্ধ হএ সুদ্ধ করি দিবা।
গরিব দেখিতে দোস সব খেমিবা ॥
এ পুস্তক লেখিয়াছেন শ্রীকালিদাস।[২৪]

ঘ. ন বুজ্জি লেখি আছি বুদ্ধি নহি ভাবি।
অসুদ্ধ লেখিলে সুদ্ধ করিঅ পাঞ্চালি ॥
নিরবধি ব্যাম মনে মজুনু চরিত।
মিচকিন ফাজীল আর খুদ্রপাপ অতুলিত ॥
মোর সম পাপি নাহি সংসার ভিতরে।
মুনি মুক্তা ছর্দ্ধা করিব পাপ [ডরে?]
দয়ালে করিলে দয়া সেই মোর আসা।
সরিরে নাহিক মোর পুণ্যের ভরসা।[২৫]

বর্তমান সময়ে বসে আমরা যখন যুগ যুগ ধরে লিখিত লিপিকরদের এই সব অশুদ্ধ লেখা পাঠ করব তখন হতাশ বা অধৈর্য না হয়ে লিপিকরদের অনুরোধ ও আশীর্বাদ স্মরণ রেখে অশুদ্ধ পাঠ শুদ্ধ করেই পাঠ করতে হবে। পাণ্ডুলিপি পাঠে এ ক্ষেত্রে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় পর্যাপ্ত ভাষাজ্ঞান ও শব্দজ্ঞান অর্জন করে মনোযোগ সহকারে পাঠ করলেই সে সমস্যার সমাধান মিলতে পারে।

খ. সংস্কৃত ও বাংলা পাণ্ডুলিপির লিখন রীতির পার্থক্য

সংস্কৃত ও বাংলা পাণ্ডুলিপির মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের ভাগটাই বেশি। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে বাংলা পাণ্ডুলিপির মত অর্থহীন কোন চিহ্ন নেই বললেই চলে। যেমন— বাংলা পাণ্ডুলিপির 'রেফ', চিহ্নের আধিক্য সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে নেই।

(ক) 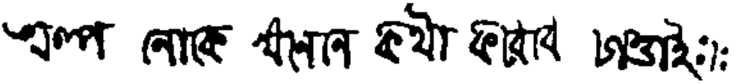

(অল্প লোকে সুনিলে কর্থা করিবে চাত্তাই) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৩

(খ) 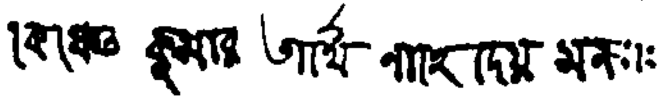

(কির্ধিত্ত কুমার তার্থে নাহি দেয় মন) বা. এ. পা. সং২৭৬, পৃ. ১৩

(গ) 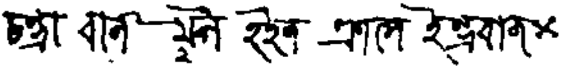

(চন্দ্রাবলি মৃর্গ হইল শ্রাপে ইন্দ্ররাজ) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ৬

১. 'j' (য-ফলা) নির্দেশক অতিরিক্ত ' / ' চিহ্ন।

(ক)

(সুনিএগ্রা কুমারের বার্ক্য লোকে কহে কথা) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৪

(খ) 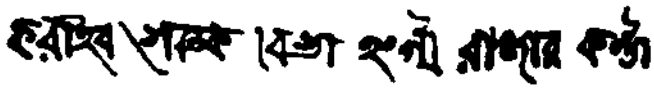

(করাইব সতেক বিভা যুর্গ্যা রাজার কর্ন্যা) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৩

(গ)

(এ মত নিলর্জ্যা কেনে হৈলা যুবরাজ) ঐ

(ঘ) 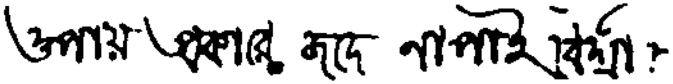

(উপায়-প্রকারে জদি না পাই বির্দ্যা) ঐ

(ঙ) 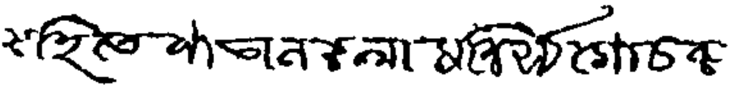

(কহিতে পাতাল কথা মনির্স্য গোচর) ঢা. বি. আ. সং—২৩৭, পৃ. ৯৪ক

২. দ্বিত্ব নির্দেশক '৴' রেফ-এর ব্যবহার

(ক) 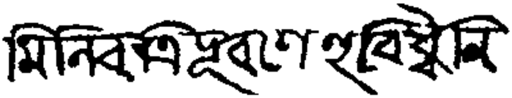

(মিলিব ত্রিভুবনে হরির্ধ্বনি) ঢা. বি. পা. সং—৬০৫৩, পৃ. ৩৪

(খ) 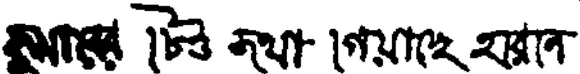

(কুমারের চির্ত্ত জথা গিয়াছে হরিনি) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৩খ

(গ)

(লিখিতং হামেদুর্ল্লা (ল্লা) ঢা. বি. পা. অপরিচায়িত

৩. দ্বিত্ব বোঝাতে ডানপার্শ্বে একটি অতিরিক্ত চিহ্নের ব্যবহার

(ক) 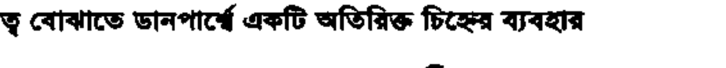

(আম্হি না জানি বার্ত্তা জানিবে কজন) ঢা. বি. পা. সং—২৩৭, পৃ. ৯২

(খ) 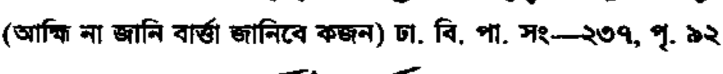

(বৃদ্ধ বোলে সর্গ মৈর্ত্য পাতালের কর্ম) ঢা. বি. পা. সং ২৩৭, পৃ. ৯৩

(গ) 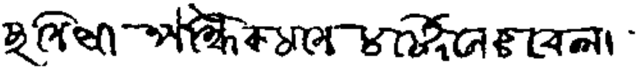

(থুনিআ পত্রির মনে জন্মিলেক বেথা) ঐ

(ঘ) 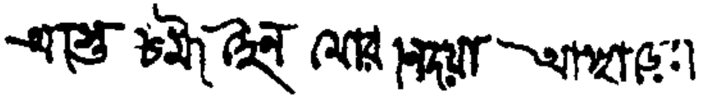

(অস্তি চর্ম হৈল মোর নিদয়া আছাড়ে) বা. এ. পা. সং—২৭৬, পৃ. ১৩

সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে এ জাতীয় কোন অর্থহীন চিহ্ন কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। তবে কোন কোন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে প্রতি লাইন বা পংক্তির শেষ বর্ণের শেষে একটা লম্বা 'টান' দেখা যায়। এটা খুব সম্ভবত কোন বাংলা পাণ্ডুলিপির লিপিকর একই সঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করতে গিয়ে বাংলার প্রভাবে সংস্কৃতেও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। এই নিদর্শন বাংলা পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে প্রচুর, কিন্তু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে খুবই কম। সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে ব্যাকরণগত অনেক জটিলতা আছে কিন্তু বাংলা পাণ্ডুলিপির মত বিকৃত বানানের জটিলতা নেই। তখনকার দিনে সংস্কৃত ছিল শিক্ষিতের ভাষা। যাঁরাই লেখাপড়া শিখতেন তাঁরা সংস্কৃত নিয়ে চর্চা করতেন। সংস্কৃত প্রথম থেকেই ছিল একটি সুসংবদ্ধ ভাষা, পক্ষান্তরে প্রাথমিক অবস্থায় বাংলা তদ্রূপ সুসংবদ্ধ ছিল না অর্থাৎ এর কোন নির্দিষ্ট লিখিতরূপ ছিল না। তখন বাংলা ছিল অসমৃদ্ধ ও সাধারণ লোকের একটি কথ্য ভাষা। বাংলা ভাষা পরিবর্তনশীল। তাই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি যতটা নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে রচিত হয়েছে, বাংলা পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি। ফলে ভাষা বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা পাণ্ডুলিপিতেও বিভিন্ন বিবর্তনের ও বিকৃতির সৃষ্টি হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. ঢা. বি. আ. সং—৩৮৭
২. ঢা. বি. আ. সং—৫৫৭
৩. ঢা. বি. আ. সং—৬৫
৪. ঢা. বি. আ. সং—৪৭৬
৫. ঢা. বি. আ. সং—২৫২
৬. ঢা. বি. আ. সং—৫৫৪
৭. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২৩৭
৮. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—২৩৭
৯. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৫৭৩৬
১০. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৫৭৩৬
১১. ঢা. বি. আ. সং—৫৫৪
১২. ঢা. বি. আ. সং—৩৬৯
১৩. ঢা. বি. আ. সং—১১৯

১৪. ঢা. বি. আ. সং—১১৭
১৫. ঢা. বি. আ. সং—২৯২
১৬. ঢা. বি. আ. সং—২৪৯
১৭. ঢা. বি. আ. সং—২৩৪
১৮. ঢা. বি. আ. সং—৩৪০
১৯. ঢা. বি. আ. সং২৬০
২০. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৪৯৫ পৃ. ২৪৬খ
২১. ঢা. বি. পা. সংখ্যা—৪৯৫ পৃ. ২৪৬ক
২২. আহমদ শরীফ, পুথি-পরিচিতি, পৃ. ৫৪৯
২৩. আহমদ শরীফ, পুথি-পবিচিতি—৩৩
২৪. আহমদ শরীফ, পুথি-পরিচিতি—৩৬
২৫. আহমদ শরীফ, পুথি-পরিচিতি—৩৬

অষ্টম অধ্যায়

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা পদ্ধতি

ক. সম্পাদনা পদ্ধতি

সুদূর অতীতের সৃষ্টি বর্তমান বিশ্বে উপস্থাপিত হয়েছে সম্পাদনার মাধ্যমে। অতীতের সেই সৃষ্টি সম্ভারের নানা বিষয় নিয়ে সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত সম্পাদিত হচ্ছে বিবিধ গ্রন্থ। সম্পাদনার ক্ষেত্রে নানা পদ্ধতির প্রচলন লক্ষণীয়, যেমন—

১. আক্ষরিক সম্পাদনা পদ্ধতি
২. সংশোধিত সম্পাদনা পদ্ধতি
৩. সমন্বিত সম্পাদনা পদ্ধতি
৪. আদর্শ পুথি ভিত্তিক সম্পাদনা পদ্ধতি

১. আক্ষরিক সম্পাদনা পদ্ধতি : আক্ষরিক সম্পাদনা পদ্ধতি অর্থাৎ পুথিতে যেমন থাকবে অবিকল সেরূপ সম্পাদনা। এক্ষেত্রে সম্পাদকের কোন স্বাধীনতা থাকে না। অর্থাৎ বানান, ভাষা, লিখনরীতি কোন বিষয়েরই কোন পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। কেবলমাত্র প্রাচীন লিপি থেকে আধুনিক লিপিতে রূপান্তরিত করণ। এ পদ্ধতির সপক্ষে যাঁরা, তাঁদের মতামত হল, মূল পাঠের উপর হস্তক্ষেপ করা হলে পুথি ও পাঠকদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয় অন্তরালের। পুথির বানান অব্যাহত থাকলে ভাষাতত্ত্ব-ধ্বনিতত্ত্বের একজন ছাত্র গবেষণার উপযোগী যে সকল উপকরণ পেতেন পরিশোধনের ফলে এগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। কোন শতকে কোন অঞ্চলে সত্যকে সৈত্য এবং কন্যাকে কৈন্যা লেখা হয়েছে তা সম্পাদক পাঠককে জানতে দিলেন না। তিনি সাফ কলমে সব কৈন্যা এবং সৈত্যকে কেটে কন্যা এবং সত্য করে দিলেন। বিভিন্ন পুথিতে একই শব্দের দুই তিন বা ততোধিক রূপান্তর থাকতে পারে। যে ব্যক্তি বাংলা বর্ণ বিন্যাসের ইতিহাস চর্চা করবেন তাঁর পক্ষে সব ক'টি রূপেরই প্রয়োজন আছে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক সম্পাদক পুথিতে যেমন দেখেন অর্থাৎ 'যৎ দৃশতে তৎ লিখ্যতে' নিয়মে সম্পাদনা করেন। এ

রীতির প্রচলন সম্পাদনার প্রথম যুগেই অধিক ছিল। বর্তমানে এ পদ্ধতি হ্রাস পেতে শুরু করেছে।

২. সংশোধিত সম্পাদনা পদ্ধতি : এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল, পাঠকের প্রতি সর্বৈব আনুগত্য স্বীকার না করে ভুল বানান এবং তৎসম শব্দের বানান পরিশুদ্ধ করে আধুনিক বানান রীতিতে লিখন পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে একটি শুদ্ধ পাঠ পাঠকদের সামনে পরিবেশন করা সম্ভব। কারণ লিপি পরম্পরায় পুথিতে সৃষ্টি হয নানারূপ পাঠ বিকৃতি এবং অশুদ্ধ বানান। যে ভুলগুলি হয়ত লেখককৃত নয়, কেবল লিপিকরদ্বারা সৃষ্ট। যে ক্ষেত্রে লেখকৃত পুথি ব্যতীত লিপিকর লিখিত পুথি অনুসরণে সম্পাদনা সম্পাদন করতে হয় সে ক্ষেত্রে ভুল বানানে সন্দিগ্ধ হওয়া সঙ্গত এবং লেখকের প্রতি আনুগত্যতার দরুণ তা সংশোধন করে লেখাই আবশ্যকীয়। অনেকের ধারণা মূল পাঠের উপর হস্তক্ষেপ করা হলে পুথি ও পাঠকদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয় একটি অন্তরালের। এ কথায় যৌক্তিকতা যথার্থ সে ক্ষেত্রেই যে ক্ষেত্রে মূল পুথি অর্থাৎ লেখককৃত পুথি অবলম্বনে সম্পাদনার কাজ সম্পাদন করা হয়। কিন্তু লেখককৃত পুথি অবলম্বনে সম্পাদনার সৌভাগ্য বর্তমানে বিরল। কারো কারো মতে সংশোধনের ফলে পুথিতে ঠিক কি ছিল এবং সম্পাদক কোন শব্দের কতটা বদলিয়েছেন তা জানার উপায় থাকে না। একথা যথার্থ নয়, কারণ সংশোধন কার্যে সম্পাদক কোন শব্দের কতটা পরিবর্তন করলেন তার বিবরণ তথ্যপঞ্জিতে অবশ্যই উপস্থাপন করবেন। পূর্ণ বিবরণ ব্যতীত একটি বর্ণও পরিবর্তন করা কোন যথার্থ সম্পাদকের কর্তব্য নয়।

মূল পুথি ব্যতীত প্রতিলিপি সহযোগে সম্পাদনা কল্পে একই গ্রন্থের একাধিক পুথির সমন্বয়ে সম্পন্ন করতে হয় অভিপ্রেত পাঠ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন শতকের পুথি। বিভিন্ন শতকের ভাষারীতি, বানানরীতি ভিন্নাকৃতির। সময়ের প্রভাব পুথির লিখন রীতিকেও করে প্রভাবান্বিত। বিশেষ করে বাংলা ভাষার বিবর্তনমুখী সময়ে। বর্তমান সময়ে বসে কোন গ্রন্থ সম্পাদনায় পাঁচ শতকের পাঁচটি কিংবা দশটি পুথির সমুদায় বানান রীতি একটি মূল পাঠে সমন্বিত করা সম্ভব নয়। এর ভিতর থেকে মূলানুগ একটি লিখনরীতি মূল পাঠে গ্রহণ করে অন্য সমুদায় পুথি সমূহের সার্বিক বর্ণনা বর্ণিত হয় ফুটনোট বা তথ্যপঞ্জিতে, এবং আলোচনা অংশে বর্ণিত হয় গৃহীত পুথি সমূহের লিপিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা। মূল পাঠে সংশোধন পদ্ধতি অবলম্বন করলেও লিপিতাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় গৃহীত হয় আক্ষরিক পাঠ। এ পদ্ধতিতে লিপিতাত্ত্বিক ভাষাতাত্ত্বিক কোন গবেষকের পক্ষে বিভিন্ন শতকের লিখন রীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জনে কোন বাধা থাকার কথা নয়। পুথি আলোচনা-অংশে প্রতিটি পুথির সার্বিক পর্যালোচনা সম্পাদক যথার্থরূপে অবশ্যই বিধৃত করবেন, যার দ্বারা গবেষকগণ প্রতিটি পুথির অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সার্বিক বিষয়ে অবহিত হতে পারেন।

৩. সমন্বিত সম্পাদনা পদ্ধতি : মূল পুথির সঙ্গে একাধিক প্রতিলিপির পাঠ সংযোজনকে সমন্বিত পাঠ বলা হয়। যে ক্ষেত্রে একের অধিক পুথি সংযোগে পাঠ

সম্পাদনা করা হয় সে ক্ষেত্রেই এ পদ্ধতিটি প্রযোজ্য। ধরা যাক, সম্পাদনার জন্য একটি গ্রন্থের তিনটি পুথি পাওয়া গেছে। এই তিনটি পুথিকে কালানুযায়ী তিনটি ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত করতে হবে। যেমন, ক, খ, গ অথবা ১,২,৩। এই তিনটি পুথির ক বা ১ সংখ্যক পুথিটিকে মূল পুথিরূপে গণ্য করে অন্যপুথি সমূহের প্রতি ছত্রের পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ সম্পাদনা করতে হবে। তিনটি পুথির যে অংশ গুরুত্বপূর্ণ বা মূলানুগরূপে বিবেচিত হবে সে অংশই মূল পাঠে সন্নিবেশিত হবে। অন্য পাঠসমূহ লিপিবদ্ধ হবে ফুটনোটে বা তথ্যপঞ্জিতে। এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত সব পুথিই আদর্শ পুথির মতই গুরুত্ব বহন করে।

৪. আদর্শ পুথি ভিত্তিক সম্পাদনা পদ্ধতি : মূল পাঠে একটি পুথিকে আদর্শ করে সম্পাদনা পদ্ধতিকে আদর্শপুথি ভিত্তিক সম্পাদনা পদ্ধতি বলা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত একাধিক পুথির মধ্য থেকে প্রাচীনত্ব এবং আনুষঙ্গিক সার্বিক বিষয় বিচার পূর্বক একটি আদর্শ পুথি নির্বাচিত হয়। এই আদর্শ পুথির পাঠ মূলপাঠরূপে বিবেচিত হয়। এবং সম্পাদনার জন্য গৃহীত অন্য সমুদায় পুথির পাঠ মুলপাঠ থেকে ব্যতিক্রম বা বৈচিত্র্যপূর্ণ হলে তা লিখিত হবে ফুটনোটে বা তথ্যপঞ্জিতে।

খ. পাণ্ডুলিপি সম্পাদনায় সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরিসীম। সম্পাদকের সঠিক দায়িত্ব পালনের ফলে যথার্থ শুদ্ধ পাঠ পাঠকের সম্মুখে পরিবেশিত হতে পারে। সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদক অনেকটা ভেঙ্গে গড়ার কারিগরের মত। তিনি অনালোকিত অপরিচিত দুর্বোধ্য প্রাচীন কোন বিষয়ের প্রাচীনত্বকে ঝেড়ে মুছে সহজ সুন্দররূপে নতুন পাঠকের উপযোগী করে তোলেন।

কোন পুথি সম্পাদনাকল্পে সম্পাদকের যে বিষয়সমূহ করণীয় তা নিম্নরূপ :

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার দুটি অংশ। একটি বহিরঙ্গ অপরটি অন্তরঙ্গ।

বহিরঙ্গ বিষয়

১. পুথি নির্বাচন : সম্পাদনার জন্য প্রথমে যে বিষয়টি আবশ্যকীয় তা হল পুথি নির্বাচন করা। নির্বাচনের পূর্বে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পুথির সার্বিক দিক বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পুথিটি পূর্বে কখনও কোথাও সম্পাদিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হতে হবে। সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদক কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তাও নির্বাচন করে নেয়া বাঞ্ছনীয়। সম্পাদনার পদ্ধতি অবলম্বনে সম্পাদকের স্বাধীনতা সর্বৈব। ইচ্ছে করলে সম্পাদক দুটি পদ্ধতির সংমিশ্রণেও সম্পাদনার কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

২. নির্বাচিত পুথির প্রতিলিপি অনুসন্ধান : পুথিটি নির্বাচিত হলে অনুসন্ধান করতে হবে এর প্রতিলিপির। কেবল একটি প্রতিষ্ঠানই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র অনুসন্ধান করে

জ্ঞাত হতে হবে প্রতিলিপির সংখ্যা। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত বিবিধ ক্যাটালগ ব্যবহার করা যেতে পারে। সংস্কৃত ও বাংলা পুথির তালিকা সম্বলিত অনেক ক্যাটালগ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ ক্যাটালগই এ সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট।

৩. নির্বাচিত পুথির প্রতিলিপি সংগ্রহ : নির্বাচিত পুথির প্রতিলিপির সংখ্যা জ্ঞাত হলে তা সংগ্রহে উদ্যোগী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন বহির্দেশ থেকে কোন প্রতিলিপি সংগ্রহের আবশ্যকতা হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা গ্রন্থাগার, স্ব স্ব দেশের হাই কমিশন এবং কম্পিউটারের ইন্টারনেটের সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. সংগৃহীত পুথি কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করণ : প্রতিলিপি সংগ্রহ সমাপ্ত হলে প্রথমে কালানুক্রমিকভাবে পুথিসমূহকে সাজাতে হবে। এ ক্ষেত্রে লিপিকরকর্তৃক যদি কালাঙ্ক লিখিত না থাকে তাহলে কাগজ, কালি, লিখনরীতি এবং আনুষঙ্গিক সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে সাজাতে হবে। কালানুক্রমিকভাবে পুথিসমূহকে ১,২ অথবা ক, খ সংখ্যাচিহ্নে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

৫. আদর্শ পুথি নির্বাচন : প্রাপ্ত পুথি থেকে আদর্শ পুথি নির্বাচন করতে হবে। সাধারণত প্রাপ্ত পুথির মধ্যে সর্বপ্রাচীন পুথিটিকে আদর্শ পুথিরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু এ নিয়ম সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারিখযুক্ত সর্বপ্রাচীন পুথিটি খণ্ডিত। সামান্য কিছু পত্র অবশিষ্ট আছে, এবং তাও অস্পষ্টতার দরুণ পাঠোদ্ধারের প্রায় অযোগ্য। সে ক্ষেত্রে এর পরবর্তী সময়ের পুথির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। আদর্শ পুথি সর্বক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাপ্ত পুথির কোনটিই যদি সম্পূর্ণ না হয় তখন সমন্বিত সম্পাদনা পদ্ধতি অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। এ পদ্ধতিতে মূল পাঠে একাধিক পুথি আদর্শ পুথিরূপে গণ্য হতে পারে।

৬. আদর্শ পুথির পাঠোদ্ধার : একাধিক প্রতিলিপি অবলম্বনে সম্পাদনার ক্ষেত্রে পাঠোদ্ধারের দুটি রীতি প্রচলিত। প্রথমত সর্বাগ্রে আদর্শ পুথির সম্পূর্ণাংশই পাঠোদ্ধার করতে হবে। পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত যে লেখপত্র গৃহীত হবে তার প্রতি পৃষ্ঠার অর্ধাংশে আদর্শপুথির পাঠ লিখিত হবে। অবশিষ্টাংশ নির্ধারিত থাকবে প্রতিলিপিসমূহের পাঠ লেখার নিমিত্ত। এরূপ ভাবে সম্পূর্ণ পুথিটির পাঠোদ্ধার সমাপ্ত হলে পর্যায়ক্রমে (ক্রমিকসংখ্যানুযায়ী ক,খ,গ ইত্যাদি) প্রতিলিপিসমূহের পাঠ আদর্শ পুথির পাঠের সঙ্গে মিলাতে হবে। এ ক্ষেত্রে যে পুথির পাঠের যে অংশে বৈসাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হবে সে অংশ স্ব স্ব পৃষ্ঠার নিম্নাংশে ফুটনোটের অনুকরণে লিখিত হবে। দ্বিতীয়ত আদর্শপুথি পাঠোদ্ধারের সময় নির্ধারিত প্রতিলিপি সম্মুখে রেখে একত্রে পাঠ মিলিয়ে লিখন পদ্ধতি।

সমন্বিত পাঠ সম্পাদনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই অবলম্বন করা হয়। যে পুথির যে অংশের পাঠ আদর্শ পুথির পাঠ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা মূলপাঠে সংযোজিত হবে এবং আদর্শ পুথির সে অংশের পাঠ সন্নিবেশিত হবে ফুটনোটে। অনেক সময় আদর্শ পুথির কোন বর্ণ, কোন পংক্তি, কোন অংশ বা পত্র খণ্ডিত হতে পারে, সে ক্ষেত্রেও প্রতিলিপির পাঠ মূল পাঠে সংযোজিত হবে এবং কেন সংযোজিত হল তার পূর্ণ বিবরণ ফুটনোটে উল্লিখিত হবে।

অনেক গ্রন্থ আছে যার একটি মাত্র প্রতিলিপি বর্তমান। এমন ক্ষেত্রে সম্পাদককে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। কালের ব্যবধান, সঠিক সংরক্ষণের অভাব, লিপিকরের লিখন বিভ্রাট প্রভৃতি কারণে পুথির বর্ণ, শব্দ, ছত্র বিচ্ছিন্ন এবং দুর্বোধ্য হতে পারে। অন্য কোন প্রতিলিপি না থাকার কারণে উক্ত অংশ মিলানোও সম্ভব হচ্ছে না, এমন ক্ষেত্রে সম্পাদক দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। এক : বিচ্ছিন্ন বা দুর্বোধ্য অংশের স্থান শূন্য রেখে পাঠ সম্পাদনা পদ্ধতি। শূন্য অংশ (স্টার) চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে এবং ফুটনোটে এর কারণ পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত বিলুপ্ত বা দুর্বোধ্য অংশ সম্পাদকের নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধি দ্বারা পূর্ণকরণ। সম্পাদক পূর্বের ও পরের বর্ণ বা শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নতুন শব্দ বা বর্ণ সংযোজন করতে পারেন। এমনি করে ছত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিলুপ্ত ছত্র সংযোজনও করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংযোজিত বর্ণ, শব্দ, ছত্র বা অংশ [] তৃতীয় বন্ধনী দ্বারা আবৃত করতে হবে। সম্পাদক এরূপ সংযোজনের কারণ বিষদরূপে ফুটনোটে উপস্থাপন করবেন।

ii. আভ্যন্তরীণ বিষয়

পুথির পাঠ সম্পাদনের পরে এর অন্তরঙ্গ বিষয় অর্থাৎ পুথির আভ্যন্তরীণ তথ্য বিশ্লেষণ আবশ্যকীয়।

১. পুথির পরিচিতি : পুথির পাঠোদ্ধার সম্পূর্ণ হলে এর আভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। সম্পাদনার নিমিত্ত গৃহীত পুথিটি কোন্ বিষয়ভিত্তিক, কি নাম, রচয়িতা কে, কোন সময়ে লিখিত হয়েছে প্রভৃতি সার্বিক বিষয়ের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এ অংশে লিপিবদ্ধ হবে।

২. পুথির গুরুত্ব আলোচনা : পুথিটি কোন্ উদ্দেশে কতটা প্রয়োজনে সম্পাদনা করা হচ্ছে তার সার্বিক বিশ্লেষণ এ অংশে উল্লিখিত হবে। সাহিত্যাঙ্গনে এর গুরুত্ব কতটা, সামাজিক ক্ষেত্রে এর মুল্য কি, পাঠক-গবেষক কতটা উপকৃত হবে ।।বিবিধ বিষয়েরই বিষদ আলোচনা এ অংশে আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

৩. কবি পরিচিতি : সম্পাদনার এক বিশেষ অঙ্গ কবি পরিচিতি। কাব্যের গুরুত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে কবির উপর। কবির জন্ম, আবাসস্থল, মৃত্যু, কাব্যরচনার সময়, বংশপরিচয় প্রভৃতি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বক্তব্য উপস্থাপিত হবে এ অংশে। কবির পরিচয় সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানের জন্য গ্রন্থের ভণিতা, পুষ্পিকা অবলোকন করা আবশ্যকীয়। কবির ভিন্ন কোন রচিত গ্রন্থ থাকলে তাও দেখা প্রয়োজন। কবির আবাসস্থলের কোন সন্ধান জ্ঞাত হলে সে স্থানে উপস্থিত হয়ে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

৪. ঐতিহাসিক মূল্যায়ন : নির্বাচিত পুথিটি কতটা ঐতিহাসিক ভিত্তি সমৃদ্ধ তা এ অংশে বিশ্লেষিত হবে। কবি কোন্ রাজা-বাদশাহর রাজত্বকালে কাব্যটি রচনা করেছেন, কোন রাজারাজড়ার সভাকবি ছিলেন কিনা, কোন শাসনকর্তার আদেশে কাব্যটি রচনা করেছেন কিনা প্রভৃতি বিষয় পুঙ্খানুপঙ্খরূপে উপস্থাপন করতে হবে। এ ছাড়া কাব্যের

বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন ঐতিহাসিক সত্যতা আছে কিনা, কোন চরিত্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত কিনা, কাব্যে উল্লিখিত কোন স্থান ইতিহাস সম্বলিত কিনা প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। কাব্যটি পূর্ববর্তী কোন বিখ্যাত গ্রন্থের সাদৃশ্যে রচিত কিনা সে বিষয়টিও মূল্যায়ন করা আবশ্যকীয়।

৫. সাহিত্যিক মূল্যায়ন : নির্বাচিত পুথিটি কতটা সাহিত্যিক মূল্য সমৃদ্ধ তা এ অংশে আলোচিত হবে। প্রাকৃতিক বর্ণনা, নর-নারীর রূপ বর্ণনা, বিলাপ চিত্র, যুদ্ধচিত্র, বিরহ, প্রেম, মিলন, বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয় কাব্যমধ্যস্থিত উদাহরণসহ আলোচিত হবে। কাব্যে প্রয়োগকৃত ছন্দ, অলংকার, শব্দ প্রভৃতি বিষয়ও উল্লিখিত হবে।

ছন্দ-অলংকার : কাব্যটি কোন্ ছন্দে রচিত, সম্পূর্ণ কাব্যটি একটি ছন্দে রচিত না একাধিক ছন্দে রচিত তা উদাহরণসহ আলোচিত হবে। বেশির ভাগ বাংলা পুথিতে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের এবং সংস্কৃত কাব্যে বহু ছন্দের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত বাংলা উভয় কাব্যেই একাধিক অলংকার ব্যবহৃত হতে পারে। নির্বাচিত কাব্যে কি কি অলংকারের প্রয়োগ ঘটেছে উদাহরণসহ তা উল্লিখিত হবে।

শব্দ প্রয়োগ : পুথি সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, একাধিক শব্দের সংমিশ্রণদ্বারা বেশির ভাগ পুথি আক্রান্ত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা পুথির ক্ষেত্রে। তৎসম, আরবী, ফার্সি, হিন্দী, ওড়িয়া, আসামী প্রভৃতি ভাষার প্রভাবদ্বারা পুথি প্রভাবিত হত। সম্পাদনায় এ বিষয়টি মনোযোগ সহকারে উদাহরণসহ চিহ্নিত করা আবশ্যকীয়।

৬. সমাজচিত্র : সাহিত্যমাত্রই সমাজের প্রতিফলন। কাব্যমধ্যে উল্লিখিত সমকালীন সমাজের সার্বিক চিত্র উদাহরণসহ এ অংশে উল্লিখিত হবে।

৭. কালাঙ্ক নির্ণয় : সম্পাদিত গ্রন্থটি কখন রচিত হয়েছে এবং কখন লিপিকৃত হয়েছে তা নির্ধারণ অত্যাবশ্যকীয়। সাধারণত গ্রন্থে এই কালাঙ্ক লিখিত হয় গাণিতিক সংখ্যায় এবং হেয়ালিমূলক শ্লোকে অর্থাৎ সংখ্যা প্রকাশক প্রতীকী শব্দের মাধ্যমে। নির্বাচিত পুথিটিতে এবং সহায়ক প্রতিলিপিসমূহে কোন পদ্ধতিতে কালাঙ্ক লিখিত হয়েছে তার বিষদ ব্যাখ্যা এ অংশে উপস্থাপিত হবে। অনেক সময় পুথিতে কালাঙ্ক লেখা থাকে না, সে সব ক্ষেত্রেও পুথির সার্বিক বিষয় যেমন :উপাদান, উপকরণ, গ্রন্থ মধ্যস্থিত বিষয়, কোন বিখ্যাত চরিত্র, রাজা বা পৃষ্ঠপোষক প্রভৃতি বিষয় পর্যালোচনার মাধ্যমে গ্রন্থের সময় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব।

৮. লিখনরীতি : সাধারণত লিপিকরগণ 'যৎ দৃশ্যতে তৎ লিখ্যতে' রীতি অনুসরণ করতেন। এ রীতি অনুযায়ী লিপিকৃত পুথির কালাঙ্ক যাই হোক না কেন ভাষা বৈশিষ্ট্য এবং লিখনরীতিতে বিদ্যমান থাকে লেখকের সময়ের লিখন রীতি। তবে লিপিকরের সময়ের লিখনরীতির ছাপও যে পড়ে না তা নয়। অনেক সময় কোন কোন লিপিকর পুথি অবিকল লিপি না করে মাঝে মধ্যে স্বপাণ্ডিত্য সংযোজনের চেষ্টা করতেন। এ বিষয়টি সংঘটিত হত শিক্ষিত লিপিকরদের ক্ষেত্রে। আবার কোন কোন লিপিকর পুথি লিপি করতে গিয়ে কোন শব্দ, বর্ণ বা ছত্র বুঝতে অক্ষম হলে সে স্থলে স্ব-বিদ্যানুযায়ী নতুন শব্দ, বাক্য অথবা ছত্র সংযোজন করতেন। এমনি করেই পুথিমধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে

লিপিকরদের সময়ের লিখনরীতির। সম্পাদককে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লেখক ও লিপিকরের লিখনরীতির পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে।

৯. ভাষাতাত্ত্বিক ও লিপিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ : মধ্যযুগে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রভাবে বাংলা উচ্চারণে একটা মিশ্ররীতি প্রচলিত ছিল। কোন কোন পুথিতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের পার্থক্য ছিল সুনির্দিষ্ট। আবার কোন কোন পুথিতে দীর্ঘ স্বরের অশুদ্ধ প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। আবার কোন কোন পুথিতে হ্রস্ব স্বর দীর্ঘরূপে এবং দীর্ঘস্বর হ্রস্বরূপে লিখিত হয়েছে। কখনও অ-কার ও-কারের মত, উ-কার ও-কারের মত, ও-কার ঔ-কারের মত, আ-কার উ-কারের মত লিখিত হয়েছে। স্বরধ্বনির মত ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রয়োগেও বাংলা পুথিতে দেখা যায় ণ>ন, য>জ, শ>স প্রভৃতি ধ্বনির পার্থক্য সঠিকরূপে রক্ষিত হয় নি। অন্ত্য মধ্যযুগেও উক্ত ধ্বনিসমূহের পার্থক্য সঠিকরূপে রক্ষিত হয় নি। তবে সমসাময়িক অনেক সংস্কৃতাশ্রিত বাংলা পুথির লিখনরীতিতে উক্ত ধ্বনিসমূহের পার্থক্য সঠিকরূপে রক্ষিত হয়েছে। সম্পাদক তার সম্পাদিত গ্রন্থে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির এ বৈশিষ্ট্যসমূহ নমুনাসহ প্রদর্শন করবেন।

মধ্যযুগের লিখনরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ধ্বনির লোপ, ধ্বনির আগম। এছাড়াও অপিনিহিতি, শ্রুতিধ্বনি, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি, সমীভবন, বিষমীভবন, মহাপ্রাণীভবন, অল্পপ্রাণীভবন প্রভৃতি ধ্বনিতত্ত্বের এ বিষয়সমূহ এবং রূপতত্ত্বের বচন, বিভক্তি, সর্বনাম, ক্রিয়াপদ প্রভৃতির প্রয়োগবৈচিত্র উদাহরণসহ সম্পাদক তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থে পর্যালোচনা করবেন।

১০. বিষয়বস্তু : সম্পাদিত পুথির বিষয় সংক্ষেপ সম্পাদক এ অংশে বিবৃত করবেন। এ প্রসঙ্গে সম্পাদক উল্লেখ করবেন, বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন না প্রাচীন কোন বিখ্যাত গ্রন্থের অনুকরণে রচিত অথবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্যে বা পরিকল্পনায় পরিকল্পিত হয়েছে।

১১. নির্বাচিত পুথি সমূহের লিপিকর পরিচিতি : সম্পাদনায় গৃহীত পুথিসমূহের লিপিকরদের সার্বিক পরিচিতি এ অংশে উপস্থাপিত হবে।

১২. সম্পাদনায় অনুসৃত পদ্ধতি : সম্পাদক পুথি সম্পাদনায় যে পদ্ধতি অবলম্বন করবেন এবং কেন তিনি এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন তার পূর্ণ ব্যাখ্যা এ অংশে উপস্থাপন করবেন। সম্পাদনায় সম্পাদকের স্বাধীনতা সর্বৈব। তাই সম্পাদক তার অভিরুচি এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যে কোন একটি, দুটি বা নতুন কোন পদ্ধতিও গ্রহণ করতে পারেন। মূলত সম্পাদক যাই গ্রহণ বা বর্জন করুন সবই পাঠকদের অবহিত করবেন।

১৩. নির্বাচিত প্রতিলিপির তুলনামূলক আলোচনা : একটিমাত্র পুথি নিয়ে সম্পাদনার ক্ষেত্রে এ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। একাধিক পুথি সহযোগে সম্পাদনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সকল পুথির একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা আবশ্যকীয়। সময়ের ব্যবধানে এবং লিপিকরভেদে লিখনরীতির, লিখন আকৃতির প্রভেদ ঘটে। বিভিন্ন শতকের ভাষারীতি, ভিন্নাকৃতির বানান রীতি, সময়ের প্রভাব পুথির লিখনরীতিকেও করে

প্রভাবান্বিত। বিশেষকরে বাঙলা ভাষার বিবর্তনমুখী সময়ে। এই বিবর্তনমুখী সময়ে লিপিকরগণ কেবল মাছি মারা কেরানীর মত সর্বত্র অনুলিপিকরণ রক্ষা করে চলতে সক্ষম হন নি। অনুলিপিকালে অনেক সময় কোন ছত্র বা অংশ দুর্বোধ্য অনুমানে লিপিকর সে স্থল পূরণ করতেন নিজস্ব জ্ঞানানুযায়ী। কোন কোন ক্ষেত্রে লিপিকর প্রতিলিপিকালে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিজস্ব বিদ্যা সংযোজন করতেন। আবার কখনও একজনে পাঠ করতেন অন্যজনে তা শুনে শুনে লিখতেন। আর যিনি লিখতেন তিনি তার যুগের লিখনরীতির এবং নিজস্ব বিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটাতেন। এরূপ নানাবিধ কারণে লিপিকরের সময়ের লিখনরীতিদ্বারা পুথি হতো আক্রান্ত। ফলে একই পুথির প্রতিলিপিতে লিপিকরভেদে এবং কালের ব্যবধানে সৃষ্টি হয় নানারূপ বৈসাদৃশ্য। এ জন্য সম্পাদনায় গৃহীত একাধিক পুথির তুলনামূলক পর্যালোচনা অত্যাবশ্যকীয়।

১৪. নির্বাচিত পুথি সমূহের বর্ণনামূলক পরিচিতি : সম্পাদনার নিমিত্ত গৃহীত সমুদয় পুথির বর্ণনামূলক পরিচিতি অত্যন্ত আবশ্যকীয়। এ অংশে প্রতিটি পুথির পৃথক পৃথক রূপে সার্বিক বর্ণনা উপস্থাপিত হবে। প্রতি পুথির বিস্তৃত বর্ণনার সঙ্গে প্রথম, মধ্যভাগ, শেষাংশ এবং বিশেষ বিশেষ অংশের (ভণিতা, পুষ্পিকা) কিছু নমুনা পাঠ উপস্থাপিত হবে।

১৫. ভণিতা ও পুষ্পিকা বিশ্লেষণ : প্রাক্‌মুদ্রণ যুগের পুথি সাহিত্যে ভণিতা অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে আসছে। নিজের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই ভণিতার জন্ম। রচয়িতা ছন্দের সূত্রে আবদ্ধ করে রাখতেন নিজের পরিচয়। ভণিতা লিখিত হত গ্রন্থের আরম্ভে, অধ্যায়শেষে এবং গ্রন্থশেষে। কখনও কখনও গ্রন্থমাঝে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ভণিতার অবতারণা ঘটে থাকে। অনেক সময় কোন গায়েন কবি বা লিপিকর স্বখ্যাতি অর্জনের জন্য মূল কবির নামের বিনিময়ে নিজের নামের ভণিতা লিপিবদ্ধ করতেন। সম্পাদককে তার নির্বাচিত গ্রন্থের ভণিতা অংশ সম্পর্কে তাই অত্যন্ত সতর্কতা এবং বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

পুষ্পিকা : গ্রন্থশেষে লিপিকরের আত্মবিবরণীমূলক অংশই পুষ্পিকা। সম্পাদক নির্বাচিত সমুদয় প্রতিলিপির এই পুষ্পিকা অংশ উপস্থাপন করবেন।

১৬. সংশোধিত শব্দ বা শব্দের তালিকা : লিপিকরদের দ্বারা পুথিতে নানা পাঠ বিকৃতি ও ভুলের সমাবেশ ঘটে থাকে। সম্পাদনার ক্ষেত্রে পুথির এ ভুল সংশোধন করে লেখার নিয়ম প্রচলিত। সম্পাদক পুথির কোন অংশ কতটুকু সংশোধন করলেন তার বর্ণানুক্রমিক তালিকা এ অংশে সন্নিবেশিত হবে।

এতদ্ব্যতীত সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদককে এটাও বিশেষভাবে দেখতে হবে যে, নির্বাচিত পাণ্ডুলিপিটির লেখা লেখককৃত, না লিপিকরকৃত। যদি লিপিকরকৃত হয় তাহলে অন্যকোন প্রতিলিপি আছে কিনা তা 'New Catalogus Catalogorum'-এর মাধ্যমে জেনে নিয়ে সংগ্রহ করতে হবে। কেননা লিপিকরকৃত একাধিক পাণ্ডুলিপি থাকলে একটা পাণ্ডুলিপির সাহায্যে সম্পাদনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। এতে বিষয়বস্তু মূলাশ্রয়ী এবং শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া পাণ্ডুলিপির যত বেশি অনুলিখন

হয়েছে, ভুলের সংখ্যাও তার তত বেশি। তাই সম্পাদনার ক্ষেত্রে মূল কপি পাওয়া না গেলে প্রথম দিকের লিপিকৃত পাণ্ডুলিপি বেশি নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

লেখকের সময় নিরূপণও সম্পাদকের একটি করণীয় বিষয়। অধিকাংশ প্রাচীন পুথিতেই সময় সম্পর্কে কিছু লেখা থাকে না। এসবক্ষেত্রে সম্পাদক ধৈর্য এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করলে সময় সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন। যেমন—পাণ্ডুলিপিটির লেখার উপাদান কি, কিরূপ কালির সাহায্যে লিখিত, লেখার রীতি বা বৈশিষ্ট্য কিরূপ প্রভৃতির সঙ্গে অন্য কোন তারিখ—যুক্ত কয়েকটি পুথির এসব উপকরণ মিলিয়ে একটা ধারণা নেওয়া যেতে পারে। লেখক ও লিপিকরের নাম ও সময়ের সূত্র ধরে এবং লিপিকরের আত্মবিবরণী-মূলক পুষ্পিকা অংশের খুঁটিনাটি বিষয়ের মাধ্যমে সময় সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে নির্বাচিত গ্রন্থের লিপিকর অন্য যে-সকল গ্রন্থের অনুলিপি করেছেন সেগুলিরও পুষ্পিকা অংশ দেখে নিতে হবে।

গ্রন্থে উল্লিখিত স্থান, পাত্র-পাত্রীর নাম, বিভিন্ন সমাজের ঘটনা এবং পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মাধ্যমেও সময় সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

উপরে উল্লিখিত বিষয়সহ সম্পাদককে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনে আরও বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক সময় সম্পাদককে আলোচ্য তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বকীয় সিদ্ধান্তও নিতে হয়। এভাবে সমগ্র বিষয়টিই খুব আয়াসসাধ্য। কিন্তু গন্তব্য যতই দুর্গম হোক সম্পাদকের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অনলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সকল প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। আর তারপরেই বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির সম্পাদনার মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র ও তথ্যভাণ্ডার ঋদ্ধ হতে পারে।

গ. সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কতিপয় অনুশাসন

পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা একটি জটিল বিষয়। যে-কোনো পাণ্ডুলিপির সম্পাদনায় সম্পাদককে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং তাকে লিখন পদ্ধতি থেকে আরম্ভ করে কালি, কাগজসহ বিবেচনায় রাখতে হয় বহুবিধ বিষয়। অধিকতর প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা স্বাভাবিকভাবে আরও জটিল। অথচ নতুন নতুন তথ্য ও জ্ঞানান্বেষণে আমাদের ঋদ্ধিশালী প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়।

সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি এবং সাধারণভাবে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা সম্পর্কিত কতগুলি স্মর্তব্য বিষয় এখন আলোচিত হচ্ছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে অদ্যাবধি আমাদের এবং বিশ্বের সুধীসমাজের যে পরিচিতি তার প্রায় সবটারই মাধ্যম হল সম্পাদনা। চিরায়ত সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার প্রারম্ভ থেকে শেষাবধি পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিপি-প্রতিলিপি এবং পরবর্তী সময়ে তা থেকে বিভিন্নভাষী সুধীজনের বিবিধ ভাষায় সম্পাদনার ফলে বঙ্গদেশের বঙ্গ-ভাষীরাও সংস্কৃত সাহিত্য-সম্ভারের রসাস্বাদনে সক্ষম হয়েছে। আমাদের একটা বৈশিষ্ট্য এবং যা কখনোই

গৌরবের নয় তা হল, আমাদেরই ঘরের সম্পদ যা একান্ত আমাদেরই ঐতিহ্যে লালিত তা যতক্ষণ না ভিন্ন দেশী বিভাষী কেউ দেখিয়ে দিয়েছে ততক্ষণ তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি এবং সেখানে নেয়া হয়নি যথোচিত প্রযত্নও। তাই দেখা যায় সংস্কৃত ভাণ্ডারের দ্বার প্রথম উন্মোচিত হয়েছে বিদেশীদের হাতে। পাশ্চাত্য লণ্ডনে প্রথম সম্পাদিত হয় ঋগ্‌বেদ এবং আরও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ। কালক্রমে বিভিন্ন দেশে এবং ভারতে কিছু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাকারে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু সুদীর্ঘকালব্যাপী সংস্কৃত সাহিত্য সৃষ্টির যে অগণনীয় নমুনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার তুলনায় এই সম্পাদনা ও প্রকাশনা অতি নগণ্য। এবং অনেককাল অতিবাহিত হলেও নতুন ধরনের কোন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা ও প্রকাশনা আমাদের তেমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। বিশেষ করে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশে অদ্যাবধি কোন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির সম্পাদিত রূপ দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। অথচ আমাদের চারপাশে রয়েছে অপ্রকাশিত অসংখ্য সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি। কিন্তু এর প্রতি আমাদের ক'জনের দৃষ্টি নিবদ্ধ? এখানে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন এসে যায় একাধিক। সংস্কৃতে কি আর কোন মূল্যবান সৃষ্টি নেই? অথবা কোন বিদেশী কি আর সেই মূল্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছেন না? এবং সে কারণেই কি আমাদের সম্পদ আমাদের কাছে রয়ে গেছে মূল্যহীন হয়ে? কিন্তু বাঙালীদের মেধায় ও মননে মূল্য বোঝার মত ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে এবং তার স্বাক্ষরও রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তবে অনেক বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা না করা এবং বুঝতে না চাওয়ার পিছনে আমাদের নানাবিধ মানসিকতা রয়েছে। এর মধ্যে আমাদের চরম ঔদাসীন্য এবং নিদারুণ আলস্য গবেষণায় ও আবিষ্কারে একটি প্রচণ্ড অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি গবেষণায় বাস্তব সমস্যাও অনেক।

প্রথমত, সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলি সাধারণত যে লিপিতে লেখা হয়েছে তা বর্তমান বাংলালিপি থেকে ভিন্নতর হওয়ায় রীতিমতো দুর্বোধ্য বিষয়। নিরলস চর্চা ছাড়া এর পাঠোদ্ধারের সম্ভাবনা খুবই কম।

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত ভাষাটা সহজায়ত্ত নয়। এ ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনে সময় ও শ্রমের প্রয়োজন যথেষ্ট। অষ্টাদশ/ঊনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে আমাদের দেশে সংস্কৃত চর্চা ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বেশ কিছু চর্চা ছিল। বর্তমানে সংস্কৃতের যে চর্চা এখনও অব্যাহত তা খুবই সীমাবদ্ধ পর্যায়ে। তাই সাধারণ প্রয়োজনের বাইরে সৃষ্টিশীল কিছু করার জন্য যে শ্রম ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তার প্রচণ্ড অভাব এখানে পরিলক্ষিত। আমাদের ঔদাসীন্য ও অলসতা আমরা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না।

তৃতীয়ত, সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে এবং বিশৃঙ্খল অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে ভিনদেশী অর্থ-সহযোগিতায় পাণ্ডুলিপিগুলিকে শৃঙ্খলায়িত করার একটা প্রয়াস চলছে মাত্র।

যাই হোক আমাদের প্রাপ্ত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির মধ্য থেকে যেগুলি মূল্যবান সেগুলি সংগ্রহ করে যথাযথ ভাবে সম্পাদিত এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সম্পাদনার জন্য সম্পাদককে যে বিষয়গুলি অবশ্য জানতে হবে তা হল—

১. প্রাচীন পাণ্ডুলিপির রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা বা জ্ঞান রাখতে হবে। অর্থাৎ সম্পাদককে প্রাচীন লিপির নির্ভুল পাঠোদ্ধার পদ্ধতি জানতে হবে। তার সম্যক ধারণা রাখতে হবে লিপি সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে—যেমন কাগজ, কালি, রং, আকার, রীতি প্রভৃতি।
২. সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান রাখতে হবে। নির্ভুলভাবে সংস্কৃত শব্দের অর্থ বুঝতে না পারলে ছন্দ, অলংকার, ব্যাকরণ, সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে সম্পাদনা করা অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং তা হবে হাস্যকরও।

নবম অধ্যায়

লিপিকর

ক. লিপিকর

লিপি + কর (কৃ + ট, অন্ কর্তৃ), যে নকল তৈরি করে। অর্থাৎ পুথি লিপিকারী এক শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষ। প্রাচীনকালে যখন মুদ্রণযন্ত্র ছিল না তখন এরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হস্তলিখিত পুথি নকল করতেন। মূল পুথি কিংবা তার কোন অনুলিপি দেখে পুনরায় কপি করা হত। লিপিকরদের কেউ কেউ পুথির শেষে শ্লোকাকারে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিতেন; কেউ কেউ পুথির লিপিকালও লিখে রাখতেন। যেমন: (সংস্কৃত পুথি) ইতি রত্নাকরং সুপ্তং রামলোচনশর্মণা। লিখিতং বহুযত্নেন বর্ণাশুদ্ধং ত্যজেদ্বুধঃ॥ (কৌতুকরত্নাকর)। (বাংলা পুথি) আবদুল্লার পুত্র আমি সবা হন্তে হীন। হাওলা গেরাম জান উদ্দেশিয়া চিন॥ ... যেই মতো দেখি আমি সেই মতো লেখি। অপরাধ ক্ষেম মোর গুণিগণে দেখি॥ বিংশ আষ্ট মাঘী জান আর বারশত। তারিখ আষাঢ় জান বাব দিন হৈল। সেইদিন এই পুস্তক লেখা হৈল॥ (ঢা.বি. ৬২৪) পুথি যাতে কেউ চুরি না করে সেজন্য কোন কোন লিপিকর শেষপত্রে অনেক কটূক্তি বা অভিশম্পাত বাক্য লিখে রাখতেন। যেমন: যত্নের লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ। মাতা চ শুকরী তস্য পিতা গর্দভঃ॥ পুথি কিভাবে রক্ষা করতে হয় সে সম্পর্কেও শেষপত্রে নানা উপদেশবাক্য লেখা থাকত। যথা: (সংস্কৃত পুথি) যস্য হস্তগতং ভূয়াদেত্তস্মৈ নিবেদয়ে। প্রাণতুল্যমিদং রক্ষ্যং পণ্ডিতস্যৈব পুস্তকম্॥ (বাংলা পুথি) পুথিকে পুত্রের ন্যায় পালবে, শত্রুর ন্যায় বাঁধবে। সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষার পুথিই এই লিপিকরদের মাধ্যমে লিপিকৃত হয়ে শিক্ষার্থী এবং সাধারণ পাঠকের হাতে পৌঁছে যেত। মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই পেশার বিলুপ্তি ঘটে। তার আগে পর্যন্ত বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

খ. লিপিকরের প্রকারভেদ

পুথি অনুলিপি অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ কাজ ছিল। সকলে এ কাজে সহজে আগ্রহান্বিত হতেন না। বিশাল বিশাল পুথি মাসের পর মাস বছরের পর বছর বসে অনুলিপি করতে। এতে অনেকের মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যেত। অনেক সময় একজনে লিখতে লিখতে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র অথবা স্বজনদের কেউ অবশিষ্ট অংশ সমাপ্ত করতেন। প্রাচীন যুগে পুথি ছির সাধারণের ধরা ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে। তখন উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যতীত পুথি অনুলিপি করতে পারতেন না। যুগের পরিবর্তনে ক্রমান্বয়ে সাধারণ ব্রাহ্মণগণ ও পুথি অনুলিপি করতে আরম্ভ করেন। পুথি অনুলিপি-প্রতিলিপিকরদের নামের শেষে প্রায়শ শর্মা পদবী দৃষ্ট হয়। যেমন—

শ্রীকালীনাথশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিদং পুস্তকঞ্চ।

তবে 'শর্মা' অনেকের বংশীয় উপাধি হলেও এটি মূলত ব্রাহ্মণদের নামের শেষে প্রযোজ্য উপপদ বিশেষ।

ধীর ধীরে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কায়স্থ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ও পুথি অনুলিপি করার কাজে নিযুক্ত হতে থাকে। যেমন—

শ্রীরাম চন্দ্র দাসেন লিখ্যতে গ্রন্থ সংহিত।
লিং হরিনারায়ণ দত্ত।
লেখিতং স্বাক্ষর শ্রীহীন মোহাম্মদ ফাজিল।
লিখিতং আজিজুর রহমান।

প্রাপ্ত পুথিটি লিপিকরকৃত কিনা তা নির্ধারণের কিছু নিয়ম রয়েছে। লিপিকরগণ পুষ্পিকাংশে তাদের নামের পূর্বে কিংবা পরে স্বাক্ষরম্, লিখিতম্, লিং, লিপিরিয়ং প্রভৃতি শব্দ লিপিবদ্ধ করতেন। যেমন—

শ্রীরামদেব দেবশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরমিদম্।
শ্রীগঙ্গেশদেব শর্ম্মণা লিখিতং স্বকীয় পুস্তকম্।
লিং হরিনারায়ণ দত্ত।
শ্রীমধুসূদনদেব শর্ম্মণো লিপিরিয়ং পুস্তকঞ্চেতি।

সাধারণত লিপিকরদের শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন—

১. শিক্ষিত

অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সময়ের লিপিকরগণ পাণ্ডিত্যে অধিকারী ছিলেন। তাঁরা নির্ভুলভাবে পুথি প্রতিলিপি করতেন। শিক্ষিত প্রতিলিপিকরগণের বদৌলতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। লিপিকর পরম্পরায় যুগ-যুগান্তের সাহিত্য সম্ভার বিলুপ্তি থেকে রক্ষিত হয়েছে। অনেক লিপিকর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা পুথি অনুলিপি শেষে সংস্কৃত ভাষায় পুষ্পিকা লিখতেন। যেমন—

১. সমাপ্তশ্চায়ং মধ্যখণ্ডঃ। পক্ষৌবেদঘটে চন্দ্রে মানে শাকস্য সংখ্যক। পৌষে মাস্যসিতে পক্ষে দশম্যাং ভৃগুবাসরে। নত্বা বৃন্দাবনং শ্যামং কৃষ্ণং গোপীজনপ্রিয়ং। লিখতে চ শ্রীচৈতন্য চরিততামৃত সংগ্রহঃ। নানাযত্ন কৃতেনৈব নানাক্লেশ সহিষ্ণুনা। শ্রীরামচন্দ্রদাসেন লিখ্যতে গ্রন্থসংহিতঃ। শ্রীরাধায়ৈ নমঃ। যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং ইত্যাদি।

২. ইতি সুত্রাদিমধ্য শেষখণ্ডঃ ॥ হরিঃ ॥ চন্দ্রাকাশ হয় খিতিঃ শকের নির্নয় ইতিঃ তীর্থ (তিথি) পৌর্ন্নমাশী সুরগুরুঃ অর্দ্ধ মেষে শশী নারিঃ ভবনে বিখ্যাত হরিঃ বনি যোগেন্দ্র অতি চারুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলাঃ শিখরীনি কর লীলাঃ অধিক অমৃত পদে পদেঃ চৈতন্য মঙ্গল নামঃ ভক্তিরস প্রেমধানঃ শ্রীলোচনানন্দ মুখোপাদিতেঃ বিলিখিত বৃন্দাবনঃ গ্রন্থ রত্নাধিক ধনঃ দর্শন স্পর্শন শ্রুতি আসঃ জয়তি শ্রীগৌরঙ্গ চন্দ্রঃ শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ গদাধর আদি শ্রীনিবাস ॥ শ্রীহরি ॥ শ্রীজিত নারায়ণরায়স্য গ্রন্থোহয়ং ॥ কৃষ্ণচৈতন্য ॥ যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ। মাতা চ সুকরী তস্য পিতা গর্দ্দভঃ ॥ শ্রী হরয়ে নমঃ ॥

শিক্ষিত লিপিকরগণ পুষ্পিকাংশে অনেক মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ করতেন। যা রচয়িতা সম্পর্কিত নানা তথ্য উদ্ঘাটনে সহায়ক হত এবং প্রতীকের মাধ্যম যে কালাঙ্ক তারা লিখতেন তা তাঁদের অগাধপাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে।

২. অল্পশিক্ষিত

মধ্যযুগ থেকে প্রতিলিপি বা অনুলিপিকরণ ব্যবসায়ে পরিণত হয়। এ সময়ে অর্থ উপার্জননিমিত্ত অনেক অল্পশিক্ষিত লোক পুথি প্রতিলিপি কর্মে নিযুক্ত হতেন। তাঁরা পুথি অনুলিপি করতেন স্ব স্ব বিদ্যানুযায়ী। এদের মধ্যে কেউ কেউ 'মাছি মারা কেরানীর মত' অথবা 'যৎ দৃশ্যতে তৎ লিখ্যতে' নিয়মে পুথি অনুলিপি করতেন। এর ফলে প্রাচীন কালের অনেক বর্ণলিপি লিপিকরের সময়কালে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আবার অনেক লিপিকর শুনে শুন পুথি অনুলিপি করতেন। অর্থাৎ একজনে পাঠ করতেন অন্য জনে তা শ্রবণ করে লিপিবদ্ধ করতেন, এবং স্বভাবত যিনি লিখতেন তিনি তাঁর আক্ষরিক জ্ঞান অনুযায়ী লিখতেন। এ পদ্ধতিতে লিপিকরের সময়কালের লিখনরীতি পুথিমধ্যে লিপিবদ্ধ হত।

৩. অশিক্ষিত

অল্পজ্ঞানী অর্থাৎ কেবলমাত্র আক্ষরিক জ্ঞানটুকুই বর্তমান এমন লোকেরাও অর্থ লোভে পুথি অনুলিপি করতেন। অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত লিপিকরদের একই পর্যায়ভুক্ত করা যায়। কারণ অক্ষরজ্ঞান থাকা মানেই অল্পশিক্ষিত, আবার অধিক জ্ঞান না থাকা মানেও অল্পশিক্ষিত। এদের ভুলের প্রকৃতিটা অনকটা একই রকম। এই অল্পশিক্ষিত ও

অশিক্ষিত লিপিকরের মাধ্যমে পুথিমধ্যে নানারূপ পাঠ বিকৃতির সৃষ্টি হত। অনেক সময় লিপিকররা তাদের অল্পজ্ঞানের কথা নির্দ্বিধায় পুথি অনুলিপিশেষে পুষ্পিকাংশে লিপিবদ্ধ করতেন। যেমন—

১. মোঞি হিন অল্প বোদ্ধি সেবক জানিআ.॥
শ্রী ততানা আলি বালকে লিখি পুস্তত অরিআ।
মোঢ়মতি অল্প বোদ্ধিসেবক জানিআ।
মোহাজনে দোস ঢাকি গোন (গুণ) প্রচারিআ ॥

২. য়পরাদ মাগি য়ামি সভার চরন।
ইকার আকার অক্ষর পরিয়া থাকয়ে।
পণ্ডিত সকলে দোস খেমিবা নির্চয়ে ॥
য়াসলেতে যেইয়াছে লেখীছি সেই পদ।
গালি না পারিয় সবে করিয়ে তেমৎ ॥
জাদি সে য়াসুদ্ধ হএ সুদ্ধ করি দিবা।
গবিব দেখিতে দোস সব খেমিবা ॥

এই অশিক্ষিত লিপিকরগণ অর্থের লোভে পুথি অনুলিপি করে অনেক সময় অনুসোচনা করতেন। এবং সে অপরাধবোধ পুথিমধ্যে লিপিবদ্ধ করতেন। যেমন—

না বাঝি লেখি আছি বুদ্ধি নহি ভাবি।
অসুদ্ধ লেখিলে সুদ্ধ করিঅ পাঞ্চালি ॥
নিরবধি ব্যাম মন মজুনু চরিত।
মিচকিন ফাজীল আর খুদ্রপাপ অতুলিত ॥
মার সম পাপি নাহি সংসার ভিতরে।
মুসি মুক্তা ছর্দ্ধা করিব পাপ [ডরে] ॥
দয়ালে করিলেদয়া সেই মোর আসা।
সরিরে নাহিক পুন্যের ভরসা ॥

গ. লিপিকরের প্রয়োজনীয়তা

পুথি সাহিত্যে লিপিকরের ভূমিকা অপরিসীম। এক কথায় আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে/অস্তিত্বকে চিনেছি-বুঝেছি-দেখেছি এই লিপিকরদের কল্যানে। সেই সুদূর অতীতের সাহিত্যকৃতি কে কেমন করে কোন উপাদানে রচনা করেছিলেন তার চিহ্ন গেছে বিলীন হয়ে, কিন্তু কি রচিত হয়েছিল তা আমরা প্রাপ্ত হয়েছি কেবলমাত্র লিপিকরদের শ্রমের বিনিময়ে। লিপিকরগণ গ্রন্থ দেখে দেখে অনুলিপি করতেন। সে অনুলিপি থেকে আবার কোন লিপিকর প্রতিলিপি করতেন। এমনি করে একের পর এক অনুলিখনের মাধ্যমে যুগ-যুগান্তের সাহিত্যকৃতি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষিত হয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সাধারণত লিপিকরগণ পুষ্পিকাংশে আত্মবিবরণীমূলক কিছু অংশ লিপিবদ্ধ করতেন। এ অংশে নিজের নাম, বংশ পরিচয়, পুথি লিপির কালাঙ্ক, রচয়িতার পরিচয়, সময় বা কালাঙ্ক, গ্রন্থসম্বন্ধীয় নানা বিবরণ সমসাময়িক বিভিন্ন তথ্য, পৃষ্ঠপোষক রাজা বা জমিদারদের পরিচিতি, পুথি সংরক্ষণের সংরক্ষক পরিচিতি, পুথি অনুলিপিকরণের বা গ্রন্থ রচনার আদেশদাতার পরিচিতি প্রভৃতি গুরুত্বপুর্ণ অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করতেন। এ ছাড়া পুথি পাঠের প্রয়োজনীয়তা, পুথি রক্ষণাবেক্ষণের উপদেশ, পুথি নষ্ট করা বা চুরি করার কুফল এবং তাদের জন্য অভিসম্পাত বাক্য, পুথি লিপি করতে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থা, কোন্ লগ্নে, কোন্ তিথিতে, কোন্ দিকে ফিরে কতদিন যাবৎ পুথি লিপি করলেন, কত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুথিটি লিপি করলেন প্রভৃতি বিষয় লিপিবদ্ধ করতেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রচয়িতাগণের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল নিজেকে অন্তরালে রাখা। হয়ত তাঁরা কিছু সৃষ্টি করেই আনন্দ পেতেন, চাইতেন না তার কোন প্রতিদান এজন্য অধিকাংশ রচয়িতা কাব্যমধ্যে নিজের পরিচয় রাখতেন লুকিয়ে। পরবর্তী লিপিকরগণ অনেক কবির পরিচিতি পুষ্পিকাংশে লিপিবদ্ধ করতেন। এভাবে লিপিকরদের মাধ্যমে অনেক অজানা তথ্য উদ্ঘাটন সম্ভব হতে পারে। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগের গোড়ার দশক পর্যন্ত লিপিকরদের অনুসন্ধান করা হত সাহিত্যকৃতিতে কালজয়ী করতে আর বর্তমান লিপিকরদের জীবন-বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করা হয় গবেষণায় সফলতা অর্জনের জন্য। এখনও ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করা হয়, প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখার অভিপ্রায়ে।

লিপিকর প্রমাদ

ঘ. লিপিকর প্রমাদ কি?

পাণ্ডুলিপি অনুলিখনে লিপিকর কর্তৃক যে ভুলের সমাবেশ ঘটে তাকে লিপিকর প্রমাদ বলে। সুদূর অতীতে যে সব সাহিত্যকৃতি যুগপরম্পরায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তার একমাত্র মাধ্যম হল লিপিকরগণ। যে গ্রন্থ লিপিকরের স্পর্শে ধন্য হয় নি সে গ্রন্থ কালের অন্তরালে বিলীন হয় গেছে। লিপিকরগণ পূর্ববর্তী লেখকের হাতের লেখা কোন গ্রন্থ দেখে দিনের পর দিন, মাসের পর এমনকি বছরের পর বছরও বসে বসে পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করতেন। বড় বড় গ্রন্থ অনুলিপি করতে একে যুগও লেগে যেত। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লিপিকরগণ পুথি অনুলিপি করতেন। তার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। গ্রন্থ যে যত্ন সহকারে অনুলিপি করতে হয় তা প্রতিলিপি শেষে লিখে রাখা হত। যেমন—

> যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ।[১]
> জতনে লিখিলাম পুস্তক যে করিবে চুরি।[২]

কিন্তু লিপিকরদের এই প্রযত্ন সত্ত্বেও প্রতিলিপি কণ্টকিত হত নানাপ্রকার ভুলরূপ কণ্টক দ্বারা। অনুলিপিকাল একই হাতের লেখা অধিকক্ষণ দেখতে দেখতে সম্ভবত তাদের চোখের এবং মনের বিভ্রান্তি ঘটত, এবং তা নিতান্তই স্বাভাবিক। এমনি করে

চোখের এবং মনের অজান্তে কিংবা বোধগম্যতার অভাবে প্রতিলিপি আক্রান্ত হত নানাপ্রকার ভুল ভ্রান্তি বা ত্রুটি বিচ্যুতিদ্বারা। এসব ভুল ভ্রান্তি লিপিকর-প্রমাদরূপে বিবেচিত। লিপিকরদেব এ ভুলগুলি সংঘটিত হত দুইভাবে।

১. অনিচ্ছাকৃত ভাবে
২. ইচ্ছাকৃত ভাবে

১. অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো সংঘটিত হত সম্পুর্ণরূপে চোখের এবং মনের অজান্তে। অনুলিখনকালে এভাবে একটি বর্ণ, শব্দ, শব্দাবলি, ছত্র এমনকি পত্রও বাদ পড়ে যেত চোখের অন্তরালে। পাণ্ডুলিপিতে এক লাইনে অনেকগুলি পংক্তি লিখিত হত। পর পর দুটি লাইনের কোথাও একই শব্দ বা নাম লিখিত হলে প্রথম লাইনের শব্দটির পরে দ্বিতীয় লাইনের অনুরূপ শব্দটি লেখা হয়েছে এ ভ্রমে পরবর্তী অংশটি পূরণ করে যেতেন লিপিকর। যেমন—

সর্ব্ব সবা বসিলেক দেখিবার রণ।
কৃষ্ণ সমে বসিলেক পাণ্ডব নন্দন ॥

এখানে প্রথম ছত্রের "সর্ব্ব সবা বসিলেক" লেখার পর দৃষ্টিভ্রমের জন্য লিপিকর দ্বিতীয় ছত্রের 'বসিলেক' শব্দের পরে লিখে গেলেন' পাণ্ডব নন্দন'। অর্থাৎ ছত্রটি হল "সর্ব্ব সবা বসিলেক পাণ্ডব নন্দন"। ফলে

" দেখিবারে রণ" এবং "কৃষ্ণ সমে বসিলেক" শব্দগুলি বাদ রয়ে গেল। এছাড়া ঐ লাইনের পরবর্তী পংক্তিগুলিও বাদ পড়ে গেল। এভাবে একাধিক ছত্রও বাদ পড়ে যেত। এতে সৃষ্টি হত অন্তমিলের। ফলে মূল কাব্য থেকে শব্দবিচ্যুতি ঘটত। দুরূহ হত অর্থোদ্ধার। এরূপ লিপি প্রমাদ প্রতিলিপিকৃত সব পাণ্ডুলিপিতেই কিছু না কিছু দৃষ্টিগোচর হয়। পাণ্ডুলিপি প্রতিলিপি করার সময় লিপিকররা আরেকটি বড় ভুল অনেক সময় করতেন, তা হল—দৃষ্টিভ্রমের কারণে একটি পত্রের স্থলে দুটি পত্র উল্টিয়ে অজান্তেই ক্রমে রক্ষা করে লিখে যেতেন।

২. ইচ্ছাকৃত ভুল সংঘটিত হত তিন প্রকারে

ক. পরিযোজন
খ. পরিবর্জ্জন
গ. পরিবর্তন

ক. পুথি অনুলিপি করতে গিয়ে কখনও কখনও লিপিকর কোন শব্দ, কোন বাক্য অথবা কোন ছত্র বুঝতে অক্ষম হলে সে স্থলে নিজের বিদ্যানুযায়ী অথবা অনুমানের উপর ভিত্তি করে নতুন শব্দ বা ছত্র সংযোজন করতেন। অল্প শিক্ষিত লিপিকরদের ক্ষেত্রে এই নতুন সংযোজন সৃষ্টি করত নতুন ভুলের। যেমন—

দুই যুদ্ধে বিশাবদ দুই মহাবল। ঢা.বি.পা. সাং: ৪১৯৬

লিপিকর বুঝতে না পেরে লিখলেন—

দুই মহাসুর রণে দুই মহাখল। ঢাবি. পা. সাং: ২০২৫

অনেক সময় কোন কোন লিপিকর পুথি অবিকল লিপি না করে মাঝে মধ্যে নিজের পাণ্ডিত্য সংযোজনের চেষ্টা করতেন। এতে মূল বিষয় এবং সঠিক অর্থ থেকে কাব্যের বিচ্ছিন্নতা ঘটত।

খ. কখনও কখনও লিপিকর দেখে দেখে লিপি করতে গিয়ে কোন অংশ বুঝতে না পারলে সে অংশ বাদ রেখে লিখে যেতেন। এভাবে শব্দ, চরণ এবং অনুচ্ছেদও বাদ রেখে লিখে যেতেন। এরূপ পরিবর্জনকৃত লিপিকর-প্রমাদ অশিক্ষিত লিপিকরদের ক্ষেত্রে অধিক পরিলক্ষিত হয়।

গ. অনেক সময় কোন কোন লিপিকর অনুলিপিকালে শব্দ বা ছত্র পরিবর্তন করে লিখতেন। পরিবর্তিত এ শব্দ বা ছত্রগুলি কখনও কখনও সৃষ্টি করত নতুন সমস্যার। কেননা অনেক ক্ষেত্রে নতুন শব্দের অর্থের সঙ্গে মূল কাব্যের বিষয় এবং অর্থের সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হত। যেমন—

মোব বাহুবলে ভুঞ্জ হস্তিনাপুর। ঢা.বি.পা.সং: ৪১৯৬

এটিকে পরিবর্তন করে লিপিকর লিখলেন—

মোব বাহুবলে তবে দেখুক সর্ব্বপুর। ঢা.বি.পা.সং: ২০২৫

তবে অনেক শিক্ষিত লিপিকর তাদের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা অর্থের ব্যত্যয় না ঘটিয়ে শব্দ পরিবর্তন করতেন। যেমন—

চূর্ণ্ন হইয়া পড়ে বৃক্ষ হাসে ভুতনাথে। ঢা.বি.পা.সং: ৪১৯৬
লিপিকর লিখলেন, চূর্ণ্ন হইয়া পড়ে বৃক্ষ হাসে জগন্নাথে। ঢা.বি.পা.সং: ২০২৫

তবে পুনি সেই দুঃখ হইব য়াচম্বিত। ঢা.বি.পা.সং: ৪১৯৬
তবে পুনি সেই দুঃখ হইবে উপস্থিত। ঢা.বি.পা.সং: ২০২৫

এখানে লিপিকরের "য়াচম্বিত" শব্দটি মনঃপূত হয়নি। তাই তিনি পরিবর্তন করে লিখেছেন "উপস্থিত"। এভাবে অনেক সময় মূল কাব্যের শব্দ লিপিপরম্পরায় পরিবর্তিত হতে হতে বহু দূর চলে যেত। পাণ্ডুলিপির এই লিপিকর প্রমাদ সেই প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের প্রথম দশক পর্যন্ত চলেছে। তবে প্রাচীন যুগে পাণ্ডুলিপিতে লিপিকর প্রমাদ কম ছিল। তখনকার লিপিকররা ছিলেন শিক্ষিত। মধ্যযুগের লিপিকৃত পাণ্ডুলিপিতে লিপিকর প্রমাদ বেশি লক্ষণীয়। কারণ তখন অল্পশিক্ষিত এমনকি কেবল অক্ষরজ্ঞান সম্বলিত লোকেরাও পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করতেন। এসব লিপিকরদের দ্বারা নানা ক্ষেত্রে পুথি বিভ্রান্তির শিকার হত।

দশম অধ্যায়

পাণ্ডুলিপির পাঠবিকৃতি

ক. পাঠবিকৃতি

পুথি দেখে দেখে অনুলিপি করার প্রাক্কালে লিপিকরকর্তৃক পাঠের যে ভুল-ভ্রান্তি হত তাকেই পাঠবিকৃতি বলে। পুথি সম্পাদনার প্রধান সমস্যা হল পাঠ বিকৃতি। পুথির মাঝে এই পাঠ বিকৃতি সংঘটিত হত লিপিকরদের পাণ্ডিত্য অনুযায়ী।

প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সাধারণত প্রচারিত হত লিপি পরম্পরায়। মূল লেখকের পাণ্ডুলিপি অনুলিখিত হয়ে হয়ে বিভিন্ন স্থানে ক্রমান্বয়ে প্রসার লাভ করত। এখনকার মুদ্রণ যন্ত্রের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে যে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশের সুযোগ রয়েছে, প্রাচীনযুগে তা ছিল না। সে কারণে একই গ্রন্থ পরপর অনুলিখনের ফলে পূর্ণ হত নানা বিকৃতি ও ভুল-ত্রুটিতে। মানুষ যন্ত্র নয়, তার আছে একটি মন, সুতরাং তার মনস্তাত্ত্বিক ভ্রান্তিও রয়েছে। এছাড়া দৃষ্টিজাত ভ্রান্তির ফলেও অনুলিখনে ত্রুটি এসে যেত। নতুন নতুন লিপিকর এরূপভাবে সংযোজন করে চলতেন নতুন নতুন ভুলের। এভাবে একটা অনুলিপি মূল পাণ্ডুলিপি থেকে যত দূরবর্তী হত তাতে স্বভাবত ভুলের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে তত বেশি হত। আর এ কারণেই একই পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অনুলিপিতে সৃষ্টি হত এক বা একাধিক পাঠবিকৃতি। তাই রচয়িতার মূল পাঠ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে হলে পাণ্ডুলিপির এরূপ লিপিপরম্পরা ও পাঠবিকৃতি সম্পর্কে অবশ্যই ধারণা থাকা প্রয়োজন।

খ. পাঠবিকৃতির কারণ

পাণ্ডুলিপির এই পাঠবিকৃতি নানা কারণে নানা ক্ষেত্রে সংঘটিত হত। লিপিকর অনুলিখনকালে বিভিন্ন প্রকার ভুলের অবতারণা করে থাকেন। কখনও ভুলবশত কোন বর্ণ, শব্দ, ছত্র বাদ রেখে লিখে যান আবার কখনও বোঝার ভুলে সৃষ্টি করেন নতুন ভুলের। পরবর্তী সময়ে সেই পুথি দেখে অনুলিখনকালে কখনও ভুল অংশ সংশোধন

করেন নিজস্ব বিদ্যানুযায়ী, কখনওবা 'যদ্ দৃশ্যতে তৎ লিখন্ততে' রীতি অনুযায়ী লিখতে গিয়েও দৃষ্টির অন্তরালে রেখে যান মূল্যবান অংশ বিশেষ। এরূপ যুগ পরম্পরায় পাঠ বিকৃতির ফলে সৃষ্টি হয় পাঠের প্রকারভেদ। বহুল পরিচিত বিখ্যাত গ্রন্থের প্রতিলিপির সংখ্যা যেমন বর্ধিত থাকে তেমনি পাঠবিকৃতির পরিমাণও থাকে বেশি। পাঠবিকৃতির সংখ্যাধিক্যের জন্য একই বিষয়ের পুথিতে সৃষ্টি হয় নানারূপ লিখনরীতি। যেমন—

১. লিপিকরের ইচ্ছাকৃত ভুল

লিপিকর কখনো মূল পাণ্ডুলিপির কোনও এক বা একাধিক বর্ণ বা শব্দের স্থলে স্বেচ্ছায় সমার্থক অন্য কোন বর্ণ বা শব্দ ব্যবহার করতেন। ফলে সৃষ্টি হয়েছে পাঠান্তরের।

যেমন—

একই পাণ্ডুলিপির মুদ্রিত গ্রন্থেব পাঠ—
"জন্ম-সময়ে মরণ-সময়ে বা মোক্ষনির্ণয়ঃ
ষষ্টাষ্টমকণ্টকগোগুরুরুক্ষে তাবসানে লগ্নে বা।
শৈষৈরবলৈর্জন্মনি মরণে বা মোক্ষগতিং প্রাহুঃ ॥ ১২৮ ॥"[১]

এবং অপর একটি অনুলিপির পাঠ—

"ষষ্ঠাষ্টমকন্ট চেস গুরুরুচ্ছেভাবসানে বিলগ্নে বা
শৈষৈরবলৈর্জন্মনি মরণে বা মোক্ষগতিমাহুঃ ॥
জন্ম-সমগে মরণ-সময়ে বা মোক্ষনির্ণয়ঃ।"[২]

রা. পা. সংখ্যা-৩২৩২, পৃ. সং-৮৯খ

এখানে অনুলিখনকালে লিপিকর 'বি' উপসর্গটি অতিরিক্ত যোগ করেছেন এবং 'প্রাহু'র ক্ষেত্রে 'আহু' (মাহু) লিখেছেন মূলের অর্থ ঠিক রেখে। এবং প্রথম 'জন্মসময়ে ...' পংক্তিটি লিখেছেন শেষে।

২. লিপিকরের অনিচ্ছাকৃত ভুল

অনেক সময় দেখা যায় লিপিকর কোন পাণ্ডুলিপির অনুলিখনকালে ঔদাসীন্যের কারণে বাক্যের কিছু অংশ বা বর্ণ বাদ রেখে লিখে গেছেন। ভুলবশত লিখেছেন একই শব্দ বা বর্ণ দু'বার। আবার এক বর্ণের স্থলে অন্য বর্ণ লিখে ফেলেছেন অন্য খেয়ালে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে পাঠান্তরের। যেমন—

মুদ্রিত পাঠ—

(i) ত্রিবিধোৎপাতশান্তিঃ।
দিব্যমপি শমমুপৈতি প্রভূতকনকান্ন গোমহীদানৈঃ
রুদ্রায়তনে ভূমৌ গোদোহাৎ কোটী হোমা ॥ ৪ ॥ (শুদ্ধিদীপিকা পৃ. ৩৬৯)

অপর দু'টি প্রতিলিপির পাঠ—

(ii) "দিব্যমপিসমুমপৈতি প্রভূতকলকাগোমহীদোনৈঃ
রুদ্রায়তলে ভূমৌ গোদোহাৎ কোটি হোমাচ্চ ॥

ত্রিবিধোৎপাতশান্তিঃ।" (রা. পা. সং—৩২৩১, পৃ. ৭৭ক)
"দিব্যমণিসওম্মুপৈতি প্রভৃত-ক্ষানকাম্বগোমহীদানাৎ।
রুদ্রায়তনে ভূমৌ গোদোহাৎ কোটি হোমাচ্চ॥
ত্রিবিধোৎপাতশান্তিঃ।" (রা. পা. সং—৩২৩২, পৃ. ৬৮ক)

এখানে একই শ্লোকের যে তিনটি পাঠ উদ্ধৃত হয়েছে তার প্রথমটি (মুদ্রিতটি) শুদ্ধ। দ্বিতীয়টিতে কয়েকটি ভুল দেখা যায়। যেমন—প্রথম পংক্তিতে 'শমমুপৈতি, শব্দের 'ু'—কার দ্বিতীয় 'ম'-এর স্থলে প্রথম 'ম'-এ যুক্ত হয়েছে এবং 'শ'-র পরিবর্তে হয়েছে 'স'। 'কনকান্ন'-র 'ন' স্থলে 'ল' হয়েছে এবং 'ন্ন' যুক্তবর্ণটি বাদ পড়ে গেছে। আর পংক্তি শেষে 'দানৈঃ' স্থলে লিখিত হয়েছে 'দোনৈঃ'। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'রুদ্রায়তনের 'ন' স্থলে 'ল' লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় পাঠের প্রথম পংক্তিতে 'দিব্যমপি', শব্দে 'প' স্থানে 'ণ', 'শমমুপৈতি' শব্দের 'শ' স্থলে 'স' হয়েছে এবং প্রথম 'ম' বাদ পড়েছে। 'দ্বিতীয় 'ম'-র স্থলে হয়েছে 'ন', 'প্রভূতকনকান্ন' শব্দে 'ত'-এর পরে একটি অতিরিক্ত 'ম', প্রথম 'ক'-এ অতিরিক্ত 'া'—কার এবং পংক্তি শেষে 'দানৈঃ' স্থলে 'দানাৎ' লেখা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য 'কান্ব' শব্দের 'ন্ব' দিয়ে 'ন'-এর দ্বিত্ব বোঝানো হয়েছে। এটি পাণ্ডুলিপি লেখার একটি বৈশিষ্ট্য।

৩. লিপিকরের বোঝার ভুল

লিপিকর অনেক সময় অনুলিখনকালে পাণ্ডুলিপির হস্তাক্ষর সঠিকভাবে বুঝতে না পেরে ভুল পাঠ লিপিবদ্ধ করেন। এই ভুল ভাষা ও শব্দজ্ঞান দুর্বল লিপিকরদের ক্ষেত্রে বেশি হয়েছে। যেমন—

মুদ্রিত পাঠ—

(i) পাপদ্রেক্কানে দাহো স্ববিংশে শুভদ্রেক্কানে ক্লেদঃ
শেষো মিশ্র দ্রেক্কানে বিষ্টাম্ভো ব্যাড়বর্গে চ ॥ ১৩১ ॥

(শুদ্ধি-দীপিকা, পৃ. ৫০২)

অন্য একটি পাণ্ডুলিপির পাঠ

পাপদৃকালে দাহোম্বাবিংশে শুভদৃকালে ক্লেদঃ
শেষোমিশ্র দৃকালে বিষ্ঠাম্ভো ব্যাড়বর্গে চ ॥

(রা. পা. সং—৩২৩২, পৃ. -৯০ক)

এখানে 'দ্রেক্কানে' স্থলে বোঝার ভুলে লিপিকর লিখেছেন 'দৃকালে'।

(ii) মুদ্রিত পাঠ—

আর্য্যস্বাদিচতুষ্কচন্দ্রতুরগাদিতেষু বায়ুর্ভবেৎ।
দেবেজ্যাজবিশাখযাম্যযুগলে পিত্রদ্বয়ে চানলঃ ॥ ৬ ॥

(শুদ্ধিদীপিকা, পৃ. ৩৭০)

অন্য একটি পাণ্ডুলিপির পাঠ—

অর্ঘমাদিচতুষ্কচন্দ্রতুর-গাদিত্যেসু বয়ুর্ভদ্দে
বেত্যাজ্ব বিশাখা যাম্যযুগলে পিত্র্যদ্বয়ে চলেনঃ।

(রা. পা. সং—৩২৩১, পৃ. ৭৩খ)

এক্ষেত্রে লিপিকর বোঝার ভুলে অনুলিখনকালে 'আর্য্যম্নাদি' স্থলে 'অর্ঘমাদি', 'দিতে' স্থলে 'দিত্যে', 'বায়ুর্ভবেৎ' স্থানে 'বয়ুর্ভদ্দে', 'দেবেজ্যাজ' স্থানে 'বেত্যাজ,' 'পিত্র' স্থলে 'পিত্র্য' এবং 'চানলঃ' স্থলে লেখা হয়েছে 'চলেনঃ'।

৪. বর্ণের স্থান বিপর্যয়ে বিভ্রান্তি

বর্ণ বিপর্যয় লিপিকরের ঔদাসীন্য বা অসতর্কতার ফল। কখনও কখনও দেখা যায় মূল পাঠের কোন কোন বর্ণ বা শব্দের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ আগের শব্দ বা বর্ণ পরে এবং পরের শব্দ বা বর্ণ আগে লিখিত হয়েছে। ফলে এভাবে সৃষ্টি হয়েছে পাঠ-বিকৃতির। যেমন—

মুদ্রিত পাঠ—

(i) যো বা বলান্নিধনং পশ্যতি তদ্ধাতুকোপজো মৃত্যুঃ। ১৩০।

(শুদ্ধিদীপিকা, পৃ. ৫০০)

অন্য একটি পাণ্ডুলিপির পাঠ—

যো বা বলবন্নিধনং পশ্যতি তদ্ধাতু কোপজো মৃত্যুঃ।

(রা. পা. সং-৩২৩২, পৃ. ৯০ক)

এখানে 'বলবা'-র স্থানে বর্ণ-বিপর্যয়ে হয়েছে 'ববলা'।

(ii) মুদ্রিত পাঠ—

নাড়ী নক্ষত্রহীনে গুরুরবিরজনীনাথতারাবিশুদ্ধৌ। ১২৫

(শুদ্ধিদীপিকা, পৃ. ৪৯৬)

অন্য একটি পাণ্ডুলিপির পাঠ—

নারী নক্ষত্রহীনে রবিগুরুরজনীনাথতারাবিশুদ্ধৌ। (রা. পা. সং—৩২৩২, পৃ. ৮৯খ)
এখানে মূল পাঠের 'গুরুরবি'র স্থলে লিপিকর লিখেছেন 'রবিগুরু'।

৫. প্রক্ষেপণ বা সংযোজনজাত ভুল

অনেক সময় দেখা যায় মূল পাণ্ডুলিপির পাঠ ব্যতীত লিপিকরগণ অনুলিখন কালে অতিরিক্ত কোন বর্ণ, শব্দ, বাক্য এমনকি এক বা একাধিক শ্লোকও প্রক্ষেপণ (সংযোজন) করে থাকেন। এটাও পাঠান্তরের একটি কারণ। যেমন মূল পাঠে আছে—

অগ্ন্যাদিনা শবপরিণতিনির্ণয়ঃ। (শুদ্ধিদীপিকা-পৃ. ৫০২)

লিপিকর তা থেকে অনুলিপি করতে গিয়ে লিখেছেন—অগ্ন্যাদি পাপলগ্নাদৌ শবপরিণতিনির্ন্নয়ঃ। (রা. পা. সং—৩২৩২)

এখানে 'পাপলগ্নাদৌ' শব্দটি সংযোজিত।

৬. সাদৃশ্যজাত ভুল

অনেক সময় লিপিকর কোন পাণ্ডুলিপির অনুলিখন কালে কোন বর্ণের সাদৃশ্যের ফলেও পাঠ্যান্তরের সৃষ্টি করেছেন। এখানে হয়তো তিনি সঠিক পাঠই লিখতেন, কিন্তু একটি বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের প্রভাবে এবং কিছুটা আপন ঔদাসীন্যের কারণে তিনি ভুল পাঠ লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন—

শুদ্ধপাঠ—

যো বা ঘলম্বন্নিধনং পশ্যতি তদ্ধাতুকোপজো মৃত্যুঃ। ১৩০

(শুদ্ধিদীপিকা, পৃ. ৫০০)

তা থেকে লিপিকর লিখেছেন—

যো বা ববলান্দ্বির্ধনয় পশ্যতি তদ্ধাতুকোপজো মৃত্যুঃ।

(রা. পা. সং-৩২৩২, পৃ. ৯০ক)

এখানে হয়তো 'ন্ন' যুক্ত বর্ণটি তিনি 'ন্ব' দিয়ে 'ন' এর দিত্ব প্রকাশক হিসাবে লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ পাণ্ডুলিপিতেই তিনি একাধিকবার 'দ্ধ' বর্ণটি লিখেছেন এবং সেই অভ্যাসবশত ঐ বর্ণের সাদৃশ্যহেতু উপযুক্ত ক্ষেত্রে 'ন্ব' এর স্থলে একটি অতিরিক্ত টান এসে যাওয়ায় তিনি 'ন্দ্ব' লিখে ফেলেছেন। এমনি অভ্যাস ও সাদৃশ্যের ফলে বর্ণ বা গোটা শব্দের ভুলও লিপিকররা একাধিক করেছেন, ফলে সৃষ্টি হয়েছে পাঠান্তরের।

এতদ্ব্যতীত লিপিকররা আরও বিভিন্ন প্রকার ভুলের সৃষ্টি করতেন অনুলিখন কালে। তাই পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা কালে সম্পাদককে এসব পাঠ-বিকৃতি সম্পর্কে অবশ্যই সম্যক ধারণা রাখতে হবে।

একাদশ অধ্যায়

পাঠ সংশোধন পদ্ধতি

ক. পাঠ সংশোধন পদ্ধতি

সম্পাদনাকালে সম্পাদকের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবগত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা হল পাণ্ডুলিপির ভুল সংশোধন পদ্ধতি। পাণ্ডুলিপি লেখার সময় লেখক বা লিপিকররা অনিচ্ছাকৃত বা অসতর্কতা হেতু ভুল করে পুনরায় তা সংশোধন করতেন। বর্তমানে ভুল সংশোধনের যে-সব পদ্ধতি প্রচলিত, অতীতে এ থেকে ভিন্নতর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তখন লেখক এবং লিপিকর উভয়ই লেখার সময় স্বদৃষ্ট ভুলগুলি সংশোধন করতেন বিভিন্নভাবে। এর পিছনে প্রভাব বিস্তার করত তাদের বিভিন্নরূপ চিন্তা, রুচিশীলতা, নব নব কলাকৌশল এবং যুগপ্রভাব। ফলে সংশোধন পদ্ধতিতে বিভিন্ন লেখক বা লিপিকরের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট।

খ. পাঠ সংশোধন পদ্ধতির প্রকারভেদ

লেখক বা লিপিকরকৃত ভুলেরও ছিল বিভিন্ন প্রকারভেদ। যেমন—অসতর্কতাবশত কোন শব্দ বাদ রেখে লিখে যাওয়া, একই শব্দ একাধিকবার লেখা, একটি শব্দের স্থলে অন্য শব্দ লেখা এবং অতিরিক্ত বর্ণ, শব্দ বা শব্দাবলী লেখা। নিম্নে বিষয়গুলি উদাহরণসহ আলোচিত হল।

১. বাদ রেখে যাওয়া বর্ণের বা শব্দের সংশোধন

পাণ্ডুলিপি লেখার সময় বা লেখার পরেও যদি লেখক বা লিপিকরের দৃষ্টিগোচর হত যে ভুলবশত কোন বর্ণ বা শব্দ অলিখিত রয়েছে তাহলে তিনি তা সংশোধনের ক্ষেত্রে সমগ্র পৃষ্ঠাটি পুনর্লিখনের পরিবর্তে স্বল্পশ্রমে উক্ত ভুলের নিকটবর্তী কোথাও সংশোধিত বর্ণ বা শব্দ লিখে রাখতেন। পাণ্ডুলিপিতে সাধারণত দেখা যায় যে পত্রের চারদিকে কিছুটা

অংশ ফাঁকা বা শূন্য রেখে মাঝখানে বিষয়বস্তু লেখার রীতি ছিল। এই ফাঁকা রাখার পিছনে কতগুলি সুচিন্তিত উদ্দেশ্য ছিল। তার মধ্যে একটি হল ভুলকৃত অংশের সংশোধিত রূপ লেখা। এই অলিখিত বা বাদ পড়ে যাওয়া শব্দ সংশোধনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হত। নিম্নে সে সবের পরিচয় প্রদত্ত হল।

২. চিহ্ন মাত্রিক সংশোধন

একটি পত্রের কোন্ পংক্তির কোন্ বর্ণ বা শব্দ বাদ রয়ে গেল এবং কোথায় তা সংশোধিত হল তা অনায়াসবোধ্য বা সহজভাবে দৃষ্টিগোচর করার প্রয়াসে লেখক বা লিপিকর বিভিন্ন চিহ্নের ব্যবহার করতেন।

যেমন—ইত্যাদি।

ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন, আবার একই পাণ্ডুলিপিতে একাধিক চিহ্নের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। এই চিহ্নগুলির ব্যবহারে দুটি নিয়মের প্রচলন দেখা যায়। একটি হল—যে স্থানে ভুল করা হত এবং যে-স্থানে সংশোধন করা হত, এই উভয় স্থলে একই চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা। অন্যটি হল, যে-স্থানে ভুল হত কেবল সেই স্থানেই উক্ত চিহ্ন ব্যবহার করা। তবে চিহ্ন ব্যবহারের কৌশলের দ্বারাই অনুমতি হয় কোথায় সংশোধিত শব্দটি লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ চিহ্নটি উর্ধমুখী হলে বুঝতে হবে যে সংশোধিত বর্ণ, শব্দ বা শব্দাবলী উপরের শূন্যস্থানে লিখিত হয়েছে এবং নিম্নমুখী হলে নীচের শূন্য স্থানে লিখিত হয়েছে। এক্ষেত্রে অনেক সময় সংশোধিত শব্দের পার্শ্বে সংখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে। কোন পত্রের পংক্তিসমূহের মধ্যে যে পংক্তিতে ভুলটি সংঘটিত হত সেই পংক্তির সংখ্যা লিখিত হত ঐ সংশোধিত শব্দের পার্শ্বে। এতে সংশোধিত বর্ণ বা শব্দটি কোন পংক্তির অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়টি হত সহজবোধ্য। পংক্তির এই সংখ্যা গণনায় দুটি নিয়ম অনুসৃত হতে দেখা যায়, এক—পত্রের প্রথম পংক্তি হতে শেষ পংক্তি পর্যন্ত ক্রমানুসারে গণনা করা; দুই-পত্রের প্রথম (উপর) এবং শেষ (নীচ) দুইদিক থেকে গণনা করা। যেহেতু পত্রের দুইদিকের (উপর-নীচ) কিছুটা অংশ শূন্য রেখে পাণ্ডুলিপি লেখার নিয়ম ছিল, সেহেতু দুইদিকেই সংশোধিত অংশ লেখার সুবিধার্থে সম্ভবত এ নিয়ম প্রচলিত ছিল। যেমন—ছয়টি পংক্তিবিশিষ্ট একটি পত্রের পংক্তিগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে উপরের প্রথম পংক্তি হতে নীচের দিকে ক্রমানুসারে (১, ২, ৩) এবং নীচের শেষ পংক্তি হতে উপরের দিকে ক্রমানুসারে (১, ২, ৩) ভিতরের দিকে গণনা করা। প্রথম পংক্তিতে ভুল হলে সংশোধিত অংশ লিখিত হত উপরের শূন্যস্থানে এবং সংখ্যা গণনার প্রথম পদ্ধতি অনুসারে সংশোধিত শব্দের পার্শ্বে লিখিত হত ১ (এক) সংখ্যা। আর শেষ পংক্তিতে ভুল থাকলে সংশোধিত অংশ লিখিত হত নিম্নদিকের শূন্যস্থানে এবং নিম্ন হতে গণনা পদ্ধতিতে সংশোধিত শব্দের পার্শ্বে লিখিত হত ১ (এক) সংখ্যা। এরূপ ভাবে

দুইদিক থেকে ক্রমানুসারে ভিতরের দিকে গণনা করা এবং উপরে-নীচে সংশোধিত শব্দ লেখার নিয়মই অধিক প্রচলিত ছিল। নিম্নে বিভিন্ন চিহ্ন-ভিত্তিক উদাহরণগুলি আলোচিত হল।

(i) নহিরাঁনিতি ...। (রা. পা. সং—৪৪৭০, পৃ. ১২ক)

এখানে অসাবধানতাবশত 'রাজনীতি[১]' থেকে বাদ পড়ে যাওয়া বর্ণটি হল 'জ'।৩ ॥ এই ভুলটি হয়েছে পত্রের পাঁচটি পংক্তির মধ্যে তৃতীয় পংক্তিতে এবং সংশোধিত 'জ' বর্ণটি লিখিত হয়েছে উপরের শূন্যস্থানে। এখানে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্নটি ঁ ঊর্ধ্বমুখী থাকায় অনুমান করা যায় সংশোধিত বর্ণটি উপরের কোন স্থানে লিখিত হয়েছে, এবং সংশোধিত 'জ' বর্ণের পার্শ্বে ৩ (তিন) সংখ্যাটি ব্যবহারের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে বর্ণটি তৃতীয় পংক্তির সংশোধিত বর্ণ।

(ii) চতুথেমাঁকর্ত্তব্যং ...। (রা. পা. সং-৩২১৮ (ক), পৃ. ১৫খ)

সংশোধিত শব্দ—শেঁ।

এ ভুলটি হয়েছে তৃতীয় পংক্তিতে। চারটি পংক্তিতে সম্পূর্ণ পত্রটিতে সংশোধিত 'শে' শব্দটি লিখিত হয়েছে উপরের শূন্যস্থানে। বিষয়টি সহজে বোধগম্য হয়েছে ভুল-স্থানে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্নটি ঊর্ধ্বমুখী থাকায়। এখানে সংশোধিত শব্দটিকে সহজদৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে 'শে' শব্দটির চতুর্দিক বিন্দু চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। সংশোধিত বাক্যটি এরূপ—চতুর্থে[২] মাসে[৩] কর্ত্তব্যং ...।

(iii) দন্তস্য‸ভবতিবিভাষয়া ...। (রা. পা. সং-৩৭১৮ পৃ. ০খ)।

সংশোধিত শব্দ—'তু'

উদাহরণটি আটটি পংক্তির নীচের দিক থেকে গণনা পদ্ধতি অনুসারে দ্বিতীয় পংক্তিতে এবং সংশোধিত শব্দটি নিম্নের শূন্যস্থানে লিখিত হয়েছে। ভুলকৃত স্থানের নিম্নমুখী চিহ্নটির মাধ্যমে জ্ঞাপিত হয়ে সংশোধিত শব্দটি লিখিত হয়েছে নীচের কোন স্থানে। সংশোধিত বাক্যটি এরূপ—দন্তস্য তু ভবতি বিভাষয়া ...।

(iv) ভানুভৃসুতমন্দানাং শুভকর্ম্ম‸কেম্বপি ...। (রা. পা. সং—১০৭৬)

সংশোধিত শব্দ-সু।১।

উদ্ধৃত অংশটুকু পত্রের শেষ পংক্তির এবং সংশোধিত শব্দটি লিখিত হয়েছে নিম্নের শূন্য অংশে। এ বিষয়টি 'কর্ম্ম' এবং 'কে' শব্দদ্বয়ের অন্তর্বর্তী নিম্নমুখী চিহ্নটির মাধ্যমেই অনুমিত হয়। সংশোধিত 'সু' শব্দের পার্শ্বে ১ (এক) সংখ্যা ব্যবহারের সংকেত হল—নীচের দিক থেকে গণনা পদ্ধতি অনুসারে সর্বনিম্ন পংক্তিটিকে প্রথম ধরে গণনা করা হয়েছে।

(v) 'গোশ্যোহিতং‸এবং গোসুখং কুবেরবলিঃ। (রা. পা. সং—৭৯৮ পৃ. ৪৭ক)

শুদ্ধ বর্ণাবলী এখানে-গো, হিতং।

এ উদাহরণটি লিখিত হয়েছে নীচের দিক থেকে গণনা পদ্ধতি অনুসারে দ্বিতীয় পংক্তিতে এবং সংশোধিত বর্ণাবলী লিখিত হয়েছে নিম্নের শূন্য স্থানে। এখানে ভুল ও শুদ্ধ উভয় স্থানে নিম্নমুখী একই চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে সহজ দৃষ্টিগম্যতা

হেতু। এখানে লক্ষণীয় যে, সংশোধিত অংশের পার্শ্বে পংক্তিসংখ্যা লিখিত হয়নি। যেখানে এরূপ পংক্তিসংখ্যা লিখিত হয়নি সেখানে বুঝতে হবে, প্রতিটি ভুলের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক নির্দেশক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে।

(vi) ... প্রাগয়ামাৎ পরতথাগুভেচাদ্রেতথাপুষ্যেদশ্বাদিদোষহাভবেৎ।

(রা. পা. সং—১০৭৬ পৃ. ৩—ক)

সংশোধিত শব্দ—স্ত।

উদ্ধৃত অংশটি প্রথম পংক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং এর সংশোধিত অংশ লিখিত হয়েছে উপরের শূন্য স্থানে। এখানে বিন্দুসহ তির্যক চিহ্নটি ডানমুখী করে ব্যবহারের ফলে সংশোধিত অংশ ভুল অংশের ডান পার্শ্বে লিখিত হয়েছে বুঝতে হবে।

(vii) স্থ 'লিঙ্গেন ... (রা. পা. সং—৩২৪১, পৃ. ৪ খ)

সংশোধিত বর্ণ—ল ৬

লেখার সময় লেখক এখানে এই ভুলটি করেছেন ছয় পংক্তির পত্রটির শেষ পংক্তিতে এবং সংশোধন করেছেন নিম্নের শূন্য অংশে।

পাণ্ডুলিপি পাঠের সময় ত্রিভুজাকৃতির এই বিন্দু-চিহ্ন ভুল-নির্দেশক হিসেবে পাঠককে সতর্ক করে দেয়, আর সংশোধিত বর্ণের পার্শ্বে লিখিত ৬ (ছয়) সংখ্যার দ্বারা সহজে অনুমিত হয় যে বর্ণটি ৬ষ্ঠ পংক্তির কোনও স্থানের।

(viii) যস্য পাদতলে চক্রংপদ্মং বাপ্যথতো.ঃ. শং। (রা. পা. সং—৩২৪১ পৃ. ৫ক)

সংশোধিত বর্ণ-র১

উপরি উদ্ধৃত অংশটি লেখার সময় 'র' বর্ণটি যে বাদ পড়ে গেছে তা অনুমিত হয় 'তো' এবং 'শং' বর্ণদ্বয়ের মধ্যবর্তী ত্রিভুজাকৃতির বিন্দু চিহ্নের অবস্থান দ্বারা। ভুলটি হয়েছে প্রথম পংক্তিতেই। এ কারণে সংশোধিত বর্ণের পার্শ্বে লিখিত হয়েছে ১ (এক) সংখ্যা এবং বর্ণটি লিখিত হয়েছে উপরের শূন্য অংশে।

(ix) ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তা.ঃ. বিচেতসঃ। (রা. পা. সং-৩০৩২, পৃ. ৩৭ক)

সংশোধিত শব্দ-বিদেশস্তা ১

এখানে 'স্ত' যুক্ত বর্ণটির 'া' (আ) কারের উপরিভাগে ত্রিবিন্দু-চিহ্নের দ্বারা ভুল নির্দেশিত। লেখক ভুলবশত 'বিদেশস্তা' শব্দটি বাদ রেখে লিখে গেছেন এবং পরবর্তীতে ভুল অনুধাবন করতে পেরে তার সংশোধন করেছেন উপরের শূন্য অংশে। বিষয়টি সহজবোধ্য করার জন্য ভুল স্থানে ত্রিবিন্দু (ঃ) চিহ্নটি এবং সংশোধিত শব্দের পার্শ্বে পংক্তি-নির্দেশ হেতু ১ (এক) সংখ্যার ব্যবহার করেছেন।

(x) প্রয়োজনবতী অনিয়মে ঃ কারিণী ...। (রা. পা. সং—৪০৯০, পৃ. ১ক)

সংশোধিত শব্দ—.:. নিয়ম ২

অসচেতনতাবশত লেখক এখানে যে ভুল করেছেন, পরে তা দৃষ্টিগোচর হওয়ায় সংশোধনও করেছেন। অনায়াসে ভুলটি যাতে পাঠকের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় তার জন্য ভুল ও শুদ্ধ উভয় স্থানেই একইরূপ চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে। এবং সংশোধিত শব্দের পার্শ্বে ২ (দুই) সংখ্যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়েছে শব্দটির অবস্থান দ্বিতীয় পংক্তিতে।

৩. চিহ্ন ব্যতীত সাধারণ সংশোধন

কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় লেখক বা লিপিকর ভুলবশত বাদ পড়ে যাওয়া বর্ণ বা শব্দের সংশোধনক্ষেত্রে কোন রূপ চিহ্ন বা সংকেতের ব্যবহার করেন নি। এক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকদের পক্ষে ভুলের স্থান এবং সংশোধিত শব্দ অনুধাবন করা দুঃসাধ্য। সংশোধিত শব্দের পার্শ্বে পংক্তি নির্দেশক সংখ্যা ব্যবহারও কোন কোন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না। যেমন—

(i) ষষ্টীং সিতং সুরারে পরিহরদমীংসপ্তমী---। (রা. পা. সং—৫৮১০, পৃ. ৫৯ক)

সংশোধিত বর্ণ—শ।

এ উদাহরণটিতে ভুল স্থানটি সহজদৃষ্ট বা সহজবোধ্য নয়। 'পরিহরদ' এবং 'মীং' শব্দের মাঝখানে 'শ' বর্ণটি লেখক ভুলবশত বাদ রেখে গেছেন এবং পরবর্তীতে তা সংশোধন করে লিখেছেন নিম্নের শূন্য জায়গায় যার শুদ্ধপাঠ 'পরিহরদশমীং'। লেখকের এ ভুল এবং তার সংশোধন সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে শব্দার্থজ্ঞান, ছন্দোজ্ঞান এবং সংশোধন পদ্ধতির এ রীতি সম্পর্কে অবশ্যই অভিজ্ঞ হতে হবে, নতুবা সঠিক পাঠোদ্ধার (বিশেষত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে) সম্ভব নয়।

(ii) সূর্য্যঃ শুক্রঃ ক্ষমাপুত্রঃ সৈংহিকেয়ঃ শনিঃ শশী। (রা. পা. সং—১০৭৬)

সংশোধিত শব্দ—রা।

এখানে লেখক 'সৈংরাহিকেয়' লিখতে ভুলবশত 'রা' বর্ণটি বাদ রেখে 'সৈংহিকেয়' লিখেছেন। পরবর্তীতে তিনি তা কোনরূপ সংকেত ব্যতীতই সংশোধন করে লিখেছেন উপরের শূন্য স্থানে।

(iii) সৌম্যস্ত্রিদশন্ত্রীচপ্রাচ্যাদিদিগধীশ্বরা----(রা. পা. সং—১০৭৬, পৃ. ৮খ)

বাদ পড়ে যাওয়া বর্ণটি এখানে—ম।১।

এ উদাহরণটি প্রথম পংক্তিতে এবং বাদ পড়ে যাওয়া বর্ণটি লিখিত হয়েছে উপরের শূন্য স্থানে। লেখক এখানে 'দশমন্ত্রী' লিখতে ভুলবশত 'ম' বর্ণটি বাদ দিয়ে লিখেছেন 'দশন্ত্রী'। পরবর্তীতে 'ম' বর্ণটি উপরের শূন্যস্থানে লিখে তার পার্শ্বে পংক্তিসংখ্যানুসারে ১ (এক) সংখ্যার ব্যবহার করেছেন। এ পদ্ধতিতে ভুলস্থান নির্ণয় করতে পারলে সংশোধিত বর্ণ বা শব্দ নির্বাচন অনেকটা সহজ হয়।

৪. একই বর্ণ শব্দ বা শব্দাবলী দুবার লিখে তার সংশোধন

লেখক বা লিপিকর পাণ্ডুলিপি লিখতে গিয়ে ভুলবশত অনেক সময় একই বর্ণ বা শব্দ দুবার লিখতেন। এরূপ ভুলের সংশোধনক্ষেত্রে তাঁদের দ্বারা কয়েকটি পন্থা নির্দেশিত হয়েছে :

১. দুবার লেখা বর্ণ বা শব্দের একটি ভিন্ন রংয়ের কালি দ্বারা অনুলিপ্ত করণ।
২. দুবার লেখা বর্ণ বা শব্দের একটি কলম দ্বারা কেটে দেওয়া।
৩. চিহ্নভিত্তিক অর্থাৎ ভুলকৃত অতিরিক্ত বর্ণ শব্দ বা শব্দাবলী বিন্দু চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত-করণ।

এর মধ্যে প্রথম দু'টি পদ্ধতিতে বাদ দেওয়া অংশটি খুবই স্পষ্টীকৃত হলেও পত্রমধ্যে অন্যকালির অনুলিপ্ততা কিংবা কাটাকাটির ফলে পত্রের সৌন্দর্য অনেকখানি বিনষ্ট হয়। কিন্তু তৃতীয় পদ্ধতিতে বাদ দেওয়া অংশটির বিভিন্ন চিহ্নের মাধ্যমে চিহ্নিত করায় লিপিকরের সৌন্দর্যজ্ঞানের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে পত্রেরও সৌন্দর্যবৃদ্ধি ঘটে। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যায়। যথা—

(i) আদো এষোদমোবুতিষায়িবৃহস্পতিস্তদিশসা। (রা. পা. সং ১০৭৬, পৃ. ২খ)

এখানে 'আদো' শব্দটি দুবার লিখে প্রথমটি কলম দ্বারা কেটে দেওয়া হয়েছে ভুল প্রমাণ হেতু।

(ii) ইতিদশ্বাদিদোষশান্তিকংথনম্। (রা. পা. সং—১০৭৬, পৃ. ৩ক)

এখানে 'কথনম্' লিখতে 'থ' বর্ণটি দুবার লিখে একটিকে কেটে দেওয়া হয়েছে।

(iii) যদিবহাবাবলবৰবস্তস্তদাবহাবাহারংবাচ্যম্। (ঢা. বি. সং—৬০, পৃ. ২)

লেখক এখানে 'বলবস্ত' লিখতে ভুলবশত লিখেছেন 'বলববস্ত'। পরবর্তীতে অতিরিক্ত 'ব' বর্ণটিকে চারটি বিন্দু চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করে কৃত ভুলের সংশোধন করেছেন।

(iv) একতরপ্রতিপাপাদ---। (রা. পা. সং—৪৪৭০, পৃ. ১৯খ)

এখানে 'প্রতিপাদ' শব্দের অতিরিক্ত 'পা' বর্ণটি বিন্দু চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত থাকায় ভুলরূপে পরিগণিত।

(v) ব্র্যাক্ষানতো ঃ ব্যাখ্যানতো বিশেষার্থ---। (রা. পা. সং—৩৭১২, পৃ. ৭খ)

এ উদাহরণটিতে 'ব্র্যাক্ষানতো' শব্দটি যে লেখক ভুল লিখেছেন তা শব্দটির প্রতি অক্ষরের নীচে বিন্দু চিহ্নের মাধ্যমে অনুমিত হয়।

(vi) লগ্নপঃ পঞ্চমস্থানেসুতেশোবাপিলগ্নপঃ লগ্নপঃ পঞ্চমস্থানেপুত্রশ্বাপিপুত্রে—। (রা. পা. সং—১০৮৫, পৃ. ৩১খ)

এখানে 'পঞ্চমস্থানে' শব্দটির পুনর্লিখন হয়েছে। লিপিকর সম্ভবত 'লগ্নপঃ পঞ্চমস্থানে' শব্দের সাদৃশ্যে ভুল করে লগ্নপঃ পুত্রশ্বাপি'র মধ্যে অতিরিক্ত 'পঞ্চমস্থানে' শব্দটি লিখেছেন। পরে ভুলটি জ্ঞাত হওয়ায় বাক্যটিকে সংশোধনের ক্ষেত্রে 'পঞ্চমস্থানে' শব্দটির উপরে ও নীচে বিন্দু চিহ্নের দ্বারা ভুলরূপে চিহ্নিত করেছেন।

(vii) এষপাপযুতোবাপি। এষপাপযুতোবাপিভূজচ্ছেদীভবেন্নরঃ। (রা. পা. সং-৩২০৯, পৃ. ১২খ)

এখানে লেখক 'এষপাপযুতোবাপি' শব্দগুলি ভুলবশত দুবার লিখেছেন। বিষয়টি তাঁর দৃষ্টিগোচর হলে প্রথমটিকে বিন্দু চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করে নির্দেশ করেছেন ভুলরূপে।

৫. এক শব্দের স্থলে অন্য শব্দ লিখন

পাণ্ডুলিপি লেখার সময় লেখক বা লিপিকর অসাবধানতাবশত অনেক সময় এক শব্দের স্থলে অন্য শব্দ লিখে ফেলতেন এবং তারপর উক্ত ভুল দৃষ্টিগোচর হলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তা সংশোধন করতেন। যথা—

(i) ধাতুজীবমাত্রা প্রকীত্রাৎ (রা. পা. সং—১০৮৫, পৃ. ৫ক)

শুদ্ধ শব্দ—সমদ্বিতাৎ।

উদাহরণটি পত্রের শেষ পংক্তির অন্তর্ভূত। সংশোধিত শব্দাবলী লিখিত হয়েছে নিম্নের শূন্যাংশে। এখানে 'সমদ্বিতাৎ' লিখতে লেখক ভুলবশত 'প্রকীত্রাৎ' লিখেছেন এবং পরে দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়ায় কেটে দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, সংশোধিত শব্দের পার্শ্বে পংক্তি নির্দেশক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়নি। ফলে এটি কোন ভুলের সংশোধন তা অনুধাবন করা সহজসাধ্য নয়।

(ii) মঞ্জিষ্ঠমেথ পঞ্চুদ্ধ কুঙ্কুমংরক্তং চন্দনম্। (রা. পা. সং—৪৯৪৫, পৃ. ৩০খ)

সংশোধিত শব্দ—পত্রার্দ্ধং। ২

উদাহরণটি চতুষ্পংক্তি বিশিষ্ট একটি পত্রের দ্বিতীয় পংক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং সংশোধিত শব্দটি লিখিত হয়েছে উপরের শূন্যস্থানে। লেখক এখানে 'পত্রার্দ্ধং' লিখতে ভুল করে 'পঞ্চুদ্ধ' লিখেছেন। তারপর সংশোধনের ক্ষেত্রে ভুলকৃত শব্দটি কেটে দিয়ে প্রথম অক্ষরের উপরিভাগে তিনি অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্নটি ব্যবহার করেছেন, যাতে বিষয়টি পাঠকের সহজদৃষ্টিভূত হয়। সংশোধিত শব্দের পার্শ্বস্থ সংখ্যাটি দ্বারা নির্দেশিত হচ্ছে ভুলসংশ্লিষ্ট পংক্তিসংখ্যা।

(iii) তাম্রহস্তেকৃতং পূর্ন্নস্মানং তেনার্কশান্তয়ে। (রা. পা. সং-৪৯৪৫)

শুদ্ধশব্দ—কুম্ভে ৩।

এখানে সংশোধিত শব্দের পার্শ্বে ৩ (তিন) সংখ্যার দ্বারা অনুমিত হয় যে, ভুলটি সংঘটিত হয়েছে তৃতীয় পংক্তিতে। ভুলস্থানের নিম্নমুখী চিহ্নটির দ্বারা নির্দেশিত হচ্ছে সংশোধিত শব্দটি নিম্নের কোথাও লিখিত হওয়ার বিষয়টি। এখানে লেখক 'কুম্ভে' লিখতে ভুলবশত লিখেছিলেন 'হস্তে'।

(iv) জেখনে গেছিলা তুমি আর্শ্বেরমাজার। (ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৫৫)

সংশোধিত শব্দ—উপর।

এখানে লেখক ভুল এবং শুদ্ধ উভয় শব্দের ক্ষেত্রে বিন্দু চিহ্নের ব্যবহার করেছেন। লেখক অন্যমনস্কতা হেতু 'উপর' শব্দের স্থানে 'মাজার' শব্দ লিখে পুনরায় তা সংশোধন করেছেন। এ পদ্ধতিতে লেখকের সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

(v) বিষ্যাতিনচোদ্যমোব য়তো---। (রা. পা. সং—৭৪৪, পৃ. ১০খ)

শুদ্ধশব্দ—কুতোদেশ্যমেব।

এখানে ভুল স্থানটিকে বিন্দু চিহ্ন এবং সমান্তরাল লম্ব রেখার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে, আর শুদ্ধশব্দাবলী লিখিত হয়েছে উপরের শূন্যাংশে।

(vi) ষষ্ঠাষ্টমস্থিতশ্চন্দ্রঃহন্যতে সর্ব্বজন্তুভিঃ। (রা. পা. সং—৭৬৯)

শুদ্ধশব্দ—জল ২।

উদাহরণটি নিম্ন দিক থেকে দ্বিতীয় পংক্তিতে এবং সংশোধিত শব্দ নিম্নের শূন্য স্থানে লিখিত হয়েছে। সংশোধিত শব্দের পার্শ্ববর্তী ২ (দুই) সংখ্যা দ্বারা পংক্তি সংখ্যা এবং নিম্নমুখী চিহ্ন দ্বারা পত্রের নিম্নাংশে সংশোধনের বিষয় জ্ঞাপিত হয়েছে।

(vii) ... যদি সোমদিনেনন্দাবিহায় (হরিভাসরম)। (রা. পা. সং—৩২১৮, ক পৃ. ২৪)

সংশোধিত বর্ণাবলী—হরিবাশঃ রম্।

উদাহরণটি পংক্তি চতুষ্টয়ের তৃতীয় পংক্তিতে অবস্থিত এবং সংশোধিত বর্ণাবলী লিখিত হয়েছে উপরের শূন্যাংশে। এখানে ভুলকৃতশব্দের উপরিভাগে এবং সংশোধিত শব্দের পার্শ্বে একই চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে যাতে এ বিষয়টি পাঠকের সহজে দৃষ্টিগোচর হয়।

(viii) সপ্তবিং-যোগানামরূপফলাং স্মৃতাঃ (রা. পা. সং—১০৭৬, পৃ. ৬ক—খ)

শুদ্ধ শব্দ—শাঅমী

উদাহরণটি পত্রের শেষ পংক্তির অংশবিশেষ এবং এর সংশোধিত অংশ লিখিত হয়েছে নিম্নের শূন্য স্থানে। এ বিষয়টি পাঠকের দৃষ্টিতে আনার জন্য ভুল অংশটি কেটে তার নীচে নিম্নমুখী একটি চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সংশোধিত অংশটি যে নিম্নে লিখিত হয়েছে তা পাঠকের কাছে সহজবোধ্য হয়েছে।

(ix)'বর্ণেনাথেঃ ...। (রা. পা. সং—৭৪৪, পৃ. ১৪খ)

শুদ্ধ শব্দ—পদেনা

পত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে ঘটেছে এ ভুলটি এবং একাধিক চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে ভুলটি। সংশোধিত শব্দটি যে উপরের শূন্য অংশে লিখিত হয়েছে তা নির্দেশ করছে ঊর্ধ্বমুখী অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্নটি।

৬. অতিরিক্ত বর্ণ শব্দ বা শব্দাবলী লিখন

লেখকগণ ভুলবশত অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত বর্ণ শব্দ বা শব্দাবলী লিখে পরবর্তীতে তা আবার সংশোধন করতেন। এ পদ্ধতিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনটি নিয়মের ব্যবহার লক্ষ্যযোগ্য। এক—অতিরিক্ত শব্দটি অন্য কালি দ্বারা অনুলিপ্তকরণ, দুই—অপ্রয়োজনীয় শব্দ বা শব্দাবলী কলম দ্বারা অসুন্দরভাবে কেটে দেওয়া এবং তিন—সৌন্দর্যবর্ধনের মানসে অতিরিক্ত শব্দটিকে বিভিন্ন চিহ্নের সাহায্যে চিহ্নিত করা। ভুল সংশোধনের এ পদ্ধতিতে বিন্দু চিহ্নের ব্যবহারই অধিক লক্ষণীয়। বিষয়গুলি কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে সুস্পষ্ট করা যেতে পারে। যথা—

(i) ... সত্য পিশব্দা ...। (রা. পা. সং—৩৭২২, পৃ. ২খ)

(ii) ন্যস্যরপদস্যার্থ ...। (রা. পা. সং—৭২৪, পৃ. ১৪৩ক)

(iii) অপবাদোধিনির্মুক্তপক্ষেউৎসর্গোপিণপ্রবর্ত্ততে। (রা. পা. সং—৩৭১২, পৃ. ৩খ)

(iv) মাসেনলোপেপ্রত্যয়লোপলক্ষণন্যায়েনপুর্ন্নলোপেনস্যা। (রা. পা. সং—৭৪৪, পৃ. ৩খ)

(v) তদবস্থিতমিতি। (রা. পা. সং—৪৪৭০, পৃ. ১৪খ)

(vi) পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণ ধ্বংসজনিকা স্মৃতিসহকারিত্বেনা ...। (রা. পা. সং—৪৪৭০, পৃ. ১১ক)

(vii) এক সত্য আছে মুর চিত্তের অ.স্ত.র মাজার। (ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৪ক)

(viii) এই লয়াহুস্তে আ মা রক্ষাকরিবা আমার। (ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৫ক)

(ix) জলটুনাখিতিপরে পারি ক বি বকরীতে। (ঢা. বি. পা. সং—২১৫, পৃ. ৪৫ক)

(x) (সম্প্রতিকালে বর্ত্তমানা বিভক্তির্ভবতি। পঠতি যজ্ঞ)। (রা. পা. সং— ৭০৯, পৃ. ৫)

অনেক সময় একটি কিংবা একাধিক পংক্তিও ভুলবশত অতিরিক্ত লেখা হয়ে যেত। এগুলি সংশোধনের ক্ষেত্রে কোথাও অনুলেপন, কোথাও বিন্দু বা ড্যাস (-) চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত-করণ, আবার কোথাও কলম দ্বারা কেটে দেওয়ার রীতিরও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। উপরি উদ্ধৃত উদাহরণগুলির চিহ্নিত অংশগুলি ভুলকৃত অতিরিক্ত শব্দ।

পাণ্ডুলিপির এই বিভিন্ন চিহ্ন কেবল ভুলসংশোধনের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হত না। কখনো কখনো কোন শব্দের প্রতিশব্দ, শব্দের অর্থ, শব্দের ব্যাখ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও চিহ্ন ব্যবহারের প্রচলন ছিল। সাধারণত টীকা-গ্রন্থ এবং অনুলিপি/ প্রতিলিপিকৃত গ্রন্থের ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি অধিক প্রযোজ্য ছিল। যেমন—

(i) মিথুনেজ্জসেত্যপ্রাপ্লোত্যবসাংফলম্। (রা. পা. সং—৩২১৮, পৃ. ২৪)

শব্দার্থ—মীনইত্যর্থ।

এ উদাহরণটি লিখিত হয়েছে দ্বিতীয় পংক্তিতে এবং চিহ্নিত শব্দের ব্যাখ্যা লিখিত হয়েছে উপরের শূন্যাংশে। পাঠকের অনায়াসবোধে ও সহজে দৃষ্টিনিবদ্ধতার জন্য এখানে উভয় স্থানে একই চিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছে। যে-সব ক্ষেত্রে এরূপ ভুল ও সংশোধন উভয় স্থানে একই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে সে-সব ক্ষেত্রে পংক্তি নির্দেশক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়নি।

(ii) আননেঁ নাড়িকাঃ পঞ্চবক্ষস্থলে চতুর্দ্দশঃ। (রা. পা. সং—১০৭৬, পৃ. ৩খ)

প্রতিশব্দ বা শব্দার্থ—মুখে

এখানে 'আননে' শব্দটির অর্থ লিখতে বিশেষ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। 'মুখে' শব্দটি লিখিত হয়েছে উপরের শূন্য স্থানে। এ বিষয়টি উর্ধ্বমুখী অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত।

(iii) জীবঃ সপ্তনবদ্বিপঞ্চমগতোযুগ্মেষুসোমাত্মজঃ শুক্র---। (রা. পা. সং—১০৭৬, পৃ. ৯ক)

শব্দার্থ—বুধঃ।

এখানে 'সোমাত্মজ' শব্দের অর্থ 'বুধঃ' শব্দটি যে নিম্নের শূন্যাংশে লিখিত হয়েছে তা নির্দেশ করে 'সোমাত্মজঃ' শব্দের নীচে নিম্নমুখী চিহ্নটি।

(iv) কান্তাকুচাগ্রস্থিতকালিমা---। (ঢা. বি. সং—২৫৯৮, পৃ. ২ক)

ব্যাখ্যা—কান্তায়াঃ কুচাগ্রঃ কান্তা-কুচাগ্রঃ কুচাগ্রে স্থিতঃ কুচাগ্রস্থিতঃ

কুচাগ্রস্থিতাচাসৌ কালিমাচেতি কান্তাকুচাগ্রস্থিতকালিমা।

এ উদাহরণটি লিখিত হয়েছে পত্রস্থিত পাঁচটি পংক্তির প্রথম পংক্তিতে। এখানে 'কান্তাকুচাগ্রস্থিতকালিমা" এ সমাসবদ্ধ পদটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যাখ্যাংশ লিখিত হয়েছে উপরের শূন্য স্থানে, এ বিষয়টি নির্দেশ করে উদাহরণটির উপরিভাগের উর্ধ্বমুখী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্নটি।

পাণ্ডুলিপিতে এরূপ বিভিন্ন বিষয় নির্দেশহেতু ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন চিহ্ন—যা পাণ্ডুলিপির সঠিক পাঠোদ্ধার পাঠক কিংবা সম্পাদকের সহায়ক হয়।

তথ্যসূত্র

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীনিবাস, শুদ্ধিদীপিকা, সম্পাঃ শ্রীনীলকমল বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গাব্দ, ১৩৩৪। নিবন্ধে ব্যবহৃত মুদ্রিত পাঠের উদাহরণ সবই এই গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

* নিবন্ধে ব্যবহৃত উদাহরণগুলি (মুদ্রিত পাঠেব উদাহবণ ব্যতীত) মূল পাণ্ডুলিপিতে প্রাচীন বাংলা লিপিতে লিখিত, কিন্তু মুদ্রণের সুবিধার জন্য এখানে আধুনিক বাংলালিপিতে লিখিত হল।

১. 'রাজনীতি' শব্দে ন-এর-ী ' কাব আমাব দেওয়া।

২. উদাহরণ আছে 'খে' কিন্তু এখানে হবে 'র্খে'।

৩. লিপিকর এখানে এক ভুল সংশোধন করতে গিয়ে নতুন ভুলের সৃষ্টি কবেছেন, অর্থাৎ এখানে আছে 'শ' কিন্তু হবে 'স'।

৪. এখানে 'হরিভাসরম্,' শব্দের ভুল সংশোধন (ভ-স্থলে 'ব') করতে গিয়ে নতুন ভুলের সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ 'স' স্থলে 'শ' হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলা লিপির বিবর্তনে সংস্কৃত ও মুসলিম পুঁথির গুরুত্ব

ক. সংস্কৃত পুথি

যে সব সংস্কৃত পুথি বাংলা অক্ষরে লিখিত হয়েছে, সংস্কৃত পুথি থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সংস্কৃত কাব্যকে অনুসরণ করে রচিত হয়েছে, আলোচনার জন্য এখানে সে সব পুথিই গৃহীত হয়েছে।

খ. মুসলিম পুথি

যে সব বাংলা পুথি মুসলিম ধর্মাশ্রিত, মুসলিম কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং আরবী ফার্সি কাব্য থেকে সরাসরি অনূদিত, তুলনামূলক আলোচনার জন্য উক্ত পুথিসমূহই গ্রহণ করা হয়েছে।

গ. তুলনামূলক আলোচনা

বাংলা লিপির আদিরূপ ব্রাহ্মীলিপি। এই ব্রাহ্মীলিপি বিবর্তিত—পরিবর্তিত হতে হতে কুটিল লিপির মাধ্যমে বাংলা লিপিতে পর্যবসিত হয়েছে। বাংলা লিপির উদ্ভবের প্রারম্ভে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম থেকে নবম শতক পর্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে কুটিল লিপি স্বাধীনভাবে প্রসার লাভ করে। খ্রিষ্টীয় দশম শতকে পশ্চিমাঞ্চলীয় বর্ণমালার প্রভাবে কুটিল লিপি কিছুটা পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। এর পরে প্রথম মহীপালের সময় থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমাঞ্চলীয় বর্ণমালার প্রভাব ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে এবং দশম শতকের শেষ পর্বে মূল বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব হয়। এই লিপির অধিক প্রচলন আরম্ভ হয় খ্রিষ্টীয় একাদশ অথবা দ্বাদশ শতকের প্রথমার্ধে। এর পরে দ্বাদশ শতকের শেষভাগে এই বাংলা বর্ণমালা আরও বিবর্তনের মাধ্যমে প্রায় বর্তমান (আধুনিক) বর্ণমালার স্তরে উন্নীত হয়। এ সময়ে উত্তর ভারতে মুসলিম রাজত্ব শুরু হওয়ার পর

পূর্বাঞ্চলীয় বর্ণমালার প্রায় সব বর্ণই আধুনিক বাংলা বর্ণমালার আকারে রূপান্তরিত হয়। পূর্বভারতে মুসলিম বিজয়ের ফলে সাহিত্য সংস্কৃতির ধারা কিছুকাল (খ্রি. ১৩শ-১৪শতক) ব্যাহত হয়। সঙ্গত কারণেই লিপির ব্যবহারও যায় স্তিমিত হয়ে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এই অন্ধকার যুগের অবসানে অর্থাৎ চতুর্দশ শতকের শেষার্ধ থেকে পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা লিপির অধিকাংশ বর্ণই সম্পূর্ণরূপে বর্তমান আকৃতি ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ দ্বাদশ শতকে বাংলা লিপির যে কাঠামো তৈরি হয়েছে পঞ্চদশ শতকে তার কোনো কোনো বর্ণ কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা বর্ণের আকৃতি ধারণ করেছে। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং সর্বশেষে ঊনবিংশ শতকে এসে সমুদয় বর্ণ ধারণ করেছে আধুনিক—বর্ণমালার আকৃতি। কিন্তু বাংলা লিপির উদ্ভব সম্পর্কিত এই ক্রম মূলত বাংলা লিপিতে লিখিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় লিখিত বাংলা পাণ্ডুলিপিতে সাধারণত এই ক্রম রক্ষিত হয় নি। ফলে দ্বাদশ শতকে বাংলা লিপির যে কাঠামো তৈরি হয়েছে, দেখা গেছে অষ্টাদশ শতকে লিখিত বাংলা পুথির বর্ণ তার থেকেও অপরিপক্ব। এ কারণে পঞ্চদশ, ষোড়শ শতকে বাংলা লিপিতে লিখিত কোনো সংস্কৃত পুথির পাঠ যতটা সহজ অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের বাংলা পুথির পাঠ তার চেয়ে জটিলতর।

তবে বাংলা পুথির মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। যে সব বাংলা পুথি সংস্কৃত ভাষা থেকে অনূদিত বা সংস্কৃত কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে—সে সব পুথি লিপির বিবর্তন ধারাকে অনেকটা সঠিকরূপে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আরবি—ফার্সি কাব্যের অনুবাদ বা মুসলমানি কাহিনী অবলম্বনে রচিত পুথিতে লিপির সঠিক বিবর্তন ধারা অনুসৃত হয় নি। যার ফলে লিপি নানারূপ আকৃতি—বিকৃতির শিকার হয়েছে। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের এ জাতীয় বাংলা পুথির অধিকাংশ বর্ণ পূর্বের আকৃতি থেকে লিখিত হয়েছে ভিন্নাকৃতিতে। কোনো কোনো বর্ণ ধারণ করেছে এমন কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি যার সঙ্গে বাংলা লিপির কোনোরূপ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। আবার কোনো কোনো বর্ণ সামনের দিকে না এগিয়ে বরং পেছনের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। অর্থাৎ অনেক বর্ণ ধারণ করেছে ব্রাহ্মীলিপি এবং দেবনাগরী—লিপির আকৃতি।

বাংলা ভাষায় প্রথম যে সাহিত্যকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তার অধিকাংশ সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ গ্রন্থ এবং সংস্কৃতের কোনো বিখ্যাত গ্রন্থের বিষয় নিয়ে রচিত। এরূপ সপ্তদশ শতকের পূর্ববর্তী বাংলা পুথি যেমন—শ্রী ভাগবত মহাপুরাণ, চণ্ডীকাব্য, মনসামঙ্গল রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি ছিল তখন ভাঙ্গা গড়ার অবস্থা। সাধারণত লিখনরীতিতে অনুসৃত হয়েছে সংস্কৃতানুগ লিখন পদ্ধতি। বাংলা ভাষায় বর্তমানে যে লিখনরীতি প্রচলিত তার অধিকাংশই সংস্কৃতাশ্রিত বা সংস্কৃতোদ্ভূত। আর সেই ষোড়শ শতকের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। তখন শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃতের চর্চাই চলত সর্বত্র। সংস্কৃত ছিল সংস্কারকৃত শুদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত ভাষা। আর বাংলা ভাষার ছিল তখন ভাঙ্গা—গড়ার অবস্থা। সাধারণত দুর্বলের উপর সবলের প্রভাব পড়ে বেশি। সব পুথিই সংস্কৃত ভাষা এবং দেবনাগরী লিপির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে আরবি, ফার্সি, আওয়াধি হিন্দি প্রভৃতি ভাষাশ্রিত পুথির পাঠ জটিলতাপূর্ণ। কারণ এ সব পুথির লিপি প্রয়োগ, লিখনরীতি এবং ভাষা ব্যবহার বিভিন্ন ঔপভাষিক ও আঞ্চলিক প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। এ কাজটি সংঘটিত হয়েছে প্রধানত অল্পশিক্ষিত লিপিকরদের হাতে। সবকিছু মিলিয়ে পাঠোদ্ধারে সৃষ্টি হয়েছে নানারূপ জটিলতার। এই সব কারণে মধ্যযুগের বাংলা পুথির লিখনরীতি ও লিপি প্রয়োগে সৃষ্টি হয়েছে নানারূপ প্রকার ভেদ। এ প্রকার ভেদে কোনো কোনো বর্ণ এমন আকৃতি ধারণ করেছে যা দেখে বাংলা লিপি বলে ভ্রম হয়। মনে হয় এ নতুন কোনো লিপি অথবা বাংলা লিপির সেই আদিম অবস্থা। যেমন—

অ = ইত্যাদি
আ = ইত্যাদি
ই = ইত্যাদি
উ = ইত্যাদি
ঋ = ইত্যাদি
ক = ইত্যাদি
জ = ইত্যাদি
ঝ = ইত্যাদি

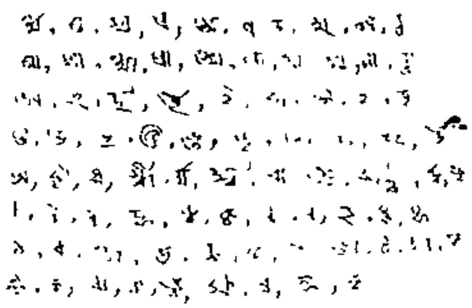

মধ্যযুগের এ শ্রেণীর পুথির অধিকাংশ বর্ণই লিখিত হয়েছে এরূপ বিভিন্নাকৃতিতে। অথচ এর পূর্ববর্তী সময়ের সংস্কৃতাশ্রিত বাংলা পুথিতে অনুসৃত হয়েছে শুদ্ধ বা আধুনিক সময়ের বর্ণ লিখন পদ্ধতি।

মধ্যযুগের আরবি—ফার্সি—হিন্দি ভাষাশ্রিত পুথির লিখনরীতিতে কেবল বর্ণের ক্ষেত্রেই নয়, প্রতিটি বানান, ফলা, যুক্তবর্ণ প্রভৃতি আক্রান্ত হয়েছে নানা প্রকার বিকৃত লিখন পদ্ধতিদ্বারা। যেমন—া—কার, ি—কার, ে-কার লিখিত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই আকৃতিতে। ি—কারের উপরের উত্তাল অংশ বিলীন হয়েছে কখনো কখনো। আবার এই উত্তাল অংশ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবস্থান নিয়েছে মাত্রার নিম্নাংশে। ু— (উ) কার অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠোদ্ধার করতে হয় অনুমানের উপর ভিত্তি করে। ফলা এবং যুক্তবর্ণ লিখনেও ধারণ করেছে নানা প্রকার কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি। পক্ষান্তরে সংস্কৃতাশ্রিত বাংলা পুথিতে বানান, ফলা, যুক্তবর্ণ প্রভৃতির লিখন পদ্ধতি আধুনিক লিখন পদ্ধতির অনুরূপ। এরূপ পুথিতে শব্দের আদিতে অ এবং আ স্বরধ্বনি ব্যবহারে সর্বত্র অ এবং আ স্বরবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মধ্যযুগের অধিকাংশ পুথিতে শব্দের আদিতে অ এবং আ স্বরধ্বনি স্থলে লিখিত হয়েছে 'য়' এবং 'য়া' ব্যঞ্জন ধ্বনি।

হিন্দুপুথির লিখন-রীতিতে তিনটি শ, ষ, স ধ্বনির পার্থক্য সুনির্দিষ্ট ছিল—যে পার্থক্য বর্তমানেও স্পষ্ট। কিন্তু মধ্যযুগের শেষ দশকের এবং ফার্সি—হিন্দি ভাষাশ্রিত পুথিতে ব্যবহৃত হয়েছে একটি মাত্র 'স'।

হিন্দু পুথিতে আধুনিক লিখন-রীতির মত 'ণ' এবং 'ন' ধ্বনির পার্থক্য রক্ষিত হয়েছে। মধ্যযুগের কোনো মুসলিম পুথিতে 'ণ'—ধ্বনির ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে 'ন' ধ্বনি।

ঘ. লিপি বিকৃতির কারণ

মধ্যযুগের আওয়াধি হিন্দি, আরবি, ফার্সি ভাষার লিপিবিকৃতি এবং লিখনরীতির বৈষম্যের কারণ নানাবিধ।

১. লিপিকরের অজ্ঞতা

বর্তমানে আমরা যে সব পুথি পাচ্ছি বা পেয়েছি তার অধিকাংশই লিপিকৃত। লিপিকর পুথি অনুলিপি করতে গিয়ে অজ্ঞতার জন্য বর্ণের নানারূপ বিকৃতি ঘটিয়েছেন। সেই পুথি দেখে পরবর্তীকালে অন্য কোনো লিপিকর অনুলিপি করতে গিয়ে নতুন রকম বিকৃতি ঘটিয়েছেন। কিংবা কেউ হয়ত কোনো বর্ণের সঠিক আদলটি লিখতে পারেন নি ॥বিকৃত করে ফেলেছেন, পরবর্তী সময়ে অজ্ঞ কোনো লিপিকর সঠিক আদলটি কি হতে পারে তা বিবেচনা না করে ভুল আকৃতিটি হুবহু লিপিবদ্ধ করেছেন। এমনি করে লিপি পরম্পরায় বর্ণের বিকৃত আদলটি বিস্তৃতি লাভ করেছে। এরূপ অজ্ঞ লিপিকরদের আধিপত্য দেখা যায় মধ্যযুগের শেষের দিকে।

সে সময়ে পুথি অনুলিপিকরণ জীবিকার্জনের সামগ্রীরূপে পরিণত হয়। তখন অনেক অশিক্ষিত লিপকর অর্থোপার্জনহেতু পুথি লিপি করতেন। অনেক সময় পুথি লিপি করতে গিয়ে দ্রুত লেখা শেষ করার উদ্দেশ্যে একজন পাঠ করতেন অন্যজনে তা শুনে শুনে লিখতেন। যিনি লিখতেন তিনি তার বিদ্যারই নির্দশন রাখতেন পুথির মধ্যে। এমনি করে পুথির লিখনরীতি শিকার হয়েছে নানা বিকৃতির।

সংস্কৃতাশ্রিত পুথির কোনো প্রতিলিপিই এমনি অশিক্ষিত বা অজ্ঞ লিপিকর দ্বারা বিকৃত হয়নি।

২. দেবনাগরী লিপির প্রভাব

লিপির ইতিহাসে দেখা যায় দেবনাগরী ও বাংলা লিপি প্রায় একই সঙ্গে বিবর্তিত হয়েছে, এবং দেবনাগরী বারবার বাংলা লিপিকে স্তিমিত করে তার আধিপত্য বজায় রেখেছে। নবম/দশম শতকে বাংলা লিপির পূর্ণ আকৃতি লাভ করার পরেও দেবনাগরী লিপির প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিলীন হতে সময় লেগেছে বহুকাল। পঞ্চদশ শতকে চার পাঁচটি বর্ণ লিখিত হয়েছে দেবনাগরী লিপিতে। ষোড়শ শতকে দেবনাগরীর প্রভাব আরও হ্রাস পেয়ে মাত্র দুটি বর্ণ (উ, ং) লিখনে ব্যবহৃত হয়েছে। এরপরে সপ্তদশ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দেবনাগরীর প্রভাব পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে উ, অ, ক, গ, ঘ, ঠ প্রভৃতি বর্ণ অনেক ক্ষেত্রে দেবনাগরী লিপির আকৃতি ধারণ করেছে। যেমন—

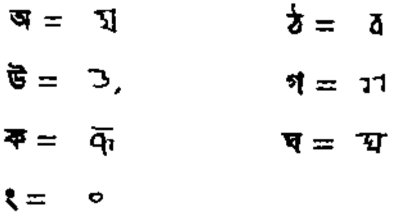

এরূপ দেবনাগরী অক্ষর অজ্ঞ লিপিকরদের হাতে বিকৃত হতে হতে ধারণ করেছে বিদ্‌ঘুটে আকৃতি।

৩. ঔপভাষিক প্রভাব ও আঞ্চলিক প্রভাব

মধ্যযুগের লিখন রীতি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে ঔপভাষিক ও আঞ্চলিক প্রভাব দ্বারা। আরবি—ফার্সি ও আওয়াধি হিন্দি ভাষাশ্রিত পুথির লিখনরীতি ঔপভাষিক প্রভাব দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বেশি। সংস্কৃতাশ্রিত বাংলা পুথিতে ঔপভাষিক প্রভাব আছে তবে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সংস্কৃত ভাষার প্রভাবই সর্বাধিক। সর্ব্ব, কার্য্য, কর্ম্ম, ধর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের যথার্থ ব্যবহার এবং শুদ্ধ প্রয়োগ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সমসাময়িক মুসলিম পুথিতে এর সাদৃশ্যে দ্বিত্ব বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়েছে রেফ চিহ্ন। যেমন—চির্ত্ত, আল্লা, লর্জ্জা, বির্দ্যা, সর্জ্জা প্রভৃতি। সংস্কৃত পুথিতে এরূপ অর্থহীন রেফ চিহ্নের ব্যবহার নেই বললেই চলে। এরূপ যুক্ত বর্ণের ব্যবহার অজ্ঞ লিপিকরদের হাতে বিকৃত আকার ধারণ করেছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পাণ্ডুলিপির পাঠান্তর সমস্যা

ক. পাঠান্তরের সংজ্ঞা

একই কাব্যেব ভিন্ন বা ব্যতিক্রমধর্মী পাঠকে পাঠান্তর বলে। পাঠান্তর সাধারণত লিপিকরকর্তৃক সংঘটিত হত। প্রাচীন ও মধ্য যুগেব সাহিত্যকৃতি প্রচারিত হত প্রতিলিপি পরম্পরায়। বিখ্যাত বিখ্যাত গ্রন্থের শত শত কপি লিপিকৃত হত। লিপিকর ভেদে, দেশ ভেদে, যুগ ভেদে এ সব প্রতিলিপি নানারূপ পাঠান্তরদ্বারা আক্রান্ত হত। পাণ্ডুলিপি গবেষণার জন্য এ পাঠান্তর বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক।

খ. পাঠান্তরের শ্রেণীবিভাগ

কোন পুথির একাধিক প্রতিলিপির ভিন্ন ভিন্ন পাঠই পাঠান্তররূপে বিবেচিত। প্রতিলিপির এই পাঠান্তর নানা ক্ষেত্রে সংঘটিত হত। যেমন—১. বানানের ক্ষেত্রে পাঠান্তর, ২. শব্দের ক্ষেত্রে পাঠান্তর, ৩. একটি ছত্রের ক্ষেত্রে পাঠান্তর, ৪. একাধিক ছত্র বা পংক্তির ক্ষেত্রে পাঠান্তর, ৫. অনুবাদককৃত পাঠান্তর।

১. বানানের ক্ষেত্রে

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যই একাধিক বার প্রতিলিপিকৃত হয়েছে। যে সব কাব্য প্রাচীন যুগে এবং মধ্যযুগের প্রথম দশকে লিখিত হয়েছে তার বানানরীতি মধ্যযুগের শেষ দশকের বানান রীতি থেকে ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। মধ্যযুগের শেষ দশকের কোন লিপিকর যখন এই প্রাচীন সময়ের কোন কাব্য প্রতিলিপি করেছেন তখন তাতে তাঁর (লিপিকরের) সময়ের লিখন রীতি অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এভাবে যুগে যুগে লিপিকর ভেদে বানানে নানারূপ পাঠান্তর সৃষ্টি হয়েছে। বানানের এই পাঠান্তর লিপিকর দ্বারা দুইভাবে সংঘটিত হয়; (i) ইচ্ছাকৃত পাঠান্তর (ii) অজ্ঞতাজনিত পাঠান্তর।

(i) লিপিকররা গ্রন্থ লিপি শেষে যতই লিখুক না কেন "যৎ দৃশ্যাতে তৎ লিখ্যতে" মূলত এ শব্দটি একটি গৎবাঁধা রীতি ছিল। কার্যত এটি কখনও ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রতিটি প্রতিলিপিতেই কিছু না কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথম

বাংলা ভাষায় রচিত 'কবীন্দ্র মহাভারত' কে গ্রহণ করা যেতে পারে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। তাঁর রচিত কাব্যে বানানের শুদ্ধ প্রয়োগ ছিল। তিনি ন-ণ, শ-ষ-স, য-জ, ি-ী-এর পার্থক্য সঠিকরূপে লিখেছিলেন। পরবর্তীকালে লিপিকররা তাঁদের জ্ঞান এবং সময়ের প্রচলিত রীতি অনুয়ায়ী বানানের নানারূপ পাঠান্তর তৈরি করেছেন। বানানের এই পাঠান্তর কালের বিবর্তন অনুয়ায়ী ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হয়েছে। যেমন— ১৫৬৮ শকাব্দের লিপিকৃত পুথিতে বানানের পাঠান্তর ছিল সামান্য। যেমন—

সত্যবাদী দেহ তুক্ষি পুণ্য শরীর। ঢা.বি.পা.সং: ৪৯৭৭ পৃ. ২১০
সত্যবাদী দেহ তুমি পুন্য শরির। ঢা.বি.পা. সং-৪১৯৬

উক্ত পাঠ দুটির প্রথমটির বানান শুদ্ধ। দ্বিতীয়টির 'পুণ্য' শব্দের ণ-বর্ণটি এবং 'শরীর' শব্দের ' ি' বর্ণটি পাঠান্তরিত হয়েছে।

রণ মধ্যে খসিল হাতের ধনু শর। ঢা.বি.পা.সং: ৪৯৭৭
রন মধ্যে খগিল হাতের ধনু ষর ঢা.বি.পা.সং: ২০২৫, পৃ. ৮৪

উক্ত উদাহরণটির ণ-বর্ণ এবং শ-বর্ণ পাঠান্তরিত হয়েছে। এ পুথির সর্বত্রই ণ-বর্ণ এবং শ-ষ বর্ণ পাঠান্তরিত হয়েছে।

শুনিয়াছি দশ নাম ধরএ অর্জ্জুন ঢা.বি.পা.সং: ৪৯৭৭
য়র্জ্জুনের দশ নাম করহ বিবরন ঢা.বি.পা.সং: ২০২৪

এ উদাহরণটিতে অ-বর্ণ এবং ণ-বর্ণের পাঠান্তর ঘটেছে। এ পুথির সর্বত্রই এ রীতি অনুসৃত হয়েছে। এখানে লিপিকর তার অভিরুচি এবং জ্ঞান অনুযায়ী ছত্রের সামান্য রদবদল করেছেন। তিনি সমসাময়িক সময়ের এবং সমাজের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী লিখনরীতির পরিবর্তন করেছেন। এতে সৃষ্টি হয়েছে বানানের পাঠান্তর। মহাভারতের শেষের দিকের প্রতিলিপিতে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে হ্রস্ব স্বর। যেমন—নারি, বির, দুর, সুর্জ্য, পুরি, মালি-প্রভৃতি। অর্থাৎ দীর্ঘ স্বরের ক্ষেত্রে লিখিত হয়েছে হ্রস্ব স্বর, এবং ন-ণ, শ-ষ-স, য-জ-প্রভৃতি স্বরের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কোন পার্থক্য রক্ষিত হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুল বানান লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই পাঠান্তর স্বসময়ের প্রভাবে লিপিকরের জ্ঞান এবং অভিরুচি অনুযায়ী সংঘটিত হয়েছে।

(ii) অজ্ঞতাজনিত পাঠান্তর

মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যখন পুথি লিপি করা পেশায় পর্যবসিত হয়, তখন অনেক অল্পশিক্ষিত লিপিকরও পুথি লিপি করতেন জীবিকার্জনের নিমিত্ত। অনেক সময় একজনে পুথি পাঠ করতেন অন্য একজনে তা শুনে শুনে লিখতেন। যিনি লিখতেন তিনি তার অজ্ঞতার জন্য শুদ্ধ বানানকে ভুল বানান রূপে লিখে যেতেন। এরূপ শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে বানানে পাঠান্তর সৃষ্টি হত।

২. শব্দের ক্ষেত্রে পাঠান্তর

কখনও কখনও লিপিকর একটি-দুটি শব্দ পরিবর্তন করে লিখতেন। এতে সৃষ্টি হত পাঠান্তরের। যেমন—

অর্জ্জুনের কাছে গিয়া গর্জ্জে মহারোষে। ঢা.বি.পা.সং-ক
এ ছত্রটি দেখে অন্য লিপিকর লিখলেন—
য়র্জ্জুনেব কাছে গিয়া গর্জ্জএ বিস্তর। ঢা.বি.-২০২৪

এখানে প্রথম উদাহরণের 'মহারোষে' শব্দটি পরিবর্তন করে দ্বিতীয় পুথির লিপিকর লিখেছেন 'বিস্তর' শব্দটি। এতে সৃষ্টি হয়েছে পাঠান্তরের।

তবে পুনি সেই দুঃখ হইব য়াচম্বিত। ঢা.বি.পা.সং: ৪১৯৬
পাঠান্তর—তবে পুনি সেই দুঃখ হইব উপস্থিত। ঢা.বি.-২০২৪

উক্ত উদাহরণ দুটির প্রথমটির 'য়াচম্বিত' শব্দটি দ্বিতীয় উদাহরণে লিপিকর পরিবর্তন করে লিখেছেন 'উপস্থিত' শব্দটি।

নামবাচক শব্দ

অনেক সময় লিপিকর অনুলিপি কালে স্বপাণ্ডিত্য প্রকাশে তৎপর থাকতেন। নামবাচক শব্দে জ্ঞান বেশি থাকলে প্রতিলিপিতে বিশেষ বিশেষ নাম পরিবর্তন করে লিখতে সচেষ্ট থাকতেন। ফলে নামবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও নানা প্রকার পাঠান্তর সৃষ্টি হত। যেমন—

উফারি পড়িল খর্গ হাসে ভুতেশ্বর।—ক
পাঠান্তর-উফারি পড়িল খর্গ হাসে মহেশ্বর।—২০২৪

এখানে পূর্বোক্ত পুথির 'ভুতেশ্বর' নামটি পরিবর্তন করে পরবর্তী লিপিকর লিখেছেন 'মহেশ্বর' শব্দটি।

শ্রুতকির্ত্তি বিন্দে শল্য সিংহের বিক্রম।
দুঃশাসন বিন্দিলে মাদ্রীর নন্দন ॥-ক
পাঠান্তর—শ্রুতকির্ত্তি বিন্দে শল্য নির্ভয় শরীর।
দুঃশাসন বিন্দে সহদেব মহাবীর ॥-খ

উক্ত উদাহরণটিতে প্রথম পংক্তির 'সিংহের বিক্রম' এবং 'মাদ্রীর নন্দন' শব্দের স্থলে পরবর্তী প্রতিলিপিকার লিখেছেন 'নির্ভয় শরীর' এবং 'সহদেব মহাবীর'।

৩. একটি ছত্রের পাঠান্তর

লিপিকর কর্তৃক এই পাঠান্তর একটি দুটি শব্দের ক্ষেত্রে যেমন সংঘটিত একটি সম্পূর্ণ ছত্রের ক্ষেত্রেও তেমন সংঘটিত হত।

(i) সাত্যকির সমে কৃতবর্ম্মা করে রণ।
পাঠান্তর-কৃতবর্ম্মা সাত্যকির হইল মোহারণ ॥

(ii) শঙ্খ রব করি আইসে যুঝিতে কারণ।
পাঠান্তর-সিংহনাদ করিলেন্ত মহাঘোর রব ॥-গ

(iii) আদি হেন যারে বোল পুরুষ পুরাণ।
পাঠান্তর-পরম পুরুষ জাক বোলে মহিমান ॥-খ

(iv) কাহারে সান্নেহ করি সংগ্রাম করিব।
পাঠান্তর-কার সমে যুঝিমু কার কিবা নাম ॥-খ
পাঠান্তর-কার সঙ্গে যুঝিবেক কেমন জুঝার।-ঘ

লিপিকর এখানে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশের মানসে বিষয়কে অক্ষুণ্ন রেখে প্রতিলিপিতে ছত্রসমূহ পরিবর্তন করে লিখেছেন।

৪. একাধিক ছত্রের পাঠান্তর
লজ্জা পাইল দুঃশাসনে নকুলের রণে।
ধ্বজ জষ্টি কাটিয়া পড়িল ততক্ষণে ॥
নকুলের তুরগ কাটিল দুঃশাসনে।
ধ্বজ কাটি ভুমিত পড়িল ততক্ষণে ॥-ক

পাঠান্তর-দুঃশাসনে দুই বানে নকুলেরে হানে।
ধ্বজ ঋষ্ঠি কাটিয়া পড়িল আর বানে ॥
নকুলে দুঃশাসনে হৃদয় গাড়িয়া।
শতে বান কাটে হাসিয়া হাসিয়া ॥-ঘ

লিপিকর পুথি অনুলিপি করতে গিয়ে সম্ভবত ভুলে যেতেন যে তিনি লিপিকর ॥কবি নন। তাই যখনই কাব্যের কোন অংশ মনঃপূত না হত তখনই তা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নিজের মত করে লিখতেন। এ পরিবর্তনে বিষয় অক্ষণ্ন থাকত। বিষয়কে অক্ষণ্ন রেখে এরূপ যে পরিবর্তন তা পাঠান্তর নামে বিবেচিত। পাণ্ডুলিপি গবেষণায় গবেষককে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে কোনটি মূল পাঠ এবং কোনটি পাঠান্তর।

৫. অনুবাদককৃত পাঠান্তর

অনুবাদকালে কবি মূল গ্রন্থের বিষয় পরিবর্তন না করে কোন শব্দ, কোন বিশেষ নাম, উপস্থাপনের কৌশল প্রভৃতি পরিবর্তন করে লিখতেন। এ পরিবর্তনও পাঠান্তর রূপে বিবেচিত। যেমন—কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংস্কৃত মহাভারত থেকে বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করতে গিয়ে এরূপ বহু পাঠান্তরের জন্ম দিয়েছেন। যেমন—সংস্কৃতে আছে ॥অর্জুন বনবাস যাত্রাপথে মনিপুরেশ্বরের কন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণি গ্রহণ করেছেন। কবীন্দ্র লিখেছেন-বিদ্যাবীর্যের কন্যা হৈলাবতীর পাণি গ্রহণের কথা। সংস্কৃতে দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে অধিক ভালবাসতেন অর্জুনকে। কবীন্দ্র মহাভারতে দ্রৌপদী বেশি ভালবাসতেন ভীমকে। সূতরাজার কর্ণপুত্র লাভ, কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা, ভৃগুপতিরামের অভিশাপ, ইরাবন্তের জন্ম, অর্জুনকর্তৃক নাগিনী হত্যা ও পুত্রোৎপত্তি, নাগের সংকল্প, অর্জুনের খাণ্ডব দাহ, অর্জুনকর্তৃক সুভদ্রাকে ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন প্রভৃতি বিষয় কবীন্দ্র একটু একটু পরিবর্তন করে ভিন্নরূপে উপস্থাপন করেছেন। এ পরিবর্তনগুলি এক অর্থে পাঠান্তররূপে বিবেচিত।

চতুর্দশ অধ্যায়

পাণ্ডুলিপির প্রক্ষিপ্ত পাঠ

ক. প্রক্ষিপ্ত পাঠের সংজ্ঞা

কোন রচনার মূল অংশ ব্যতীত অতিরিক্ত কোন সংযোজিত অংশকে প্রক্ষিপ্ত পাঠ বলা হয়। মানুষভেদে যেমন স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে, তেমনি পুথিভেদেও পরিবর্তন ঘটে তার লিখন পদ্ধতির, লিখন বৈশিষ্ট্যের, লিখন প্রকৃতির। প্রতিলিপির এই পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন পুথি সাহিত্যে প্রক্ষেপণরূপে পরিচিত।

খ. প্রক্ষেপণ ও পাঠান্তরের মধ্যে পার্থক্য

পাঠান্তর হল বিষয়ভিত্তিক পরিবর্তিত পাঠ আর প্রক্ষেপণ হল বিষয় ব্যতীত কিংবা বিষয়সংশ্লিষ্ট ভিন্ন পাঠ। প্রক্ষেপণ এবং পাঠান্তরের আভিধানিক অর্থ একই-'নতুন সংযোজন', তবে সংযোজনের প্রক্রিয়া ভিন্ন। পাঠান্তরের ব্যাপকতা অল্প। কেবল শব্দ, ছত্র এবং পংক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এর বিষয় একই থাকে এবং ছত্রের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। শুধু বাচন প্রক্রিয়া, ভাষার রদবদল এবং উপস্থাপন বৈশিষ্ট্য ভিন্ন থাকে। কোন কাব্যের মূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন অথবা সংশ্লিষ্ট নতুন পাঠ হল প্রক্ষেপণ। এর ব্যাপকতা বিস্তৃত। এ প্রক্ষেপণ একটি ছত্র থেকে আরম্ভ করে একটি পর্ব এবং একটি অধ্যায় পর্যন্তও হতে পারে।

গ. প্রক্ষিপ্ত পাঠ সমস্যা

এক দেশের কাব্য অন্যকোন দেশের লিপিকর প্রতিলিপি করতে বসে অনেক সময় স্বদেশের রীতি এবং স্ববৈশিষ্ট্য কাব্য মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটাতে ব্রতী থাকতেন। প্রাচীন কাব্যের ইতিহাসে দেখা যায় অধিকাংশ কাব্যই মূলের অংশ থেকে বর্ধিত হয়েছে। কাব্যের মূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন বা বর্ধিত এই অংশবিশেষ প্রক্ষেপণরূপে পরিচিত। এই

প্রক্ষেপণ কাব্যের পাতায় পাতায়, অধ্যায় শেষে, গ্রন্থ শেষে, গ্রন্থারম্ভে লিপিবদ্ধ হত। পাণ্ডুলিপি গবেষণায় এই প্রক্ষেপণ এক জটিলতর সমস্যা। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের সময়ও কাব্যের প্রক্ষেপণ ঘটত। অনুবাদক অনুবাদকালে অনেক সময় স্বাধীনভাবে কাব্যের পরিবর্ধন, পরিবর্জন এবং পরিশোধন করতেন। এই পরিবর্ধন বা প্রক্ষেপণ কখনও কখনও এত সুদীর্ঘ হয়েছে যা একটি অধ্যায় এবং পৃথক কাব্যরূপেও পর্যবসিত হয়েছে। যেমন—মহাভারতের হরিবংশ, রামায়ণের আদিকাণ্ড, উত্তরকাণ্ড। এই প্রক্ষেপণের একটা কারণ হল সমসাময়িক প্রভাব। কবীন্দ্র পরমেশ্বর বেদব্যাস রচিত সংস্কৃত মহাভারত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে সমসাময়িক জনগণের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তার জন্য তাকে মূল কাব্যের বহু অংশ যেমন বর্জন করতে হয়েছে তেমনি নতুন অনেক কিছু সংযোজনও করতে হয়েছে। আবার এই কবীন্দ্র মহাভারত যখন বিভিন্ন লিপিকরদের হাতে লিপিকৃত হয়েছে তখন নানা প্রক্ষেপণদ্বারা প্রতিলিপিসমূহ হয়েছে আক্রান্ত। কোন কাব্য একাধিক লিপিকরের হাতে হুবহু লিপিকৃত হয়েছে এমন নিদর্শন বিরল। কাব্যলিখনে এই প্রক্ষেপণ কাদের দ্বারা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক সংঘটিত হত সে সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করা যাক। সাধারণত এই প্রক্ষেপণ সংঘটিত হতো কবিঅনুবাদক, লিপিকর এবং গায়েন কবিদ্বারা।

১. কবি অনুবাদককর্তৃক প্রক্ষেপণ ২. লিপিকরকর্তৃক প্রক্ষেপণ ৩. গায়েন কবিকর্তৃক প্রক্ষেপণ

১. কবি অনুবাদক

প্রাচীনকালে সংস্কৃত সাহিত্যের রচয়িতা মাত্রই কবি নামে খ্যাত হতেন। যিনি নাটক লিখতেন তিনিও কবি আবার যিনি পদ্য-গদ্য লিখতেন তিনিও কবি। মধ্যযুগের এবং আধুনিক যুগের গোড়ার দশকে আমরা যত সাহিত্যকৃতি পেয়েছি তা প্রায় সবই কোন না কোন সাহিত্য থেকে অনূদিত এবং পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থের ভিতরের কোন বিষয় বা চরিত্র অবলম্বনে রচিত। সেই প্রাচীন গ্রন্থ যখন এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে তখনই তা কিছু না কিছু প্রক্ষেপণদ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক রামায়ণ-মহাভারতের কথা। বেদব্যাস যে-আকারে মহাভারত লিখেছিলেন পরবর্তীকালে তা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন কবিদের হাতে সংযোজিত হতে হতে মূলের বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রামায়ণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

প্রাচীন সময়ে যাঁরা কাব্য রচনা বা অনুবাদ করতেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তখন পাণ্ডিত্যের লড়াইয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে না পারলে পণ্ডিত উপাধি থেকে বঞ্চিত হতেন। এবং পণ্ডিত সমাজ থেকেও বিতাড়িত হতেন। তাই তখন যাঁরা লিখতে বসতেন, তাঁদের উদ্দেশ্য থাকত তার গ্রন্থটি যেন সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। এমনকি মূল গ্রন্থের থেকেও সুন্দর করার প্রচেষ্টায় ব্রতী থাকতেন। এমন চেতনায় কবিগণ অনুবাদ কালে যে বিষয় সমূহ অবলম্বন করতেন এবং যার ফলে প্রক্ষেপণ সৃষ্টি হত তা হল—

শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ ভিত্তিক প্রক্ষেপণ।
উপদেশ অর্থে প্রক্ষেপণ।
সমসাময়িক সমাজের চাহিদা ভিত্তিক প্রক্ষেপণ।
স্বপাণ্ডিত্য প্রদর্শন পূর্বক প্রক্ষেপণ।
ব্যক্তিগত রুচি-প্রকৃতি ভিত্তিক প্রক্ষেপণ।

(i) শব্দ ও অলংকার প্রয়োগ ভিত্তিক প্রক্ষেপণ

গ্রন্থ অনুবাদ কালে মূল গ্রন্থের কোন স্থলের শব্দ কবির মনপূত না হলে কিংবা শব্দ প্রয়োগে দুর্বলতা মনে হলে তিনি তা পরিবর্তন করে উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে কাব্যের মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকতেন। সে যুগে পাণ্ডিত্য প্রকাশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল উপমা প্রয়োগ। অনুবাদকালে কবি মূল কাব্যের অনেক সাধারণ বর্ণনাকে উপমা প্রয়োগ দ্বারা অসাধারণ করতেন। যেমন—

মৃণাল সমান বাহু উরু সুললিত।
নাসা তিল ফুল যেন বৃক্ষ সুশোভিত ॥
দশন দাড়িম্ব পাতি কুরঙ্গ লোচন।
রাজার মহিষী হেন দেখিএ লক্ষণ ॥
কিবা দেব গন্ধর্বের হয়সি বসিতা।
নাগ কন্যা হয় কিবা নগর দেবতা ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধরী কিবা চন্দ্রের রুহিনী।
রাক্ষস পিচাস কিবা হয় উর্বসিনী ॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রানী কিবা বরুনের নারী।
তোম্মার রূপের গুণ কহিতে না নাবি ॥

কবীন্দ্র মহাভারতের এ অংশটি নতুন সংযোজন অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত অংশ। বনবাসকালে দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনায় নানা উপমা দ্বারা কাব্যিক গুণ বৃদ্ধি করেছেন।

(ii) উপদেশাত্মক প্রক্ষেপণ

অনুবাদের সময় মূল কাব্যে উপদেশ মূলক কোন ঘটনা বা বাক্য থাকলে, সেই ঘটনার তুলনাস্বরূপ এবং উপদেশ স্বরূপ ভিন্ন কাহিনী উপস্থাপিত হত। এভাবে কোন দুঃখের ঘটনায়, সুখের ঘটনায় উপমা বা সাদৃশ্যমূলক নতুন কাহিনী সংযোজন করতেন কবি। এরূপ বর্ণিত ঘটনাবলী উপকাহিনী রূপে বিবেচিত। এ উপকাহিনীগুলি মূল কাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন তবে সামঞ্জস্য পূর্ণ। যেমন—জনমে জয় ব্যাসদেবকে কুরুপাণ্ডব ধ্বংসের জন্য অভিযুক্ত করলে ব্যাসদেব বলেন, লোভ ও ক্ষমতার মোহ মানুষকে অন্ধ এবং উন্মাদে পরিণত করে। কোন সৎ উপদেশ তখন তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। এ বিষয়টি কবীন্দ্র পরমেশ্বর একটি উপকাহিনীর মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এ উপকাহিনীটি মূল কাব্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরূপ কপিরাজ উপাখ্যান, হৈলাবতী উপাখ্যান প্রভৃতি। এ সব উপকাহিনী প্রক্ষেপণরূপে বিবেচিত। উপদেশ প্রদান অর্থেও প্রক্ষেপণ ঘটত, যেমন:

বিজয় পাণ্ডব কথা যমত লহরি।
সলিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি ॥

ভারত শ্রবণে সর্ব্ব পাপ দূরে জাএ।
য়ায়ুর্জ্জস বাড়ে দুঃক্ষ দারিদ্র পলাএ ॥
লস্কর পরাগল ভুবন বিদিত।
করাইল পাচালি লোকের হইল হিত ॥

(iii) সমসাময়িক সমাজের চাহিদা ভিত্তিক প্রক্ষেপণ

কবি গ্রন্থ রচনা করেন সমকালীন সমাজের কথা চিন্তা করে। তখন রাজসভায়, কবিসভায় সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যের মূল্য এক প্রকার নির্ধারণ হয়ে যেত। ফলে কবি অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে সমসাময়িক সমাজের রীতি-নীতি, রুচি-প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে কাব্য রচনা করতেন। সমসাময়িক চাহিদা অনুযায়ী কাব্যের রদবদল করতেন। অনেক সময় মূল কাব্যের সামাজিক রীতি বর্জন করে স্বসময়ের রীতি-বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ ঘটাতেন আবার কখনও মূল কাব্যের সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোজনও করতেন।

(iv) প্রশস্তিমূলক প্রক্ষেপণ

প্রাচীনকাল থেকে পর্যায়ক্রমে রাজা-বাদশাহ-জমিদার দ্বারা রাজ্য শাসিত হয়েছে। তখন কবি সাহিত্যিকরাও এসব রাজা-বাদশাহের অনুগ্রহভাজন ছিলেন। কাব্য অনুবাদকালে কবিদের স্ব স্ব পৃষ্ঠপোষকদের মনোরঞ্জন হেতু নানা তোশামোদ বাক্য লিখতে হত। কাব্য মধ্যে কিছুক্ষণ পর পর এক বা একাধিক ছত্রে এই প্রশস্তি মূলক বাক্য লিখিত হত। এ বাক্যসমূহ প্রক্ষেপণ রূপে বিবেচিত। যেমন—

য়ন্ত্র সন্ত্র বিসারদ মহিমা অপার।
কলি যুগে হরি যেন কৃষ্ণ য়বতার ॥
রাস্তিখান তনয় বহুল গুননিধি।
পৃথিবীতে কল্পতরু নিরমিল বিধি ॥
নৃপতি হোসেন সাহ পঞ্চম গৌড়নাথ।
ত্রিপুরের ভার সমর্পিল জার হাত ॥
শয়ানে পালঙ্গ দিল একশত ঘোড়া।
সম্ভোগ সহিতে দিল বিবিধ কাপরা ॥
দরিদ্র বরন করে য়নাথের গতি।
লস্কর পরাগল খান য়তি সে সুমতি ॥

(v) ভণিতা লিখনজাত প্রক্ষেপণ

কবি অনুবাদকালে গ্রন্থারম্ভে, অধ্যায় শেষে এবং গ্রন্থ শেষে ভণিতা লিপিবদ্ধ করতেন। এ ভণিতায় কবি নানা বিষয় সংযোজন করতেন। এ সংযোজনও এক প্রকার প্রক্ষেপণ। যেমন—

গ্রন্থারম্ভের ভণিতা
রাস্তিখান তনয় বহুল গুণনিধি।
পৃথিবীতে কল্পতরু নিরমিল বিধি ॥

সুলতান হোসেন পঞ্চম গৌড়নাথ।
ত্রিপুরের ভার সমর্পিল জার হাতে ॥
সোনার পালঙ্গ দিল একশত ঘোড়া।
সম্ভোগ সহিতে দিল বিবিধ কাপড়া ॥
তাহান আদেশ তবে সিরেত ধরিয়া।
কবীন্দ্র কহিল কথা পাঁচালি রচিয়া ॥
এক মনে সুনে জেবা ভারত কথন।
জাহারে সুনিলে হয়ে স্বর্গেতে গমন ॥
গ্রন্থ মাঝের ভণিতা
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
পদ পাদ রসময় সুনহ তাহার ॥
রাস্তিখান তনয়ের খান মহাসয়ে।
তাহান আদেশ পাইয়া কবিন্দ্রে রচয়ে ॥
পর্বশেষের ভণিতা
ভারতের পুন্য কথা অমৃত লহরি।
সুনিলে য়ধর্ম হরে পরলোকে তরি ॥
সুনিলে য়ধর্ম ঘোচে মহাপাপ ব্যথা।
এহি মোতে সমাপ্ত হইল য়াদি পর্ব্ব কথা ॥

২. লিপিকর কর্তৃক প্রক্ষেপণ

লিপিকরের কর্তব্য মাছিমারা কেরানীর মত অর্থাৎ হুবহু প্রতিলিপি করা। যদিও অধিকাংশ প্রতিলিপি শেষে "যৎ দৃশ্যতে তৎ লিখ্যতে" শব্দটি লিখিত হয় তথাপি এর অর্থ কেউই সঠিক রূপে পালন করতেন না। প্রতিলিপি মাত্রই কিছু না কিছু পাঠান্তর, প্রক্ষেপণ, পরিবর্জন প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হত। প্রক্ষেপণ বেশি সংঘটিত হত শিক্ষিত লিপিকরদের হাতে। যে সব ক্ষেত্রে লিপিকরকর্তৃক প্রক্ষেপণ হত তা হল-

(i) অতিরিক্ত জ্ঞান ভিত্তিক প্রক্ষেপণ
(ii) অজ্ঞতা জনিত প্রক্ষেপণ
(iii) পুষ্পিকা লিখনে প্রক্ষেপণ
(iv) প্রশস্তি বাক্য লিখনে প্রক্ষেপণ

(i) অতিরিক্ত জ্ঞান ভিত্তিক প্রক্ষেপণ

শিক্ষিত লিপিকর পুথি অনুলিপি করতে বসে স্ব জ্ঞান ও বিদ্যা প্রয়োগ করতে ব্রতী হতেন। কোন অংশের বর্ণনা তার মনঃপূত না হলে তিনি নতুন বাক্য সংযোজনের দ্বারা পূর্ণতা দান করতেন। যেমন—কোন সামাজিক রীতি পদ্ধতির অংশ লিখতে গিয়ে যদি দেখতেন তার সমাজের সাথে মিলছে না, তখন তিনি পরিবর্তন করে স্বসমাজের রীতি-পদ্ধতি সংযোজন করতেন। অনেক সময় পূর্ববর্তী লিপিকর কোন অংশ বাদ রেখে লিখে গেলে পরবর্তী লিপিকর তার নিজস্ব জ্ঞান দ্বারা তা পূর্ণ করতেন। প্রাকৃতিক এবং কালের

ব্যবধানে কোন অংশ পাঠের অযোগ্য হলে লিপিকর তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী তা পূর্ণ করতেন। লিপিকর কর্তৃক এই অতিরিক্ত সংযোজন প্রক্ষেপণরূপে বিবেচিত।

(ii) অজ্ঞতা জনিত প্রক্ষেপণ

অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লিপিকরদের দ্বারা অজ্ঞতাজনিত প্রক্ষেপণ সংঘটিত হত। পূর্বে পুথি সংরক্ষণের সুব্যবস্থা ছিল না। অনেক সময় এক সঙ্গে একটি গাঁটের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের একাধিক পুথি রক্ষিত হত। এতে অনেক সময় একটা গ্রন্থের মধ্যে অন্য গ্রন্থের পত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিংবা কেউ ভুলবশত একটা গ্রন্থের পত্র অন্য গ্রন্থে সংস্থাপন করে রেখেছে। পরবর্তী সময়ে অজ্ঞ কোন লিপিকর পুথি লিপি করতে গিয়ে গ্রন্থের ভিন্নতা অনুধাবন করতে না পেরে একই পুথিরূপে প্রতিলিপি করে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এরূপ প্রক্ষেপণ দ্বারা আক্রান্ত বহু গ্রন্থ রয়েছে। 'কপিদূত' নামক একটি গ্রন্থের প্রথম ১০টি শ্লোক লেখার পরে ধারাবাহিক ভাবে ঘটকর্পর কাব্যের শ্লোক লিখিত হয়েছে। কপিদূত কাব্যের ক্ষেত্রে ঘটকর্পরের এ অংশটি প্রক্ষেপণরূপে বিবেচিত।

(iii) পুষ্পিকা লিখনে প্রক্ষেপণ

পুথি প্রতিলিপি শেষে ভণিতাংশের পর লিপিকর গ্রন্থ সম্বন্ধীয়, লেখক সম্বন্ধীয় এবং আত্মবিবরণীমূলক অংশ লিপিবদ্ধ করতেন। এ অংশ কখনও সংক্ষিপ্ত হত কখনও সুদীর্ঘ হত। এরূপ অংশ কখনও কখনও গ্রন্থমধ্যের অধ্যায়শেষে লিপিবদ্ধ হত। এ অংশ প্রক্ষিপ্ত পাঠরূপে বিবেচিত।

> ইতি মহাভারত্তে পাণ্ডববিজয়ে অভিষেক পর্ব্ব সমাপ্ত।
> ভিমস্বামিরনে ভঙ্গ মুনিনঞ্চ মতিভ্রমঃ।
> যথা দিষ্টি তথা লিখিতং লিখন নাস্তি দোষেনং ॥
> ইতি সন ১২০৮।
> শ্রী নারায়ন দাস।
> রামনারায়নানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
> কৃষ্ণ কেসর কংসারে হরে ॥
> ললাটে লিখিতং জৈষ্ঠ সষ্টি জাগর বাসরে
> নম হরি সঙ্কর ব্রহ্মণা ॥

(iv) প্রশস্তিবাক্য লিখনে প্রক্ষেপণ

পাণ্ডুলিপির লিখনরীতির একটা বৈশিষ্ট্য হল গ্রন্থারম্ভে আরাধ্য দেব-দেবীর বন্দনা লিপিবদ্ধ করণ। অনেক সময় কোন লিপিকর পুথি অনুলিপি করতে গিয়ে লেখক লিখিত প্রশস্তি বাক্যের পরিবর্তে স্ব আরাধ্য দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন লিপিবদ্ধ করতেন। এ প্রশস্তি বাক্য লিপিকরের না রচয়িতার তা কাব্যের অন্যান্য পাঠের সঙ্গে ভাষাগত দিক থেকে নিরীক্ষা করলেই সহজে অনুধাবন করা যাবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পাঠ সমালোচনা

ক. পাঠ সমালোচনার সংজ্ঞা

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল পাঠ সমালোচনা। পাঠ সমালোচনার মাধ্যমেই কোন পুথির সঠিক সম্পাদনা সম্ভব। প্রাচীন পুথি প্রচারিত হত প্রতিলিপি পরম্পরায়। এক একটা কাব্যের অসংখ্য প্রতিলিপি লিখিত হত। প্রতিলিপি পরম্পরায় একই কাব্যের নানা প্রকার পাঠভেদ সংঘটিত হত। অনেক সময় বৃহদাকৃতির গ্রন্থ একাধিক লিপিকর কর্তৃকও লিপিকৃত হত। লিপিকরভেদে, দেশ ভেদে, সময়ভেদে কাব্যের লিখনরীতি প্রভৃতির প্রভেদ ঘটত। এই প্রভেদসমূহ কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটছে, কেন ঘটছে, মূল কাব্য থেকে কোন প্রতিলিপি কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, কতটা সামঞ্জস্যহীন, কোন পুথি কতটা পাঠ বিকৃতিদ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কোন পুথি কতটা গ্রহণ করেছে, কতটা বর্জন করেছে, কোন পুথি কতটা প্রক্ষেপণযোগে বর্ধিত হয়েছে প্রভৃতি সামগ্রিক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণপূর্বক বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়কেই পাঠ সমালোচনা বলা হয়।

খ. পাঠ সমালোচনা পদ্ধতি

বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয়ে পুথির বিভিন্ন বিষয় পর্যায়ক্রমে সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। এ বিষয়সমূহ যেমন—

১. প্রতিলিপি নির্বাচন

সম্পাদনার নিমিত্ত কাব্যটি কতবার প্রতিলিপিকৃত হয়েছে, এ বিষয়টি বিভিন্ন Manuscripts index, Descriptive catalogue এবং আনুষঙ্গিক বিবিধ source থেকে জেনে নিশ্চিত হতে হবে। এর পরে জ্ঞাত সার্বিক প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে হবে।

ধরা যাক, একটি কাব্য পাঁচবার প্রতিলিপিকৃত হয়েছে। এ পাঁচটি প্রতিলিপি সংগ্রহশেষে প্রথমে বিচার করতে হবে এর কোনটি পূর্বের কোনটি পরবর্তী সময়ের। পুথিতে সময় সম্পর্কে জ্ঞাত তথ্য না থাকলে পুথির উপাদান-অর্থাৎ কাগজ, কালি, লিপির আকৃতি প্রভৃতি দেখে এর প্রাচীনত্ব বিচার করতে হবে। পুথির প্রথম এবং শেষের কিছু অংশ পাঠ করলেই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এভাবে ক্রমানুসারে-ক, খ, গ, ঘ, ঙ বা ১, ২, ৩, ৪, ৫ এর যে কোন সংখ্যায় পুথিসমূহকে চিহ্নিত করতে হবে।

২. প্রতিলিপির প্রকৃতি বিশ্লেষণ

প্রতিলিপি নির্বাচনের পরে এর প্রতিটি পুথি পৃথক পৃথক রূপে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রতিটি পুথির উপাদান, পুথির লিখন উপকরণ, লিখন বৈশিষ্ট্য, লিখন রীতি (লিখন স্টাইল), লিপির আকৃতি, লিপির বৈশিষ্ট্য, লিপিকরের পরিচিতি, লিপিকরের হস্তাক্ষর, পুথিপ্রাপ্তির স্থান ভিত্তিক তথ্যানুসন্ধান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় সূক্ষ্ম-পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃতপাঠ বা আদর্শ পুথি নির্বাচন করতে হবে। এর পরে এই আদর্শ পুথির পাঠের সঙ্গে অপর পুথিসমূহের পাঠ তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মিলাতে হবে।

৩. আদর্শ পাঠ বিশ্লেষণ

কাব্যের শুরু থেকে প্রতিটি ছত্র ধরে আদর্শ পুথির সঙ্গে অপর পুথিসমূহের পাঠ বিশ্লেষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আদর্শ পুথির প্রতিটি ছত্রের কোন্ বর্ণ, কোন্ শব্দ পাঠান্তরের শিকার হয়েছে, কোন্ পুথির কোন্ কোন্ অংশ লিপিকর প্রমাদ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কোন্ অংশ প্রক্ষেপণজাত, কোন্ পুথির কোন্ অংশ বর্জিত হয়েছে, কোন্ বর্ণ বা শব্দটি পরিবর্তিত হয়েছে, কোন্ অংশের কোন্ বিষয় বা ঘটনা ব্যতিক্রমরূপে উপস্থাপিত হয়েছে প্রভৃতি সার্বিক বিষয় আনুবীক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিরীক্ষার মাধ্যমে পাঠোদ্ধার পূর্বক অভীষ্ট স্থলে পৌঁছাতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে আদর্শ পুথি নির্বাচন করতে খুবই জটিলতার সৃষ্টি হয় বা কোন একটি পুথিকে আদর্শ পুথিরূপে নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। ধরা যাক-কোন কাব্যের প্রাপ্ত পাঁচটি প্রতিলিপির সবচেয়ে প্রাচীন পুথিটির সামান্য অংশ ব্যতীত সবই বিলুপ্ত হয়েছে, অপর পুথিসমূহের কোনটির প্রথমাংশ, কোনটির মাঝের অংশ, কোনটির শেষের অংশ বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু সবগুলি পুথির সমন্বয়ে কাব্যটির সম্পূর্ণ অংশ প্রাপ্তি সম্ভব। এ ক্ষেত্রে পাঠ সমালোচনার মাধ্যমে সমন্বিত পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক সম্পাদনা করতে হবে। প্রতিলিপির পাঠভেদে কম বেশি প্রকারভেদ সৃষ্টি হয়। ঠিক কোন পাঠটি মূল পুথি থেকে আহৃত তা সুনির্দিষ্ট করে বলা দুষ্কর। এ হেতু প্রাপ্ত সমুদয় পাঠ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অনুধাবন করতে হবে। সমন্বিত পাঠ তৈরিতে দৃষ্টি রাখতে হবে প্রতি ছত্রের ভাষা, ছন্দ-অলংকার, শব্দমাধুর্য প্রভৃতির দিকে। যেমন—

(i) ক-পুথি = জেই মনোরথ তুহ্মি হৃদয় ভাবিলা।
খ-পুথি = জেই বর ইচ্ছা তোর মনেতে ধরিলা।
গ-পুথি = জেই বর ইচ্ছা তুহ্মি মনেতে ভাবিলা।

(ii) ক-পুথি = অর্জ্জুনের কাছে গিয়া গর্জ্জে মহারোষে।
গ-পুথি = য়র্জ্জুনের কাছে হিয়া গর্জ্জএ বিস্তর।
ঘ-পুথি = য়র্জ্জুন নিকটে য়াসি গর্জ্জএ অনেক।

এ ক্ষেত্রে একটি পাঠ আদর্শ পাঠরূপে বিবেচিত হয়ে মূল পাঠে যুক্ত হবে এবং অন্য পাঠসমূহ তথ্যপঞ্জিতে লিপিবদ্ধ হবে। এভাবে পাঠ-সমালোচনার মাধ্যমে পাণ্ডুলিপির বিভ্রান্তিমূলক কন্টকাকীর্ণ পাঠকে সুবোধ্য এবং বিশুদ্ধ পাঠে পরিণত করা সম্ভব।

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির রচনাকাল নির্ণয়ে সমস্যা ও সমাধান

পুথি ভিত্তিক পর্যালোচনা

বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যেমন একটি বিতর্কিত রচনা তেমনি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এর লিপিকাল নিয়ে। লিপি-সমালোচকগণের বিভিন্ন সুচিন্তিত মতের স্রোতোধারা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বহমান। বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে, "পুথিটি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হয়েছে"।[১] ড. নলিনী কান্ত ভট্টশালীর অভিমত, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিটির "লিপিকাল ১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী"।[২] রাধাগোবিন্দ বসাক মত প্রকাশ করেছেন, "১১৫৯-১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এটি অনুলিখিত হয়েছিল।[৩] " এস. এন চক্রবর্তী অনুমান করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পঞ্চদশ শতাব্দীর পুথি "বোধিচর্যাবতার (১৪৩৫ খ্রি.)-এর সমসাময়িক।"[৪] যোগেশচন্দ্র রায় পুথিটির আবিষ্কার স্থান বিষ্ণুপুর অঞ্চলের বহু পুথির লিপি বিচারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করেছেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে নয়।"[৫] ড. সুকুমার সেন একবার "১৬০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে নয়"[৬] এবং

দ্বিতীয় বার "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে"[৭] শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল বলে মত পোষণ করেছেন। ড. মো: আব্দুল কাইউম বিভিন্ন পণ্ডিতদের বিভিন্ন মতামত নানাভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল পঞ্চদশ শতাব্দীই।"[৮] এখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির বর্ণমালার সঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্য দুটি পুথির বর্ণমালা পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকালও পনেরো শতক কি-না। এই তুলনামুলক বিচার বিশ্লেষণের জন্য আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের একটি পুথি (১৪৩৯ খ্রি., সারদা তিলক)-কে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকের একটি পুথি (১৪৭১ খ্রি. সংস্কৃত মহাভারত)-কে গ্রহণ

করেছি।"৯ (পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। লিপিকালহীন "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" পুথির অনুলিপি কালকে একটা সুনির্দিষ্ট সময়সীমায় সুচিহ্নিত করার জন্য পণ্ডিতজনের বহুবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে বর্ণের সাথে বর্ণ মিলিয়ে দেখার পদ্ধতিটি এ যাবৎ মোটামুটি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। সেই অনুসারে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির সঙ্গে পনেরো শতকের পুথি 'সারদা তিলক (১৪৩৯ খ্রি.)' ও 'মহাভারত (১৪৭১ খ্রীঃ)' পুথির বর্ণমালাকে মিলিয়ে দেখা যাক কোন সিদ্ধান্তে বা সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসায় পৌঁছা যায় কি-না।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'সারদাতিলক' ও 'মহাভারত' এই তিনটি পুথির বর্ণমালার বর্ণসমূহের অনেকগুলির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

যেমন :

স্বরবর্ণ : অ, আ, ঈ, উ, এ, ও।

ব্যঞ্জনবর্ণ : ঙ, ঝ, ঞ, ত, ড, ঢ, প, ব, ভ, ম, য, ল, ব, ষ, ল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির এই বর্ণগুলো অন্য দুটো পুথির অভিন্ন বর্ণাকৃতির সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়।

আবার উপর্যুক্ত তিনটি পুথির কতগুলো বর্ণ আছে যেগুলির মধ্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে বেশ সাদৃশ্য আছে বলে লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে সেগুলির মধ্যেও বেশ পার্থক্য অনুভূত হয়। এখন এক এক করে আকৃতিগত দিক থেকে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বর্ণসমূহ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা যাক।

ই : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর 'ই' বর্ণের মাথার আকৃতিটি আধুনিক বাংলা 'ই' এর কাছাকাছি। কিন্তু সারদাতিলকে 'ই' এর আকৃতি আধুনিক বাংলা 'ছ'-এর মত। মহাভারতের 'ই' ও প্রায় সারদাতিলকের 'ই'-এর মত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ই'-এর সঙ্গে অন্য দুটো পুথির পার্থক্য বিদ্যমান।

উ : 'উ'-এর পার্থক্যটা স্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'উ'-এর নিম্নাংশ (উপরের 'চেতন'বাদে)-এর আকৃতি আধুনিক বাংলা বর্ণের, উ এর মত। অন্যদিকে 'সারদাতিলকের' ও 'মহাভারতের' পুথি দুটো 'উ' এর সর্বনিম্নভাগের বক্র রেখাটির আকৃতি সংস্কৃত 'ও' (ু) কারের মত।

ঋ : 'ঋ'-কারের অমিলটা খুব বেশি না হলেও একেবারে চোখ এড়িয়ে যাবার মত নয়। তিনটি পুথির 'ঋ'-এর বাঁদিকের উপরের অংশের 'উত্তল' রেখাটি পরস্পর ভিন্নাকৃতির।

ঐ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ঐ' বর্ণকে খুব সহজভাবেই 'সারদাতিলক' ও 'মহাভারত' পুথির 'ঐ' বর্ণ থেকে পৃথক করা যায়।

ঔ : আধুনিক 'ঔ ' বর্ণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ঔ' এর বেশ সাদৃশ্য রয়েছে, আর পঞ্চদশ শতাব্দীর পুথি দুটোর 'ঔ' এর সঙ্গে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের এই 'ঔ' বর্ণটি কিছুতেই পঞ্চদশ শতাব্দীর নয় বরং তার পরবর্তীকালের।

আধুনিক	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি		সানুপাতিক পুথি		মহাভারত (কর্ণপর্ব) পুথি	
	১ম রীতি	২য় রীতি	১ম রীতি	২য় রীতি	১ম রীতি	২য় রীতি
অ	অ		অ		অ	
আ	আ		আ		আ	
ই	ই		ই		ই	
ঈ	ঈ		ঈ		ঈ	
উ	উ		উ		উ	
ঊ	ঊ		ঊ		ঊ	
ঋ	ঋ		ঋ		ঋ	
এ	এ		এ		এ	
ঐ	ঐ		ঐ		ঐ	
ও	ও		ও		ও	
ঔ	ঔ		ঔ		ঔ	
ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
খ	খ		খ		খ	
গ	গ		গ		গ	

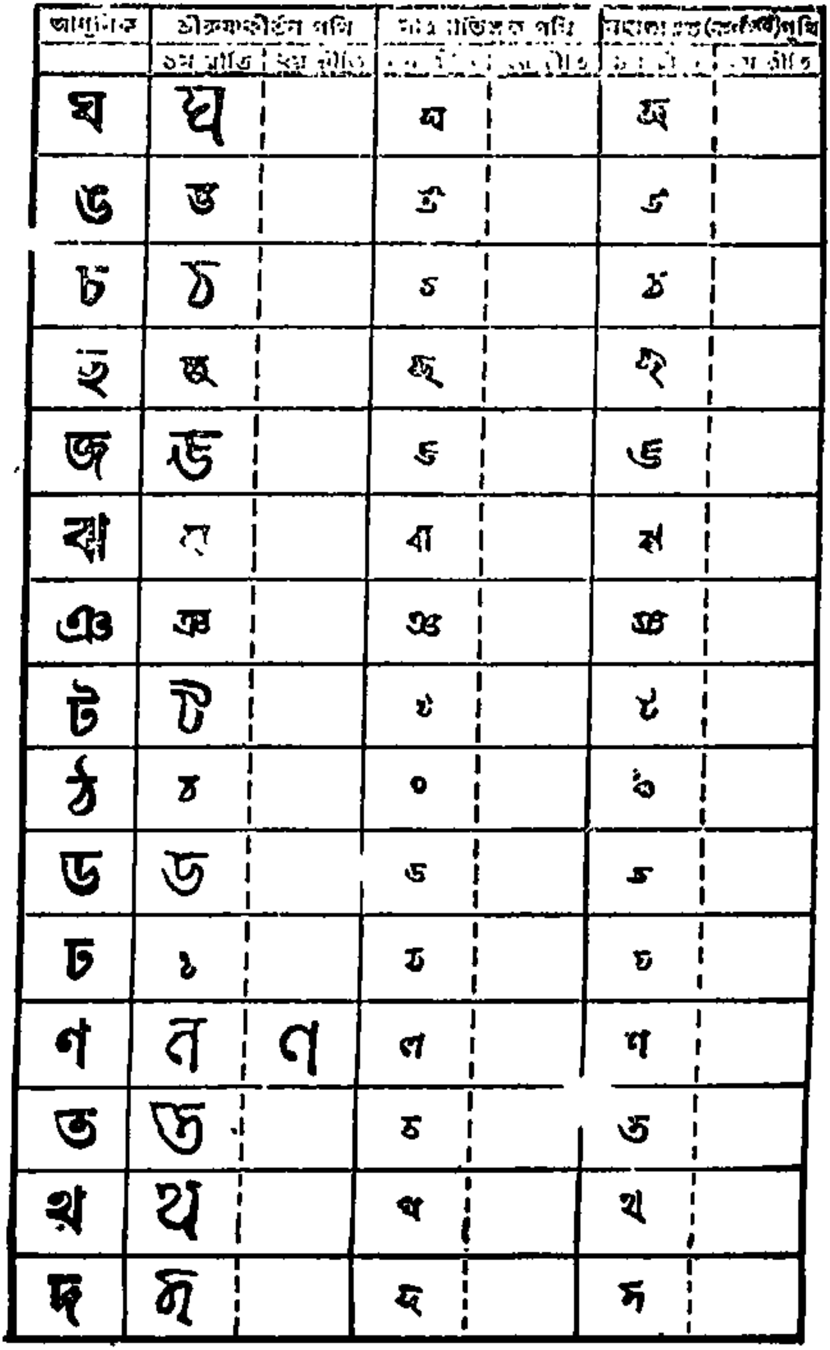
আধুনিক
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি
১ম রীতি
২য় রীতি
ঘ
ঙ
চ
ছ
জ
ঝ
ঞ
ট
ঠ
ড
ঢ
ণ
ত
থ
দ

আধুনিক	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি		সারদাতিলক পুথি		মহাভারত(কবীন্দ্র) পুথি	
	১ম রীতি	২য় রীতি	১ম রীতি	২য় রীতি	১ম রীতি	২য় রীতি
ধ	ধ		ধ		ধ	ধ
ন	ন	ন	ন		ন	
প	প		প		প	
ফ	ফ		ফ		ফ	
ব	ব		ব		ব	
ভ	ভ		ভ		ভ	
ম	ম		ম		ম	
য	য		য		য	
র	র		র	র	র	
ল	ল		ল	ল	ল	
শ	শ		শ	শ	শ	
ষ	ষ		ষ		ষ	
স	স		স		স	
হ	হ		হ		হ	
ক্ষ	ক্ষ		ক্ষ		ক্ষ	

ক : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ক' বর্ণকে দেখে সহসা 'ফ' বলেই দৃষ্টি বিভ্রম হয়। এর বাম ও ডান দিকের আকৃতি অনেকটা 'ফ' এর মতই। শুধু 'ক'-এর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা এখানে খাড়া দণ্ডটির সঙ্গে মিশে গেছে। অন্যদিকে 'সারদাতিলক' ও 'মহাভারতের' 'ক' অভিন্নাকৃতি বিশিষ্ট। যদিও একটু বাঁকা ধরনের কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় এটি 'ক'। অর্থাৎ বলা চলে পঞ্চদশ শতাব্দীর 'ক' থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ক' বেশ স্বতন্ত্র।

খ : 'খ'-এর বেলায়ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'খ' পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্য দুটো পুথির 'খ' থেকে একটু আলাদা হয়েছে বামদিকের গোলাকৃতির অংশটির জন্য।

গ : 'গ'-এর ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'গ'-এর সঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীর 'গ'-এর আকৃতিগত অভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও সারদাতিলক পুথির 'গ'-এর সঙ্গে এর পুরোপুরি ভিন্নতা বজায় রয়েছে।

ঘ : পঞ্চদশ শতাব্দীর 'ঘ'-এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ঘ'-এর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ার মত। পঞ্চদশ শতাব্দীর দুটো পুথির 'ঘ'-এর নিম্নাংশের আকৃতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ঘ'-এর নিম্নাংশের আকৃতি থেকে আলাদা ধরনের।

চ : সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'চ' এবং অন্য দুটো পুথির 'চ'-এর মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে।

ছ : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির 'ছ'-কে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষার্ধের একটি পুথির 'ছ'-এর সঙ্গেও মিলানো যাচ্ছে না। অতএব একে পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখা থেকে আলাদা বলে মনে করা যায়।

জ : তিনটি পুথির 'জ'-এর আকৃতির ক্ষেত্রে অমিলের থেকে মিলটাই চোখে পড়ে বেশি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'জ' সারদাতিলকের 'জ'-এর সঙ্গে কিছুটা পার্থক্যযুক্ত হলেও মহাভারতের 'জ'-এর সঙ্গে অনেক বেশি মিলনাত্মক।

ট : 'ট-এর বেলায়ও তিনটি পুথির কিছুটা বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথিটির 'ট'-এর মাথার ঊর্ধ্বাংশ পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্য দুটো পুথির 'ট'-এর সংশ্লিষ্ট অংশের বাম দিকে অনেকখানি বেশি বিস্তৃত হয়ে আছে।

ঠ : 'ঠ'-এর অমিলটা সহজভাবেই বোঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ঠ' কে বর্তমান বাংলা লিপির 'ঠ'-এর 'চেতন'বাদে নিম্নাংশের অনুরূপ বলে মনে হয়। কিন্তু অপর দুটো পুথির 'ঠ' এর আকৃতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ঠ' থেকে স্পষ্টতই আলাদা।

ণ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ণ' (প্রথমরীতির) অন্য দুটো পুথির 'ণ' থেকে সম্পূর্ণ আলাদা আকৃতিবিশিষ্ট।

থ : পঞ্চদশ শতাব্দীর দুটো পুথির 'থ' একই রকম হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এর 'থ' থেকে সেগুলি অনেকখানি আলাদা।

দ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'দ' ও মহাভারত-এর 'দ' অনেকটা একই আকৃতির কিন্তু সারদাতিলকের 'দ' এর আকৃতিটা একটু অন্য রকমের।

ধ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ধ' আধুনিক বাংলা লিপির 'ধ' এর মত, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর পুথি দুটির মত নয়।

ন : 'ন'-এর বেলায়ও পার্থক্য স্পষ্ট। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'ন'-এর বাঁদিকের আকৃতি অনেকটা গোলাকার বৃত্তের মত। পঞ্চদশ শতাব্দীর পুথি দুটোর 'ন' অভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট হলেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির 'ন'-এর সঙ্গে এ গুলির আকৃতিগত কোন মিল নেই।

ফ : পঞ্চদশ শতাব্দীর দুটো পুথির 'ফ'-এর সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির 'ফ'-কে মিলিয়ে দেখলে মনে হয়; 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির 'ক' এর আকৃতি পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালেরই। এছাড়া স্মর্তব্য যে, আধুনিক 'ফ'-এর সেরূপ কোন পার্থক্য নেই।

র : 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির পেটকাটা 'র' পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তী কালের বিশেষ করে সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক পুথিতে দেখা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর 'র'-এর মাঝখানটা কালি দিয়ে ভরানো, এবং এই আকৃতির 'র' এ প্রাচীনত্বের নিদর্শন বর্তমান।

শ : পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অনুলিখিত পুথি মহাভারতের সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' পুথির 'শ' এর মিল দেখা যায়। কিন্তু সারদাতিলকের 'শ' এর আকৃতিটা অন্যরূপ।

স : 'স' এর ক্ষেত্রেও তিনটি পুথির পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়।

হ : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'হ' পঞ্চদশ শতাব্দীর দুটো পুথি থেকেই আলাদা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'হ' এর যে আকৃতি তা সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক পুথিতে দেখা যায়।

এই তিনটি পুথির প্রত্যেকটিতেই কিছু কিছু বর্ণের দুটো করে আকৃতি অর্থাৎ একই বর্ণ দুই আকৃতিতে একই পুথিতে প্রচলিত ছিল। সে জন্য দুটি আকৃতিকে প্রথম ও দ্বিতীয় রীতি বলে চিহ্নিত করা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির দ্বিতীয় রীতির বর্ণ—ক, র, শ, ল। মহাভারত পুথির দ্বিতীয় রীতির বর্ণ মাত্র দুটি—ক, ধ। অবশ্য দুটো রীতিই একই লিপিকরের লেখা। দেখা যাচ্ছে, এই দ্বিতীয় রীতির বর্ণাকৃতিসমূহ তিনটি পুথিতেই খুবই কম। প্রথম রীতির প্রাধান্যই সমস্ত পুথিতে বেশি দেখা যায়। দ্বিতীয় রীতিটি পূর্ববর্তী বলে কিংবা সমকালে সুপ্রচলিত থাকা বর্ণাকৃতির অপরিবর্তিত বা পরিবর্তিত রূপই বটে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির দ্বিতীয় রীতির কিছু বর্ণের সঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীর সংশ্লিষ্ট বর্ণগুলির বেশ মিল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই মিল দেখেই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। কেননা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির দ্বিতীয় রীতির সংশ্লিষ্ট বর্ণাকৃতিগুলির স্বরূপ পঞ্চদশ শতাব্দীর উপর্যুক্ত পুথিগুলিতেই কেবল নয় বরং সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুলিপিকৃত প্রচুর সংখ্যক পুথিতেও লক্ষ্য করা যায়।

উক্ত তিনটি পুথির বর্ণের আকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, এখানে বর্ণের বৈসাদৃশ্য যেমন আছে সাদৃশ্যও তেমনি আছে। এই সাদৃশ্যের নিরিখে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথিকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনুলিখিত বলে রায় দেয়া যেতে পারত; কিন্তু তা সঙ্গত নয়—কারণ কেবলমাত্র আলাদাভাবে কিছু বর্ণের সাদৃশ্য দেখে লিপিতাত্ত্বিক কাল নির্দেশ সমীচীন নয়। স্মরণযোগ্য যে, খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে অনুলিখিত একটি পুথির লিপিমালা দুই একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রায় হুবহু আধুনিক বাংলা লিপির মতই।[১০]

এ থেকে স্পষ্ট যে এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দীতে বর্ণমালার আকৃতিসমূহের সবই একই সঙ্গে বদলায় না কিংবা পরিবর্তিত হয় না। এই পরিবর্তন সাধিত হয় অত্যন্ত ধীরগতিতে। যে কোন শতাব্দীর প্রথমদিকের পুথিতে পুরোনো বা পূর্ববর্তী শতাব্দীর রীতিই থাকে বেশি, নতুন রীতি বা বর্ণের সংখ্যা থাকে খুব কম। মধ্যবর্তী সময়ের পুথিতে পুরোনো রীতির সঙ্গে নতুন রীতির বা বর্ণের প্রাধান্য থাকে বেশি। আর শেষের দিকের পুথিতে সে যুগের রীতির সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী যুগে কিছু রীতি ও কিছু বর্ণাকৃতির আগমন দেখা যায়। এই পরিবর্তনগুলো সব বর্ণের বেলায় ঘটে না কিছু কিছু বর্ণের ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। তাই সহজভাবে শুধু এক শতাব্দীর কিছু বর্ণের সঙ্গে মিল-অমিল দেখিয়ে একটা শতাব্দী নির্ধারণ করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এখানে সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে হবে বর্ণের পরিবর্তনের স্বরূপ। পরিবর্তনের এই স্বরূপটা শুধু বর্ণের বেলায়ই নয়, 'া'-কার 'ি'-কার ' ু '-কার ' ূ '-কার, লিপিকরের লেখার ধরন বিশেষ করে স্বর সংযুক্ত ব্যঞ্জন কিংবা যুক্ত বর্ণের ভিতর বেশি লক্ষ্য করতে হবে। যেহেতু তখন সব পুথি হাতে লেখা হত, তাই লেখার ধরনে পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটত এবং এ পরিবর্তনটা যুক্তবর্ণ লেখার ক্ষেত্রেই ঘটে যেত বেশি।

তাই বলা যায় : 'শব্দ বা পঙ্‌ক্তিস্থিত অন্যান্য হরফের কিংবা যুক্ত বর্ণের অনুষঙ্গে না দেখে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যক্ষ করে একটি হরফের কালিক-বিবর্তনধারা সম্যক উপলব্ধি করা যায় না।"[১১] উদাহরণত উল্লেখ্য, "অনুস্বার হরফটি অশোকের শিলালিপি (খ্রীস্টপূর্বে তৃতীয় শতক) থেকে শুরু করে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত অভিন্ন আকারে চালু থেকেছে"।[১২] তাহলে প্রশ্ন জাগে: পুথির বর্ণমালাকে আলাদাভাবে স্থাপন করে কাল নির্ণয়ের যে প্রচেষ্টা আমরা উপরে গ্রহণ করেছি তা কি আদৌ সঙ্গত? কিংবা এ পথে আমাদের প্রচেষ্টা কি আদৌ ফলবতী হবে?

পূর্ণমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে কেবলমাত্র বর্ণসমূহের তুলনামূলক আলোচনাই নয় বরং বিভিন্ন যুক্তবর্ণ, স্বরচিহ্নাদিযুক্ত ব্যঞ্জন, ফলকযুক্ত ব্যঞ্জন ইত্যাদি সকল লিপিবৈশিষ্ট্যের ও লিপিকলার সহায়তায় আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির কাল নির্ণয়ে কতটুকু সঠিক ধারণা পেতে পারি, তা এখন দেখা যাক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'া'-কার ও 'ি'-কার নিয়ে ইতিপূর্বে বহু আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। 'বিজন বিহারী ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির 'া'-কার 'ি'-কারের মধ্যে অভিন্নতার কথা বলেছেন।"[১৩] শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিতে যে 'ি'-কার তা পঞ্চদশ শতাব্দীর 'ি'-কার থেকে আলাদা। পঞ্চদশ শতাব্দীর পুথির 'া'-কার ও 'ি'-কারের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির 'ি'-কারের উপরের 'উত্তল'-এর পরিবর্তে মাত্রার মত একটি রেখা দেখা যায়। এবং রেখাটি মাত্রার ঊর্ধ্বে নয়, মাত্রার স্থানে। আর মাত্রাটি বাঁকা হয়ে একটু নীচের দিকে নেমে এসেছে। আবার কোথাও কোথাও সামান্য বক্র 'উত্তল'-যুক্ত 'ি'-কার আছে কিন্তু তা খুবই কম। তাই সহজভাবে সর্বত্র যে 'ি'-কার চোখে পড়ে আমরা তারই সাথে তুলনা করব। এই আকৃতির-'ি'-কার ঊনবিংশ শতাব্দীর পুথিতে দেখা যায়। যেমন : ঊনবিংশ শতাব্দীর পুথিতে :

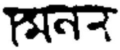 (মিলন); 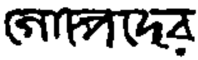 (গোপিদের) [দ্রঃ ৩৬৭০ (১৩ক) সং ঢা. বি. পু]।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথিতে:

(পড়ি); (দিনের)।

অপর পক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীর উপর্যুক্ত দুটি পুথিতে এরকম 'ি'-কার আদৌ লক্ষ্য করা যায় না।

যেমন : সারদাতিলক পুথিতে :

(অসিতাংঙ্গ—১.১খ); (ডাকিনী১.১-খ)।

মহাভারত-এর পুথিতে :

(পিকু—১৯০খ); 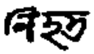 (নিহত—১৯০খ) ইত্যাদি।

এই উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে এ ধারণায় স্থিত হতে হয় যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর পুথিটি পঞ্চদশ শতাব্দীর পববর্তীকালেই অনুলিখিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর দুটো পুথির সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিব এই-ি-কার লিখনরীতির অমিল দেখে এবং উনিশ শতকে অনুলিখিত কোন কোন পুথিতেও এই রীতি চালু থাকায় উল্লিখিত ধারণা হওয়াটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

বহু প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীরও কোন কোন পুথিতে অন্যরীতির সাথে কমবেশী প্রায় সর্বত্রই 'উ'-কার নির্দেশক 'ব'-ফলার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে এই রীতিটা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকের পুথি সারদাতিলকে সর্বত্রই দেখা যায়। এ পুথিটিতে 'উ'-কার নির্দেশের বেলায় এরূপ 'ব'-ফলা ছাড়া অন্য কোন রীতি প্রায় আদৌ ব্যবহৃত হয়নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে অনুলিখিত পুথি মহাভারতে আধুনিক 'ু'-কার এবং 'ব'-ফলা নির্দেশক 'উ'-কার এই রীতির প্রচলনের পরিমাণ সমান। আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথিতে 'ব'-ফলা নির্দেশক 'উ'-কারের ব্যবহার খুবই কম; কিন্তু 'ু' আকৃতির 'উ'-কারের ব্যবহারই প্রাধান্য পেয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুলিখিত পুথিসমূহে 'উ'-কার নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রীতিই অনুসৃত হয়েছে। এখন বিভিন্ন পুথির উদাহরণ দেখে কথাগুলির সত্যতা যাচাই করা যাক।

সারদতিলকের পুথি (পনেরো শতক, ৪৬০৮ সং. ঢা. বি. পু.)

(পুত্র—১.১খ); (বিশুদ্ধ—১.৮ খ);

(সংযুক্ত—১.১খ)

মহাভারতে পুথি (পনেরো শতক, ৪৯৫ সং. ঢা. বি. পু.) :

(পুত্রা-১৯০ খ); (রাজনু—১৯০ খ)

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি

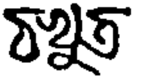 (চখুত); 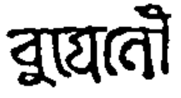 (বুয়েলো); (দুখ)।

সপ্তদশ শতাব্দীর মহাভারত পুথি

(পুরি) (সুধা)

নরসিংহ পুরাণ (সপ্তদশ শতাব্দী, ৩২৩ সং ঢা. বি. পু)

(মুক্তো, ৯৩ ক); (পুত্রেণ, ৯৩ ক)।

তন্ত্রসার (সপ্তদশ শতাব্দী, ১৯২ সং ঢা. বি. পু)

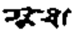 (২৬৮ খ); 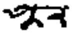 (৪৬ ক); (২৬৮ খ)।

উনবিংশ শতাব্দীর পুথি (৩৬৭০ সং ঢা. বি. পু)

(১৩ ক)।

উপরের উদ্ধৃতিগুলোর নিরিখে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিটি পনেরো শতকের পূর্বে অনুলিপীকৃত তো নয়ই বরং এর অনুলিপীকাল বেশ পরবর্তীকালেই সম্ভাবিত।

যুক্ত বর্ণের বেলায় দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর পুথিতে "ঈ, কু, গ্ন, ঈ, দ্দ এই ৫টি অক্ষর মূলত : একই রকম।"[১৪] যেমন—

(সঙ্গতী); 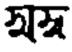 (স্বপ্ন); (কাকুতী);

(দুই); 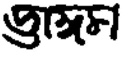 (উদ্দেশ)।

কিন্তু সারদাতিলক পুথির এই যুক্ত বর্ণগুলি একটা থেকে অন্যটার আকৃতি আলাদা।

(ষ্ণ), (ন্ন) (ন্দ), ((ন্দ)।

মহাভারত পুথির এই যুক্ত বর্ণগুলির পার্থক্যও লক্ষণীয়। যেমন :

(ক্ষু), (ক্ষ), (ক্ষ); (ক্ষ) ইত্যাদি।

এছাড়াও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির— (রুণুঝুণু)।

'সারদাতিলক' পুথির— 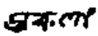 (অরুণা ৯৮ ক)।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের— (নিন্দে)

'সারদাতিলকে'র (সন্দি ৯৯ খ)।

অর্থাৎ 'রু'-কার ও 'ন্দ' কারে ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। এমনি করে দেখলে দেখা যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির যুক্ত বর্ণের সঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীর যুক্ত-বর্ণের প্রচুর ব্যবধান। স্বাভাবিকভাবে বলতে গেলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ যুক্ত বর্ণের অবস্থিতির জন্য পুথি পাঠোদ্ধারে কোন জটিলতা সৃষ্টি হয় না। অপর পক্ষে যুক্ত বর্ণের অবস্থিতির কারণে পঞ্চদশ শতাব্দীর দুটো পুথির স্বাভাবিক পাঠোদ্ধার কার্য জটিলতায় বিঘ্নিত হয়ে ওঠে। এই সংযুক্ত বর্ণের জন্যই পঞ্চদশ শতাব্দীর পুথিগুলির পাঠোদ্ধার বেশ কঠিন ব্যাপার। পঞ্চদশ শতাব্দীর উক্ত দুটি পুথির আর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো একটা মৌলিক বর্ণের সঙ্গে অন্য আর একটা মৌলিক বর্ণ এমনভাবে মিলিয়ে লেখা হয়েছে যা সহজ দৃষ্টিতে বোঝা যায় না। কিছু উদাহরণ দেয়া যাক।

'সারদাতিলক' পুথি হতে

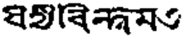 (যজ্ঞবিন্দুমৎ, ৯৬ ক);

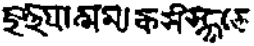 (জুহুয়াৎ সম্যক সংস্কৃতে, ৯৬ ক)

'মহাভারত' পুথি থেকে

(নগৃহ্যতং ১৯০ খ);

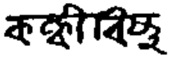 (কল্কীবিষ্ণু, ২১১ খ)।

এই ধরনের কোন যুক্ত বর্ণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথিতে দেখা যায় না। আর একটা বিষয় লক্ষণীয়—পঞ্চদশ শতাব্দীর দুটো পুথিতেই মাত্রাহীন 'ত' দিয়ে 'ৎ' এবং মাত্রাহীন 'ম' দিয়ে 'ম্' বোঝানো হয়েছে। যেমন—

'সারদাতিলক' পুথির

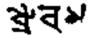 (ধ্রুবম, ৯৬ ক); (ন্যাসেৎ, ৯৬-ক)

মহাভারত পুথির

(বিশম্, ১৯০-খ): (মহৎ, ১৯০ খ);

এই রীতির ব্যবহার দুটো পুথিতেই প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায় যা 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' পুথিতে একেবারেই দেখা যায় না। অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ পঞ্চদশ শতাব্দীর এই রীতির ছোঁয়াচও লাগেনি।

এখন গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো : শুধুমাত্র লিপিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারেই কোন পুথির সঠিক কাল নির্ণয় করা যায় না। এক্ষেত্রে আরো কয়েকটি উপকরণের সহায়তা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন—কাগজ, কালি, লেখার ধরন কিংবা লিপিবিন্যাস-প্রণালী।

আলোচিত তিনটি পুথির লেখার ধরন, কালি, কাগজ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিটি যে প্রাচীন সে বিষয়ে কোন দ্বন্দ্ব নাই। কিন্তু কত প্রাচীন? তাই নিয়েই সমস্যা। পুথিটি পুরোনো রীতির অক্ষরে লেখা। সেদিক থেকে প্রাচীনত্বের পরিচয় রাখে। এখন দেখা যাক, এই পুরানো রীতির অক্ষরগুলো কোন ঢঙে কোন বর্ণে লেখা এবং তা পঞ্চদশ শতাব্দীর পুথির বর্ণে ঢঙে মেলে কিনা। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির হাতের লেখা সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত প্রচলিত। এ সম্পর্কে বসন্ত রঞ্জন রায়ের ধারণা—"পুথি তিন হাতে লেখা"।[১৫] তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের অনুমান-৫ "পুথি দুই স্টাইলে লেখা' একটি ধরে ধরে সাজানো লেখা, আর একটি দ্রুত টানা লেখা। কিন্তু লেখা সাজানোই হোক, বা টানাই হোক, অক্ষরের আকৃতি বা 'ফর্ম' এক।"[১৬]

ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

পুথিটি—"দুইটি ভিন্ন হাতের লেখা।"[১৭] অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথিতে দুইটি রীতি প্রচলিত। কিন্তু সারদাতিলক পুথিতে শুরু থেকে শেষ অবধি একটা স্টাইলেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্ত পুথিটিই গোটা গোটা সুন্দর হাতে সযত্নে লিখিত। লেখার কোথাও ছোট বড় বাঁকা সৌন্দর্যহীনতার ছাপ দেখা যায় না। মহাভারতের পুথিটিও সম্পূর্ণটা একই হাতের লেখা; সুরুচি পূর্ণ সাজানো সুন্দর সোজা স্পষ্ট হাতের লেখা; যাতে লিপিকরের ধৈর্যশীলতার পরিচয় বিধৃত।

লেখার আকৃতির সঙ্গে কি দিয়ে লেখা হলো তাও দেখা প্রয়োজন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথি লেখার কালি সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন বলেছেন, "কালি হালকা, তাহাতে প্রাচীন পুথির কালির গাঢ়তা ও উজ্জ্বলতার আভাস মাত্র নেই।"[১৮] অন্যদিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর 'সারদাতিলক' পুথির কালি এত ঘন যে এখনও হাত বুলালে হাতে বাধে। এবং খুবই উজ্জ্বল। 'মহাভারত' পুথির কালিও বেশ গাঢ় উজ্জ্বল। তবে প্রাচীনত্বের জন্য মাত্র অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠা ছাড়া বাকি সবই প্রায় পাঠের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

শুধু কি লেখা হলো, কি দিয়ে লেখা হলো তা-ই নয় কিসের উপর লেখা হলো শতাব্দী বিচারে এটাও একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" পুথি লিখিত হয়েছে যে কাগজে সেই কাগজ সম্পর্কে ড. সুকুমার সেনের কথাই স্মরণ করা যাক "কাগজ পাতলা, মাড়ের তৈয়ার। ঠিক যেন মিলের কাগজ। এ রকম কাগজে লেখা পুথি বা দলিল অষ্টাদশ শতাব্দের আগে দেখি নাই, ঊনবিংশ শতাব্দে যথেষ্ট দেখিয়াছি।"[১৯]

এদিকে সন তারিখ বিশিষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দীর সারদতিলক পুথিটি গাছের বাকলে লেখা। পাতলা শক্ত গাছের বাকলগুলির দিকে তাকালেই তার প্রাচীন রূপটি চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠে। পাতা দুইদিক থেকে ভেঙ্গে গেছে। উপরে এবং শেষের কিছু পাতা প্রায় ভেঙ্গে গেছে। একটু বেশি নাড়াচাড়া করলে যে একেবারেই ভেঙ্গে যেতে পারে তা বোঝা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্য পুথি মহাভারতের কাগজ পুরু আঁশবিহীন। কাগজ এত পুরু যে ভাঁজ হয় না, ভেঙ্গে যায়। এমনকি খুব সতর্কতার সঙ্গে না ধরলে সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙ্গে যায়। আশে-পাশে ধরলেই ভাঙ্গতে থাকে। একটা পুরু কাগজ পুড়িয়ে রাখলে যে অবস্থা হয় তেমনি। পুথিটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে কাগজ ভাঙ্গা গুড়িতে হাত ভরে যায়। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দী যে আজকের কথা নয় তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য পুথিটির সমস্ত শরীরে। এই প্রসঙ্গে উপরে লিখিত কথার প্রমাণস্বরূপ তিনটি পুথির (একটি করে পৃষ্ঠার) ছবি দেওয়া হল।

শতাব্দীর প্রাচীনত্ব যত বেশি, কালির গাঢ়তা, কাগজের পুরুত্ব তত বেশি। এর বাস্তব প্রমাণ পঞ্চদশ শতাব্দীর উপর্যুক্ত দুটো পুথিতেই পাওয়া যাচ্ছে। এই বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির যে কালি তা পঞ্চদশ শতাব্দীর মত প্রাচীনত্ব দাবী করতে পারে না। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের পুথি সারদাতিলকের কালির যে গাঢ় উজ্জ্বলতা তা থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকের পুথি মহাভারতের কালির উজ্জ্বলতা অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। লেখার উপকরণের ভিন্নতায় যে এমনি হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। স্মরণযোগ্য যে সারদাতিলক পুথিটি গাছের বাকলে লেখা, কিন্তু মহাভারতের পুথিটি তুলট কাগজে লেখা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিটি যদি পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা হতো তা হলে অন্তত লেখার উপকরণগুণে তা এতদিনে ঝাপসা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বিশেষ করে পুথির কাগজের বেলায় একথার জোর বেড়ে যাবে আরও বেশি। কেননা পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকে কাগজ ক্রমান্বয়ে পাতলা হতে শুরু করেছে। সপ্তদশ শতকে কাগজ যে আকার ধারণ করেছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির কাগজেও আমরা সেই নমুনা পাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির কাগজের মত সপ্তদশ শতাব্দীর কাগজও আঁশমুক্ত ও মোটামুটি পাতলা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিটি অযত্নে বহুকাল গোয়াল ঘরে পড়ে ছিল। আর পঞ্চদশ শতাব্দীর তারিখওয়ালা পুথি দু'টি সযত্নে এ যাবৎ রক্ষিত হয়ে আসছে। এত সযত্নে রক্ষিত থাকা সত্ত্বেও প্রাচীনত্বের জন্য পুথি দু'টি বিশেষ করে 'মহাভারত' বলতে গেলে প্রায় পাঠের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এখানে প্রশ্ন জাগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি যদি পঞ্চদশ শতাব্দীর হয় তাহলে এত অযত্নে থেকেও তা সম্পূর্ণ পাঠের যোগ্য থাকে কেমন করে? এই পরিপ্রেক্ষিতেও বলা চলে যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিটি পঞ্চদশ শতাব্দীর মত প্রাচীনত্বের দিক থেকে একে বড় জোর সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত টেনে নেয়া যায়।

পর্যায়ক্রমিক আলোচনায় প্রথমে বর্ণের পারস্পরিক সাদৃশ্য বৈশাদৃশ্যে দেখা গেছে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির বর্ণের সঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীর পুথির সাদৃশ্যের থেকে বৈসাদৃশ্য বেশি। তিনটি পুথির একুশটি বর্ণের মধ্যে পরস্পর মিল আছে কিন্তু পঁচিশটি বর্ণেরই পারস্পরিক অমিল। এর মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথির বর্ণমালার কিছু কিছু বর্ণ

আকৃতিগত দিক থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে লিপীকৃত মহাভারত পুথির সংশ্লিষ্ট বর্ণসমূহের সঙ্গেই কেবল মেলে; কিন্তু সারদাতিলকের পুথির বর্ণের সঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীর পুথির অনেক বর্ণের ও রীতির মিল দেখে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর পুথির কিছু রীতির সঙ্গে এর মিল দেখে অনুমান করা যায়—"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" পুথি পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ের এবং সম্ভবত: সপ্তদশ শতাব্দীর অনুলিখিত হয়ে থাকবে। বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী তাই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকের পুথির কিছু বর্ণের সাদৃশ্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথিতে এসেছে এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর পুথির কিছু লিখন রীতি পরবর্তী ঊনবিংশ শতাব্দীতে চলে গেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম এবং শেষ দিকের উপর্যুক্ত পুথি দুটির বর্ণ, রীতি (ওঁহফণ) এবং আনুষঙ্গিক অপরাপর সকল কিছুর সঙ্গেই বলতে গেলে হুবহু মিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথি যদি পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনুলিখিত হত তাহলে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বালোচিত দুটো পুথির মধ্যে যেরূপ মিল আছে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের" পুথির সঙ্গেও কি তদ্রূপ মিল থাকা সম্ভব ছিল না?

কেবল বর্ণের তুলনামূলক আলোচনাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ না করে ও পুথির সামগ্রিক লিপি বৈশিষ্ট্য, কাগজ, কালি, লেখার ধরন এবং লিপিকলাকেও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথিটি কোন ক্রমেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনুলিখিত নয় বরং সার্বিক সাক্ষ্য—প্রমাণে এই পুথিটিকে সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুলিখিত বলেই গ্রহণ করা নিরাপদ।

তথ্যসূত্র

১. শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ. ১৪৮।
২. মোঃ আব্দুল কাইউম, পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা, চট্টগ্রাম, ১৩৭৭, পৃ. ১১৭।
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ. ১৪৮।
৬. শ্রীভূদেব চৌধুরী, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়), বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭, পৃ. ১৪৮।
৭. মোঃ আব্দুল কাইউম, পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা, চট্টগ্রাম, ১৩৭৭, পৃ. ১১৭।
৮. মোঃ আব্দুল কাইউম, পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা, চট্টগ্রাম, ১৩৭৭, পৃ. ১১৭।
৯. পুথি তিনটির প্রাপ্তিস্থান : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-বাকুড়া; সারদা তিলক—সিলেট; মহাভারত—বগুড়া।
১০. দ্রষ্টব্য : উর্টটফমথলণ মত´দণ ঈলঢঢদর্ধ্র ওটট্রপরর্ধ_টভল্রডরধর্থ্র ধভ´দণ লভধশণব্রর্ধহ ফধঠরটরহ, উটবঠরধঢথণ, উণডধফ (ঈণভলফফ)_.ই. উটবঠরধঢথণ, খভধশণব্রর্ধহ ব্রেগ্র, ১৮৮৩.
১১. মোঃ শাহজাহান মিয়া, বাংলা হরফ, 'অনুস্বার' : বিবর্তনের ধারায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৮১, পৃ. ৭৮।

১২. ঐ, পৃ. ৭৮-৭৯
১৩. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কলিকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ৩০।
১৪. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কলিকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ৩৮।
১৫. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কলিকাতা, ১২৭৮, পৃ. ২৫।
১৬. ঐ।
১৭. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৩৮।
১৮. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৩৮।
১৯. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৩৯।

পরিশিষ্ট

ক. নমুনা চিত্র

এখানে নমুনা হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ক কয়েকটি পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ প্রদত্ত হল :

সংস্কৃত

১. সারদাতিলক (তন্ত্র), লেখক—শ্রীলক্ষ্মণ দীক্ষিত, ঢা. বি. পা. সং—৪৬০৮, শকাব্দ ১৩৬১ (খ্রিস্টাব্দ ১৪৩৯)।
২. অনেকার্থকোষ (অভিধান), লেখক—মেদিনী, ঢা. বি. পা. সং—২৩৯৭, শকাব্দ ১৪২১ (খ্রিস্টাব্দ ১৪৯৯), পৃ. ৭১খ, ৭৫ক।
৩. শুদ্ধিদীপিকা (জ্যোতিষ), লেখক—শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য, রা, পা. সং—৩২৩১, পৃ. ৭৯। রা. পা. সং—৫৮১০, পৃ. ৩৯, ৫৯।
৪. শ্রুতবোধ (ছন্দশাস্ত্র) লেখক-মহাকবি কালিদাস, রা. পু. সং-১১৬, পৃ. ৫খ।
৫. " পৃ. ৬খ
৬. কৌতুক রত্নাকর (নাটক), লেখক-রঘুনাথ কবিতার্কিক, আই ও সং-১৪৪, পৃ. ২ (ক—খ)।

বাংলা

৭ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (কাব্য) লেখক-বড়ু চণ্ডীদাস, আ. চি. পৃ. ১৫ (খ)।
৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ঐ, পৃ. ১৫ (ক)।
৯. সতীময়না-লোর চন্দ্রানী, লেখক-আলাওল, খ্রিস্টাব্দ ১৬২২-৩৮, পৃ.
১০. সতীময়না-লোরচন্দ্রানী, ঐ, পৃ.
১১. মহাভারত, লেখক-কীবন্দ্র পরমেশ্বর, ডা. বি. পা. সং-২০২৫ শকাব্দ-১৬১০ (খ্রিস্টাব্দ-১৬৮৮), পৃ. ২১৮।
১২. পদাবলী রাধার সংবাদ, রা. পু. সং-১০১৩, পৃ. ১।
১৩. তালিবনামা, রা. পু. সং-১০৩১, পৃ. ১।
১৪. চন্দ্রাবলী, লেখক-দ্বিজপশুপতি, বা. এ. পু. সং-২৭৬, পৃ. ১।

সংস্কৃত

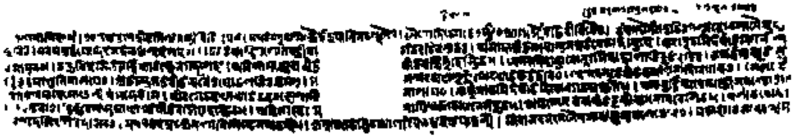

১. সারদাতিলক (তন্ত্র)

টং প্রণমামিরূপং! একলক্ষং জপেদ্বীজমিত্থং মন্ত্রী বিচিন্তয়ন্। অযুতং মধুরাসিক্তৈর্জুহুয়াত্তিলতণ্ডুলৈঃ। শৈরোদিতে যজেৎ প্রীতে প্রাগঙ্গৈঃ সম্ভিরীরিতৈঃ। বৃষাদ্যৈর্শ্মাতৃভিঃ পশ্চাল্লোক পালৈস্তদ্যযুধৈঃ। এবমভ্যর্চ্চয়েদ্দেবমর্দ্ধনারীশ্বরং পরম্। তেজঃ কান্তিযশোলক্ষী বাচাং ভবতি বল্লভঃ। প্রসাদাদ্যং জপেন্মন্ত্রমজুতং রোগ কুন্তেয়ে।

স্বরাবৃতমিদং বীজং বিগনন্তরমামৃতম্। চন্দ্রবিম্বস্তিতং মূর্দ্ধিধ্যাতং ক্ষ্বেগদাপহং প্রতিলোমাৎস্যরাবীতং বীজং বহ্নি গৃহেস্তিতম্। বেপ্যাদিব্যঞ্চনোল্লাসিষদ্ধোণাভিবৃতং বহিঃ। ভূতার্ত্তস্যস্মৃতং মূর্দ্ধিভূতমাশুবিনাশয়েৎ। বীজং চন্দ্রগতং বীতং স্বরৈঃ ষোড়শভিঃ ক্রমাৎ। গণন্তরস্বধাপূনং নেত্রেধ্যাতং রুজং হরেৎ। এবমেবস্মৃতং বীজং কুক্ষৌ শূলাদি রোগঘ্নৎ। স্ফোটে বিষজ্বরে দাহেমোহে শীর্ষগদে ভ্রমে। বীজমেতত্তথাধ্যাতং তত্তৎ ক্লেশান্বিনাশয়েৎ। কুঙ্কুমাভমিদং বীজং ত্রিকোণগত-মুদ্বর্জলম্। যস্য মূর্দ্ধি স্মরেন্মন্ত্রী সবশ্যোজায়েতেহচিরাৎ। উর্দ্ধরেফস্তসাধ্যাভ্যং বীজং বহ্নি গৃহস্তিতম্। বহ্নি গেহদ্বয়েনাগ্নি যুক্তকোণেন সংবৃতম্। প্রতিলোমস্বরাবীতং চূল্লীস্তানে নিবেশিতম্। বশীকরোত্যামরণাদচিরেণৈব দাসবৎ। মধরত্রয় যুক্তেনশালী পিষ্টেন পুত্তমীম্। কৃত্বা প্রতিষ্ঠিত প্রণাং বিভজ্য জুহুয়াদ্বশী। ত্রিবাসরমনেনৈবসাধ্যস্তস্যবশোভবেৎ। মকারগত সাধ্যাখ্যম॥

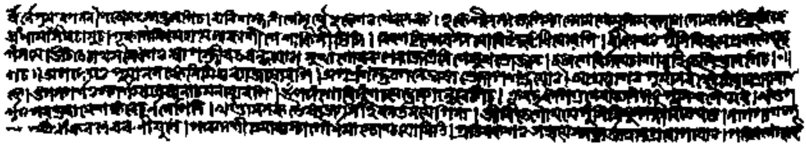

২. অনেকার্থ কোষ (অভিধান)

স্বর্নে পুমান পলনীপতৌমৎস্যাস্তরেপিচ। বালিশস্তুশিশৌমূর্খে ভূকেশঃ শৈবলে বটে। ভূকেশী বনরাজ পিস্যানেনাম শোমুনিমেষয়োঃ। নোমানিধস্ত্রিয়াং কাকজং নামাংসীবচাসূচ। শূকশিমিবমহামেদাকাশীশেশাকিনীর্ভিদি। বিবশস্ত্রিবস্যমোরিষ্ট-

দুষ্টধিয়োরপি। বীকাশঃ পুংসিবিজনেপ্রকাশৈন দৃশংসমে। উচিতে চাথসমেবশঃ স্বাপস্ত্রীরতবন্ধয়োঃ। সুখাশোবরুণেরাজ্ঞতিনিশেসুখভোজনে। হতাশে নির্দয়ে চাশারহিতে পিশুনেপিচ ॥ পচ ॥ অপদেশঃ পুমানলক্ষেনিমিত্ত ব্যাজয়োরপি। অপভ্রংশস্তুতপণে ভাষা ভেদাপশব্দয়োঃ। আশ্রয়াশঃ পুমান বহ্নৌ ত্রিষু চাশ্রয় নাশকে। উপসপর্শঃ স্পর্শমাত্রে স্নানাচমনয়োরপি। উপদংশো বিদংশে চ মেঢ্রে বেগান্তরেপিচ। ক্রূর দৃক্‌পিশুনে বাচ্য লিঙ্গঃ পুংসি শনৈশ্চরে। খণ্ডপর্শুঃ। পরশুরামেশঙ্করেচূর্ণলেপিনি। খণ্ডামনক ভৈষজ্যেসিংহিকাতনয়োপিনা। জীবিতেশোয়মেপুংসিত্রিষুস্যাজ্জীবিতেশ্বরে। নাগপাশঃ পুম্যানস্ত্রীণাং করণে বরুণাযুধে। পঞ্চদশীত্বমাবস্যা পৌর্ণমাস্যোশ্চয়োষিতি। প্রতিষ্কশঃ সহায়েস্যাদ্বার্ত্তাহ্যর প্ররোগয়োঃ। পরিবেশো বেষ্ট।

৩. শুদ্ধিদীপিকা (জ্যোতিষ)

পৌষে চৈত্রে মাঘৌ কার্ত্তিকে। ভিষক্‌গ্রাহি শিবেষু বিষ্ণু শয়নে কৃষ্ণে শশিন্যষ্টমে শ্রাদ্ধং ভোজনকং নবান্নবিহিতং পুত্রার্থনাশপ্রদং ॥ বৃষ মিথুন কন্যায়াং মীনলগ্নে শুভান্বিতে। ডক্ষনং স্যান্নবান্নস্য দদ্যাদর্থ ধনং বলং ॥ বরাহঃ ॥ যস্মিন্‌ বারে সহস্রাং সূর্য্যঃ শূর্যাৎ কালং মিথুনং ব্রজেৎ। অম্বুবাচি ভবেৎ তত্র পুনসৎ কালবারায়াঃ মৃগশিরসি নিবৃত্তে রৌদ্রপাদেহম্বুবাচী ঋতুমতী ভবেৎ পৃথ্বীব।

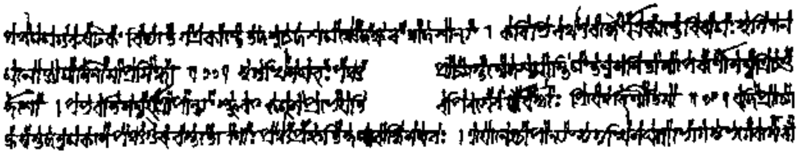

৪. শ্রুতবোধ

প্রথমমগুরুষট্কং বিদ্যতে যত্র কান্তে। তদনুচ দশমঞ্চেদক্ষবং দ্বাদশান্ত্যং ॥ গিবিভিবথ তুবঙ্গৈর্যত্র বালে বিবাম। সুবিজনমনোজ্ঞা মালিনী সা প্রসিদ্ধা ॥৩৩ ॥ সুমুখি লঘভঃ পঞ্চ প্রাচ্যাস্ততোদশমান্তিমং। তনু ললিতালাপে বর্ণৌ লঘৃত্রিচতুর্দ্দশৌ । প্রভবতি লঘুর্যত্রোপান্ত্যং স্ফুবৎ কমল প্রভে। যতিবপি বসৈরুর্দ্রৈযস্যাঃ প্রিযেহবিণীতি সা ॥৩৪ ॥ যদি প্রাচ্যোম্বস্তদনুমকলে পঞ্চ গুরুব। স্ততো বর্ণাঃ প্রঞ্চ প্রকৃতি কুমাবাঙ্গি লঘবঃ ॥ ত্রযোন্যৌ চোপান্ত্যং সুমুখি লঘবো ভোগ সুভগে। রসৈ বী ... ॥

৫. শ্রুতবোধ

শৈর্মুনিভিশ্চ যত্র বিরতিঃ পূর্ণেন্দু বিম্বাননে। তদ্বৃত্তং প্রবদন্তি কাব্যরসিকাঃ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং ॥৩৮ ॥ চত্বারো যত্র বর্ণাঃ প্রথমলঘবঃ ষষ্ঠক : সপ্তমোঽপি। দ্বৌ তদ্বৎ ষোড়শাদ্যৌ মৃগমদতিলকে ষোড়শান্ত্যৌ তথান্ত্যৌ ॥ রম্ভাস্তম্ভোরু কান্তে মুনি মুনি মুনিভির্দৃশ্যতে চেদ্বিরামো। বালেবর্ণেঃ কবীন্দ্রৈঃ সুতনু সগদিতে স্রগ্ধরা সা প্রসিদ্ধা ॥৩৯ ॥ অগুরু চতুষ্ক ভবত্রিগুরুদ্বৌ। ঘনকুচযুগ্মে শশিবদনা সৌ ॥৪০ ॥ আদ্য চতুর্থং পঞ্চম কণ্ঠেৎ। যত্রগুরুস্যাৎ স্বাক্ষর পংক্তিঃ ॥৪১ ॥

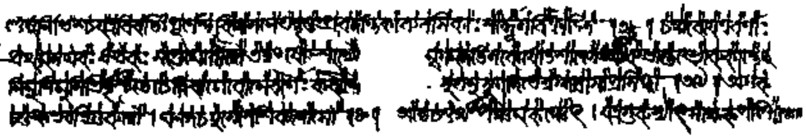

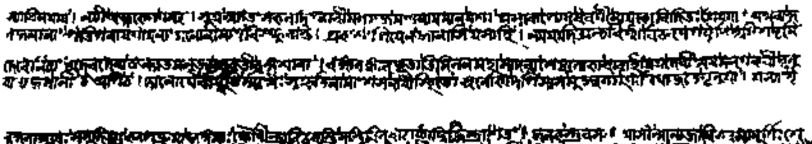

৬. কৌতুকরত্নাকর

স্যাভিনয়ায়।

নটী অজ্জ কেন নম্যা।

সূত্র-স্বগতং সকল দিঙনাবী মলয়জ মণ্ডনায়মান যশঃ প্রসবোপ্যেষ ধরণী নায়কো বিদিতঃ প্রিয়য়া। অথবা কুলজনানাং পতিপরায়ণায়নাং মনো নান্যত্র বিস্ফুরন্তি। প্রকাশং প্রিয়েন জানাসি যস্যাহি। ন্যায়াদি গ্রন্থবিথী বিচরণ পটুভির্ভূষিতা ভূমি দেবৈর্নিত্যং

ভূদেবদেবার্চ্চনরতমনুজা ভারতী রঙ্গশালা। বঙ্গালঙ্কাব ভূতাতিথি মিলন মহাসাদরাশেষলোকা বারাহী যত্র দেবী স্বয়মরণকরী ভূলুয়া বাজধানী ॥

অপিচ ॥ দা নোঘৈর্বহুভির্ম্মখেঃ সুকৃতিনামাং শসনীয়াস্থিতে : স্বর্লোকাদপি সা সমুজ্জ্বলগুণা বিভ্রাজতে ভূলুয়া। যস্যা সূর কুলাম্বুধেঃ সমুদিতাঃ কল্পদ্রুমা জঙ্গমা। ক্ষৌণীন্দ্রাঃ বিচরন্তি সন্তি বিবুধাচার্য্যা দ্বিজেন্দ্রা শতং ॥ জনকস্তু বস্য ॥ আসীন্মনোজাধিকরম্যমূর্ত্তিঃ। শ্বেতাতপত্রীকৃত চারুকীর্ত্তিঃ ॥ শূরান্বয়াম্ভোনিধি পূর্নচন্দ্রো। গন্ধর্বমাণিক্য মহীমহেন্দ্রঃ ॥ অপিচ। আভূমণ্ডলমাসুরেন্দ্র সদনাদাসপ্ত পাতালকা ॥ দাসপ্তার্ণবমাধবাধবকুলাদাপদ্মপদ্মালয়াৎ। আবৈকুণ্ঠমজৃম্ভি যস্য সমর প্রস্থানলীলাবিধৌ ॥ ভেরীভাং কৃতি কুম্ভিচীৎ কৃতি ধনুষ্টংকারবাজি স্বনৈঃ। অপিচ ॥ গজেন্দ্র জীমূতমদাম্বুবৃষ্টিভির্ম্মহিপাতের্যস্য পুরস্যসন্নিধৌ ॥ নিতান্ত দূরেপি বিপক্ষ ভূভুজাং। প্রতাপবহ্নিঃ প্রসমং সমাগতঃ ॥

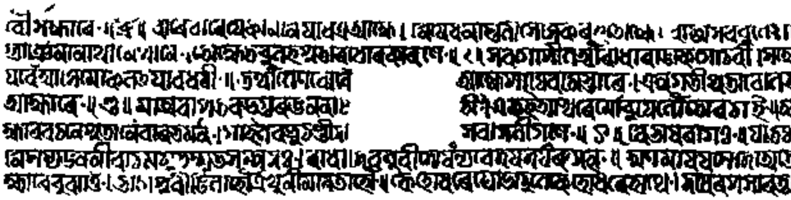

৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বোঁ সম্ভারে ॥ ধ্রু ॥ বারেঁ বারেঁ যে কাম নিষধিএ আহ্মে। নিষেধ না শুনী সেসি করহ তোহ্মে ॥ বাছা সব বুলে কাহাঞিঁনানা থানে থানে। তোহ্মেত বুলহ পুতা রাধার কারণে ॥২ ॥ সব গোপী লআঁ রাধা রাজাক গোচরী। সঙ্গে যবেঁ আসি মোক লই যাব ধরী ॥ তথাঁ কোন বোলেঁ আহ্মে পায়িব নিস্তারে। এ যুগতী পুতা বোলহ আহ্মারে ॥৩ ॥ মাঅ বাপত বড় গুরুজন নাহীঁ। একই আখরে মো বুয়িলোঁ তোর ঠাঁই ॥ আহ্মার বচনে পুতা নেবারত মনে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥৪ ॥ বিভাষরাগঃ। যতিঃ ॥ নিশম্য জননীবাচমচ্যুতশ্চ্যুতসম্পদঃ। রাধাদিবল্লবীদোষং ন্যবেদয়দয়ং রুদন্ ॥ সুন মায় যশোদাঅ তোহ্মারে বুঝাওঁ। ভাগে পুনী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ ॥ কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে। দধির পসার তুলিআঁ দেঁতি মাথে ॥

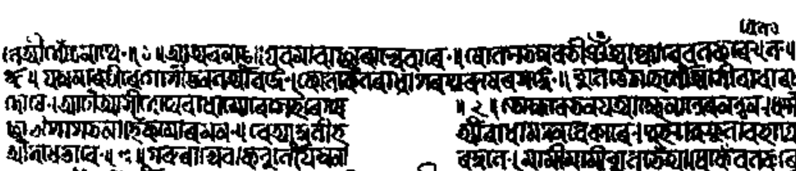

৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

লিআঁ দেতিঁ মাথে ॥১ ॥ আজর না জায়িব মা বাছা রাখিবারে। ষোলশত যুবতীএঁ আহ্মারে বল করে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥ যমুনার তীরে গোপীজন লআ রঙ্গে। কেলি কৈল রাধা পর পুরুষের সঙ্গে ॥ বুলির্তে চাহিলোঁ আসি রাধার দোষে। আগেঁ আসী দোষে রাধা মোরে সেই রোষে ॥২ ॥ তোহ্মার তনয় আহ্মে নান্দের নন্দন। ধর্ম্ম ছাড়ী পাপত নাহিঁক মোর

মন ॥ বেআকুলী হআঁ রাধা মনদবিকারে। দুই কান্ধ ফুলা বহায়িআঁ দধিভারে ॥৩ ॥ গরু রাখিবাক বুলোঁ যমুনার কুলে। মামী মামী বুলিতেঁ আধিকেঁ বল কবে ॥ স্বরূপে কহিলো মা তোহ্মার পাত্র। বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥৪ ॥ দেশ বরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ হেনয়ি সম্ভেদে বুঢ়ী মেলিলা আসিআঁ। বাধা লআঁ গেলী ঘর প্রবোধ করিআঁ। তরাসিনী হআ বুইল আইহনে ... ॥

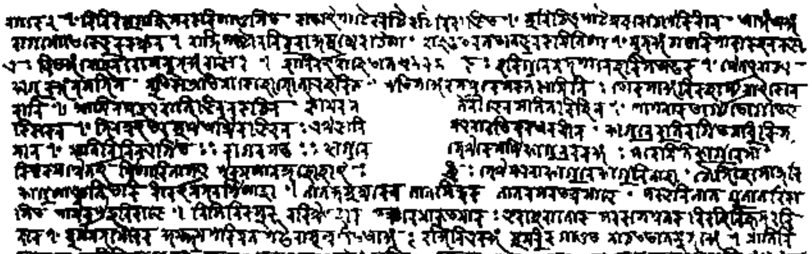

৯. সতী-ময়না-লোর-চন্দ্রানী

নগরে২ ॥ বিবিধ সুগন্ধি সব করিআ ভূসিত। কাস্তাই পাটের ধটি কটি বিরাজিত ॥ সুবিচিত্র পাটম্বর কোঠা পরিধান। অঙ্গে অঙ্গ রাগ সোভে কেজুর কঙ্কন ॥ বান্দিআ পাটান১লি চূড়া কুসুম্বে রচিআ। বাহস্ত তবল তাল জুবক মিলিআ ॥ মৃদঙ্গ চাতুরি পারা কহন ন জাএ। ত্রিভঙ্গ মোহন বেসে মৃদঙ্গ বাজাএ ॥ হানি লই বাহে তাল ভ্রমর মন্দন। হরিগুণে মদ পানে হরিস অন্তর ॥ খেলএ নাচএ ফাগ রঙ্গ দসদিস। মৃত্তিকা প্রতিমা কেহো দোলাএ হরিণ ॥ পতিসঙ্গে রসপুরে সকল কামিনি। তোব সঙ্গে বিরহার্স্য নাই কেনে রানি ॥ স্বামি ন পুছএ বাণি জিবন কঠিন। ঝামর নলিনী জেন সলিল বিহিন ॥ আপনার ভাগ্যফল তেজ কি কারণ। দিন দুই তবসুখ অথিব জীবন। এথ জানি মএনাবতি কর অবধান ॥ ফাগুনে বুলিব গিত মাধুরি সমান। মালিনি বিনএ গিত ॥

রাগবসন্ত ॥ ফাগুনে দেখরে সখি ফাগু নব রঙ্গ। সবে মিলি ফাগু বেলাই ॥ রিতু রস খেলই পিআ বিলাসএ। পরম আনন্দ দোহাই ॥

ধ্রু

দেখ মএনা ফাগুনে ফাগু বিলসা। চৌদিসে সোন্দরি ফাগু আঞ্জলি ভরি। ধাবই মদন পিআসা। লাল কুসুম্ব রেণু লাল সিন্দুর ॥ লাল বসন তনু সাজে। সব জানি লাল গুলাল বিকাসিত ॥ পাথর পন্থ বিরাজে। নিসি নিরসুর বরিখ তুসার ॥ সঞ্চরে মারুত মার। জরা যুবা লোকসব রসে পুলক ॥ বিরহিনি হৃদএ বিদার। মৃগমদ সৌরব কুঙ্কুম পরিমল ॥ পট্টবাস লুলিত অঙ্গে। রঙ্গিনিএ রঙ্গ মুমধুর গাওত ॥ নাচত ভাল মৃদঙ্গে। মালিনি ভোলাঅএ কামিনি দোলাঅএ ॥ সতহো সকল গুনমৌলি। কাজি দৌলতে ভন লস্কর আসরফ। রভসে দোসর বনমালি ॥

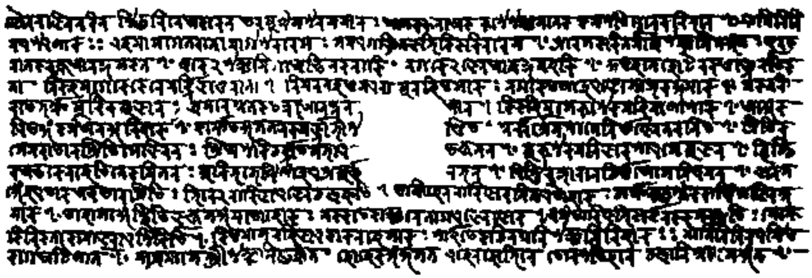

১০. সতী-ময়না-লোর-চন্দ্রানী

জৌবন জিবন ধন পিউ বিনে অকারণ। ভব সুখ সপন সমান ॥ আসরফ নাঅক রূপে পঞ্চ সালক। রসপতি গুণের নিদান ॥ মালিনি বিনএ পএআর। এই মাস গেল বালা মাগ

পরবেস ॥ সমএ গঞ্জিল জদি কি করিব বেস। প্রবেশ করিল মাঘ পঞ্চমি মঙ্গল ॥ জুবক বালক বৃদ্ধ আনন্দ সকল। ঘরে২ পঞ্চমি গাঅন্তি নরনারি ॥ নগরে২জেন আনন্দ লহরি। কুতুহলে ছোট বর ভুঞ্জে রতি কলা ॥ বিরহ সাগরে কেনে মৰ্জ্জি জাও বালা। বিমন ন হওমএনা মৃণ হিত সার ॥ নগরেত আছএ জে সোন্দর কুমার। সকল ধারাত দৰ্ক্ষ মুধির যুজান ॥ দ্রসনে পুলত তন আনন্দ নআন। কি কহিমু সেরূপের মহিমা আপার ॥ অঙ্গের ত্রিভঙ্গ কথ অনঙ্গ বিহার। কৰ্ম্মেত কুসল সুর মৰ্জ্জাদা পণ্ডিত ॥ পুৰ্ব্ব প্রেম পানে নিৰ্ত্ত্য জেন নবনিত। প্রিতিরসে মরা তোর প্রিতি সে জিবন ॥ প্রিঅ পরিচৰ্জ্জাত সদাএ ভক্তমন। মুরূপ রমনি জার পাএ সে যুজন ॥ দৃষ্টির অন্তরে নহে তিলেক মিলন। মুরিদ দেখিআ হএ প্রষুগ্ন বদন ॥ ত্রিপ্তি বৃন্দাবনে চির্ত্ত তোসে মিত্রমন। জার সঙ্গে হএ তার অনুভাব প্রিতি ॥ দিনে ২ বারি জাএ জেন চক্রকৃতি। তুহ্মি হেন নারি জবে মিলএ তাহার ॥ চৰ্ক্কের উপরে রাখি খুজিব কুমার। তাহা সঙ্গে স্থিতি জুক্ত সঙ্গম তোহোর ॥ মকরতে কাঞ্চনে লাগএ জেন জোর। এথ ভাবি জদি কাৰ্জ্জ ন কর সম্প্রতি ॥ সেসে কি বিকলা রামা জুরাএ পিরিতি। রিতুমাস বহি জাএ কার নহে সার ॥ পাইতে কঠিন পুনি পঞ্চমি বিহার। মালিনি বিনএ গিত রাগ ভাটিআল ॥ মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমি উঝল। দোহে রঙ্গ কুসলএহেন দোদিনে ॥ তোর পতি ছলে চন্দ্রানি পুজে মঙ্গল।

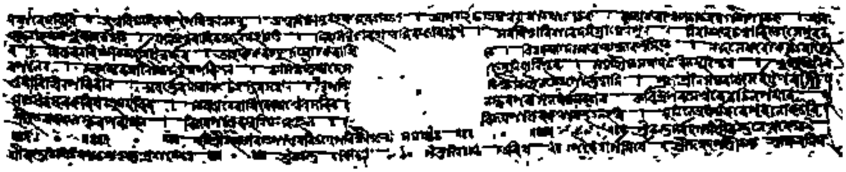

১১. মহাভারত

যথা বেদ বিধি। অশ্ব বিদ্যা বিচক্ষণ পরিক্ষা মহত্ত ॥ অশ্বদিক্ষা সুনগ যজ্ঞের জত তত্ত্ব। আপনা ইচ্ছাএ অশ্ব যথা তথা জাউক ॥ কে তাক রাখীব তাত অশ্বগতী পাউক। আর হতে না হএ অশ্বক অনুমতি ॥ যজ্ঞ অশ্ব রাখিব অৰ্জ্জুন মহামতি। দিব্য ধনু জার হাতে দিব্য জারগুণ ॥ সর্ববিদ্যা বিশারদ সংগ্রামে নিপুণ। নিরাত কবচ মারিতো সে পুরন্দর ॥ ত্রিভুবন বিখ্যাত অৰ্জ্জুন ধনুৰ্দ্ধর। তাহ্যক করহ যুক্ত ঘোটক রাখিতে ॥ ভিমক আদেশ কর তোমাকে তুসিতে। নকুলে করৌক ধৃতরাষ্ট্রের পালন ॥ সহদেবে আনৌক কুটুম পরিজন। ব্যাস কৃষ্ণ আদেস জে সুনিয়া নিশ্চয় ॥ সমাহীতে সম্বাদ করিল সুনিশ্চয়। কৃষ্ণা জিনি গণ্ডধারি খিন পরিধান ॥ সুবর্ণ্ণের মালা কণ্ঠে অগ্নির সমান নৃপতি দিক্ষীত হৈল চৈত পৌর্ণ্ণমাসি। প্রজাপ্রাণ সমরাজা সর্বগুণবাসী ॥ হাতে ধনু যয় করি ধনঞ্জয় বির। সাবধানে রাখিবেক অশ্বের সরির ॥ লস্কর পরাগল ধৰ্ম্ম অবতার। কবিন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার ॥ শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল। বিজয় পাণ্ডব সুনি মন কুতুহল ॥ বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি। সুনিলে অধৰ্ম্ম হরে পরলোকে তরি ॥ ইতিশ্রীমহাভারতে পাণ্ডব বিজয়ে পরিক্ষীত জন্মঃ সমাপ্তঃ। শ্রীরস্তু সর্বয় গতাং শ্রীরস্তুলেখকেময়ি শ্রীরস্তুলিকিতং যস্যাতস্য কৃষ্ণঃ প্রশদেতঃ ॥ শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৬১০ পংতুসংনে ৪৮৬ তেরিখ ২৪ পৌষ মার্গ সির্ষে। শ্রীকুমুদপণ্ডীতস্য স্বাক্ষরমিদং ॥

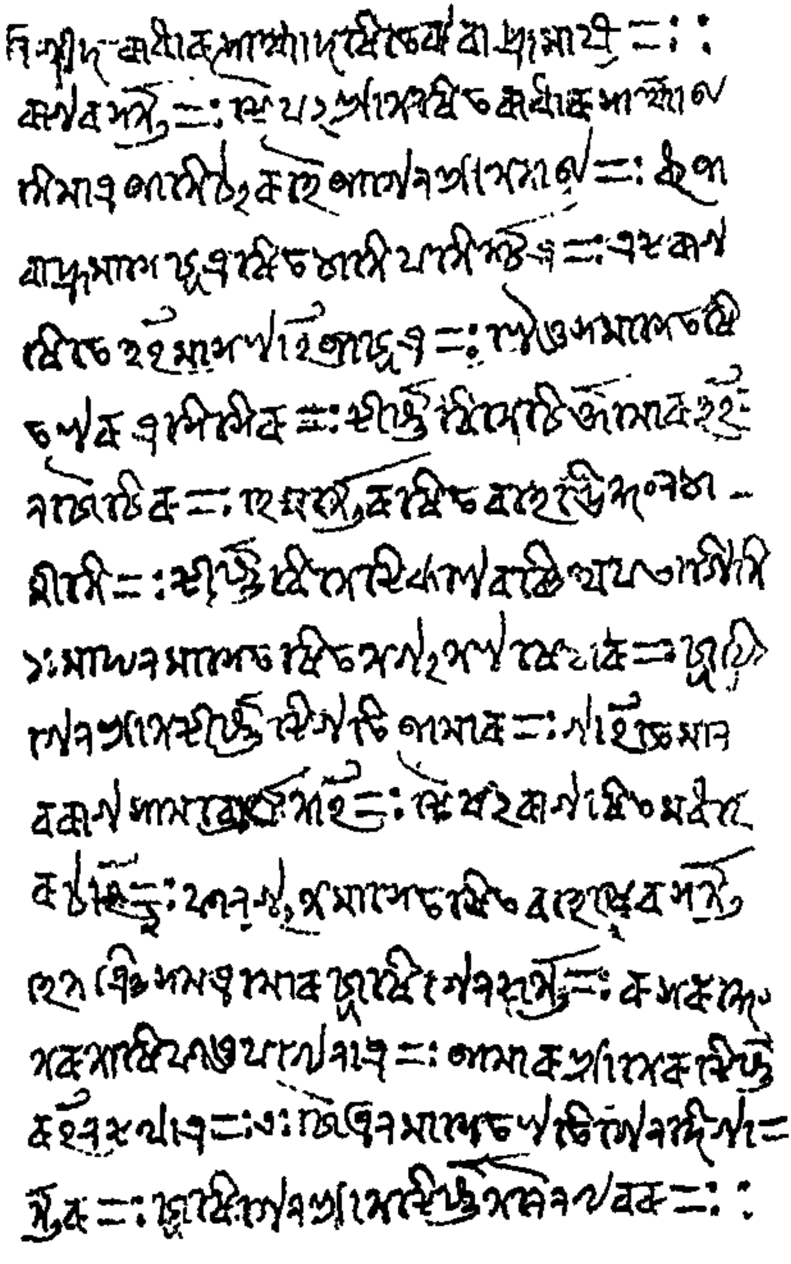

১২. পদাবলী-রাধার সংবাদ

গীদ রাধার সম্বাদ রীতের বাঢ়মাস। রাগ বসন্ত ॥ কৈয়২ প্রাণ রিত বাধার সাক্ষাত। নিমাএ আসিছ রহৈ আগেন প্রাণনাথ ॥ ধুআ ॥ বাঢ়মাসে ছএরিত জানিয় নির্শ্চত্র। একরাগ রিতে দুই মাস পাইআছএ ॥ পৌউস মাসেত বিত পরএ সিসির। কীর্ষ্ণ বিনে চিত্ত মোর হইল চৌচির ॥ হেমর্ন্তের রিত বহে ডিগুণ জামীনি। কীর্ষ্ণ বিনে কি রূপে বঞ্চিমু য়ভাগিনি ॥ ১ঃ মাঘন মাসেত রিত নগুন পরে জার। ছাড়ি গেল প্রাণ কীর্ষ্ণ কি গতি আমার ॥ গাইতে মাল্লব রাগ সাম ব্রের্ণ্ন নাই ॥ কৈয়২ রাগ রিত মধবের ঠাই ॥ ২ঃ ফালগুন মাসেত রিত বহেরে বসর্ন্ত। হেনত্রি সমএ মোর ছাড়ি গেল কার্ন্ত ॥ রস রঙ্গে নরনারি ফাউয় খেলাএ। আমার প্রাণের কিষ্ণ রইল কথাএ ॥ ৩ঃ চৈত্রেন মাসেত পতি গেল দিগার্ন্তর। ছাড়ি গেল প্রাণ কির্ষ্ণ ন জান খবর ॥

১৩. তালিবনামা

বিচমির্ল্লাহে ঢ়হেমানে ঢ়হিম ॥ প্রথমে প্রণাম করি প্রভুকরতার। ছায়া নাহি কাএয়া নাহি সুর্ন্যের মাঝার। হস্ত নাহি পর্দ্ধ ন্যাহি নাহি তান সির। নিমরেক নাহি রাখে নিলর্ক্ষ সরির ॥ চারি চিজের উপরে চিজ ইস্ক নিরঞ্জন। বুজিতে না পারে কেহ তাহান করন। জনম ন্যাহিত তান নাহিক মরণ। আখেরে তাহান পুর্ন্নে হইব তেরন। আজ্রাইল ইস্রাফিল

মিকাইল জিব্রিল। নিজনাম জানে তানা ফিরিস্তা ফাজিল ॥ তা সভান প্রণাম করম কাএ মনে। ত্রিসকোটী পিরিস্থা বন্দম জনে জনে ॥

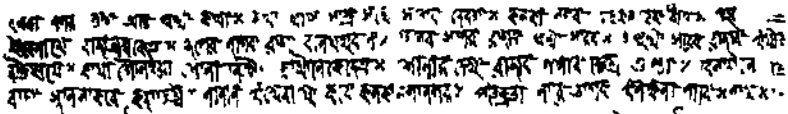

১৪. চন্দ্রাবলী

কনকা নগর দুখ আর পুণ্য কথা। জথা আসি সাস্ত্র সিখে সর্গের দেবতা ॥ কনকা নগর এহি কনকের ধাতু। তাহাতে ঈশ্বর নামে রাজা অম্বকেতু ॥ রূপের নাগর বাজা বলে মহাবলি। গুণের সাগর রাজাএ পুণ্য সরির ॥ পুণ্য সরির রাজার সূর্য্য বর্ণ্নকায়ে। কায় তৌলিইয়া শোনা নিত্ত ব্রাহ্মণকে দেএ ॥ শোনার দেহা রাজার গঙ্গার চিত্য তুল্য। বিনাদানে রাজা স্নান না করে কদাচিত্য ॥ নানান সুখে রার্য্যে করে কনকা নগা নগর। পতিব্রতা নারি তাহার সুলক্ষণা নারি ॥ নাম ॥ স্বামিক সেবয়ে কন্যা অতি প্রয়য়ে করি। তিলমাত্র দ্রব্য নাখায় স্বামি পরিহরি ॥ বক্তিসাল্য সুলকর্ন্যা সরিরেতে চিন্যা। স্তুতিয়ে ভক্তিয়ে সামি সেবে রাত্রিদিন। একদিন দণ্ড স্যামি বিনা অন্য নাহি গতি। পরম সুন্দোরি কন্যা প্রথম সুরতি ॥ নএান তুলিয়া কন্যা চাহে জার ভিতে। সেহি দণ্ডে কাম কুণ্ডে ডুবে তার ভিতর চিত ॥ ডুবিয়া সাগরে জেন নাহি পায় কুল। প্রাণ লইয়া তাহার বড়ই আউল ॥ কাঞ্চন দর্পন কর্ন্যার যে মুখ মণ্ডল। বজতেব নএানি তাথে করে ঝলমল ॥

টীকা

বাংলা লিপি

বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি। কুটিল লিপি থেকে এর উৎপত্তি। কুটিল লিপি আবার ব্রাহ্মীলিপির একটি বিবর্তিত রূপ। ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি সুদূর প্রাচীনকালে হলেও খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেকার ব্রাহ্মীলিপির কোন নিদর্শন আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এ লিপির প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় পিপ্রাবা ও বলী নামক দুটি লেখাতে, যা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে উৎকীর্ণ। এই লিপি ৩৫০-১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত অশোকলিপি বা মৌর্যলিপি নামে পরিচিত ছিল এবং এ সময়েই ব্রাহ্মীলিপির প্রথম বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অশোক বা মৌর্যলিপিকে দুই স্তরে ভাগ করা হয়—প্রাচীন ও অর্বাচীন। প্রাচীন মৌর্যলিপি আবার উত্তরী ও দক্ষিণীভেদে দুই ভাগে এবং অর্বাচীন সাত ভাগে বিভক্ত।

ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তর কুষাণলিপি। কুষাণ রাজবংশের নামানুসারে এর নামকরণ হয় কুষাণলিপি। খ্রিস্টীয় ১০০-৩০০ অব্দ পর্যন্ত এ লিপির প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তনের তৃতীয় স্তর গুপ্তলিপি। গুপ্ত রাজবংশের নামানুসারে এর এরূপ নামকরণ করা হয়। খ্রিস্টীয় ৪র্থ থেকে ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত এ লিপি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এ সময়ে গুপ্তলিপির কোন কোন বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা বর্ণের আকার ধারণ করে। যেমন মহারাজা জয়নাথের দানপত্রে ই এবং গ বর্ণদুটি বর্তমান বাংলা বর্ণের মত।

ব্রাহ্মীলিপির বিবর্তনের ইতিহাসে এর পরবর্তী স্তর কুটিল লিপি। কোন রাজবংশের প্রভাব ছাড়াই এ লিপি ষষ্ঠ থেকে নবম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এ লিপির অক্ষর ও স্বরের মাত্রা অনেকটা কুটিলাকৃতির বলেই সম্ভবত এর নাম হয়েছে কুটিল লিপি। ভারতবর্ষের প্রায় সকল আধুনিক লিপির উৎস এই কুটিল লিপি। কুটিল লিপির প্রধানত দুটি রূপ—উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়। উত্তর ভারতীয় কুটিল লিপির পশ্চিমাঞ্চলীয় রূপ থেকে দেবনাগরী এবং পূর্বাঞ্চলীয় রূপ থেকে অর্থাৎ মগধ অঞ্চলের কুটিল লিপি থেকে বাংলা লিপির উৎপত্তি। ষষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ থেকেই এই পূর্বাঞ্চলীয় কুটিল লিপির বিবর্তন শুরু হয় এবং এর অধিকাংশ অক্ষর আধুনিক বাংলা লিপির

আকারে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরিত বর্ণমালার প্রথম ব্যবহার দেখা যায় দশম শতকে বিনায়ক পালের তাম্রফলকে। এভাবে তা গুর্জর শাসনামলে তদানীন্তন বাংলাদেশে প্রবেশ লাভ করে। পরবর্তীকালে এই বর্ণমালা স্বাধীনভাবে বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে দশম শতকের শেষভাগে মূল বাংলা বর্ণমালায় পরিণত হয়। এই বর্ণমালার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় কম্বোজের রাজা নয়পালদেবের ইর্দার দানপত্রে এবং প্রথম মহীপালের বাণগড় দানপত্রে। বাণগড় দানপত্রে আধুনিক বাংলা বর্ণমালার পরিপূর্ণ আকারের অ, উ, ক, খ, গ, চ, ঢ, ব, হ ও জ্ঞ বর্ণ দেখতে পাওয়া যায়।

একাদশ শতকের শেষভাগে কিংবা দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে বিজয়সেনের দেবপাড়ার খোদিত লিপিতে এই মূল বাংলা বর্ণমালার আরও উন্নত রূপ লক্ষ্য করা যায়। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে এই বর্ণমালা আরও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রায় বর্তমান বর্ণমালার আকার ধারণ করে। এ সময়কার বাংলা বর্ণমালার নিদর্শন পাওয়া যায় লক্ষণসেনের আনুলিয়ার দানলিপি, ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দের সুন্দরবনের দানলিপি ইত্যাদিতে। এরপর পূর্বভারতে মুসলমান বিজয়ের ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা কিছুকাল (খ্রি ১৩শ-১৪শ শতক) বন্ধ থাকে। ফলে বাংলা লিপির ব্যবহার ও এর বিবর্তনও বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চদশ শতকের স্বাধীন সুলতানদের অনুপ্রেরণায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা পুনরায় শুরু হয়। এ সময় চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে ছয় গোস্বামী, চৌষট্টি মোহন্ত ও অন্যান্য বৈষ্ণবদের অনেকেই বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অসংখ্য পুস্তক রচনা করেন। এ সময় বাংলা লিপির আকৃতিগত তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে বাংলা লিপির পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

খ্রিস্টীয় ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বাংলা লিপির কোন কোন বর্ণের সামান্য পরিবর্তন হলেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উইলকিনস তৎকালে প্রচলিত প্রাচীন পুথির বাংলা অক্ষরের আদলে বাংলা হরফ তৈরি করে হুগলিতে প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছরই এই মুদ্রণযন্ত্র থেকে হ্যালহেডের ই ঐৱটববটৱ মর্ত দণ ঈণভথটফধ টিভথলটথণ নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এতে বাংলা অংশের মুদ্রণে উইলকিনস নির্মিত বাংলা হরফ ব্যবহার করা হয়। এরপর উনিশ শতকে প্রায় সর্বত্র মুদ্রণ পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে যায়। এর ফলে হস্তলিখিত পুথির ব্যবহার হ্রাস পায় এবং বাংলা লিপির বিবর্তনও যায় বন্ধ হয়ে, কারণ পুথিগুলো হাতে লেখা হত বলে ব্যক্তিভেদে হস্তাক্ষরেরও পরিবর্তন ঘটত। তাই মুদ্রণযন্ত্রে বাংলা গ্রন্থ মুদ্রণ প্রচলিত হওয়ায় বাংলা অক্ষর ব্যক্তিপ্রভাব মুক্ত হয়। ফলে বাংলা লিপি একটি স্থায়ী রূপ লাভ করে। বর্তমানে প্রযুক্তিগত কারণে বাংলা লিপি বিভিন্ন প্রকার শৈল্পিক রূপ লাভ করলেও তার প্রকৃত রূপটি অপরিবর্তিতই রয়েছে।

বাংলা লিপির বর্ণ দুই প্রকার—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ। অ, আ, ই, ইত্যাদি এগারোটি স্বরবর্ণ এবং ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি উনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ। মোট বর্ণ ৫০টি। স্বরবর্ণগুলো স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হতে পারে, কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হতে পারে না।

টীকা

ব্যাখ্যাগ্রন্থ। টীক্যতে গম্যতে বুধ্যতে বানয়া টীক ঘ এঞর্থে ক-টাপ্ চ। অর্থাৎ যার দ্বারা মূলবচনের অর্থ বোধগম্য হয়, গ্রন্থের অর্থ বিশদ করবার নিমিত্ত আদ্যন্ত ব্যাখ্যাকৃত হয় তাকে টীকা বলে। এরূপ গ্রন্থকে বলা হয় টীকাগ্রন্থ। আর মূলবচন বা অংশসমূহ যারা ব্যাখ্যা করেন তাদের বলা হয় টীকাকার বা ভাষ্যকার। সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থই পরবর্তীতে টীকাকৃত হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিতে টীকা লিখনের নির্দিষ্ট কতগুলি নিয়ম ছিল। যেমন—

১. টীকা লিখিত হত গদ্যাকারে ছোট ছোট অক্ষরে।
২. টীকা লিখিত হত একাদিক্রমে। বিরামচিহ্নের ব্যবহার ছিল সুদূরপ্রসারী। বিশেষ করে ন্যায়শাস্ত্রের টীকাগ্রন্থ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখিত হত বিরাম চিহ্ন ব্যতীত।
৩. টীকা লিখিত হত প্রতি পৃষ্ঠার মূল অংশের উপরে ও নীচের শূন্যস্থানে। কখনও কখনও উত্তর ও দক্ষিণ পাশের শূন্যস্থানেও টীকা লিখিত হত।
৪. কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথমে একটু বড় অক্ষরে মূল অংশ লিখে তার পরপরই ছোট ছোট অক্ষরে তার টীকা লিখিত হত।
৫. টীকা একটি শব্দের একটি ছত্রের একটি শ্লোকের এবং একটি গ্রন্থের উপর ভিত্তি করেও লিখিত হত।

উদাহরণ—

মূলশ্লোক—

আরাধিতোপিহ্যাভাসে যথাবস্তুতয়াস্মৃতঃঃ
দুর্ঘটত্বাদৈন্দ্রিয় কংতত্ত্বদর্থ বিকল্পিতং ॥৪৬

টীকা-ননুতর্হিকথং পৃথদর্থস্তস্যাপিপ্রতীয়তে তত্রাহ অবোধিতঃ তর্কবিবোধে সর্ব্বতো বাধিতোপি আভাসঃ প্রতিবিম্বাদিবস্তুতয়া যথাস্মৃতঃ। তদ্বৈন্দ্রিয়কং সর্ব্বমর্থত্বেন বিকল্পিতং নতু পরমার্থতঃ দুর্ঘটত্বাৎ ॥৪৬ ॥

পুথি

হস্তলিখিত গ্রন্থ। প্রাচীনকালে যখন মুদ্রণযন্ত্র ছিল না তখন সবকিছুই হাতে লেখা হত। কোন গ্রন্থ রচিত হওয়ার পরে লিপিকররা তার অনুলিপি করত। গুরুত্ব এবং চাহিদার ওপর নির্ভর করত অনুলিপির সংখ্যা। পুথিকে বর্তমানে 'পাণ্ডুলিপি'-ও বলা হয়। যে উপাদানে পুথি লেখা হত তার বর্ণ পাণ্ডু বা ধুসর। তাই হয়তো এর নাম হয়েছে পাণ্ডুলিপি। এখন অবশ্য মুদ্রণের পূর্বে যে-কোন রচনার খসড়াকেই পাণ্ডুলিপি বলে। কাগজ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে এই পুথি লেখার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হত চামড়া, ভূর্জপত্র, তেরেটপত্র, গাছের বাকল, কলাপাতা, তালপাতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান। এগুলোকে জলে ভিজিয়ে, সেদ্ধ করে, রোদে শুকিয়ে লেখার উপযোগী করা হত। ফলে

এর বর্ণ হত পাণ্ডু বা ধূসর এবং এতে সহজে পোকা লাগত না। এসব উপাদানের দুষ্প্রাপ্যতা এবং নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে এক সময় আবিষ্কৃত হয় তুলট কাগজ। শন, তুলা, তিসির তন্তু, ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদি দিয়ে তুলট কাগজ তৈরি হত। এগুলো আকারে বড় তৈরি করা হত। তা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী বড়-ছোট করা যেত। গ্রন্থের বিষয়বস্তু বড় হলে পত্রের আকার হত বড়, ছোট হলে ছোট। তুলট কাগজ তৈরি করার সময় মণ্ডের সঙ্গে চুন, নীল কিংবা হলুদের গুঁড়ো মেশানো হত। এসব মেশানোর ফলে কাগজ পোকায় কম কাটত। তবে চুন মেশালে কাগজের স্থায়িত্ব কমে যেত। নীল মেশালে কাগজের রঙ হত নীল এবং হলুদ মেশালে হত পাণ্ডু বা ধূসর বর্ণ। বাঁশের কঞ্চি পাখির পালক, শজারুর কাটা, নল জাতীয় ঘাসের ডগা ইত্যাদি দিয়ে কলম তৈরি করা হত। শিমুলের ছাল, লোধ্র, লাক্ষা, জবার কুঁড়ি, কাচা গাব, হরীতকী, আমলকী, জাটির রস, ডালিমের কস, কাঠ-কয়লার গুঁড়ো, ভুসা কালি, পোড়া চালের গুঁড়ো ইত্যাদি দিয়ে কালি তৈরি করা হত। কালির সঙ্গে অনেক সময় লোহার গুঁড়ো মেশানো হত। এতে কালির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেত। তবে এর একটা অসুবিধা ছিল যে, লোহায় মরচে পড়ে অল্পদিনেই কাগজ নষ্ট হয়ে যেত। অনেক সময় কোন কোন বৃক্ষ-লতার পাকা ফল বা বীজ থেকেও লাল রঙের এক ধরনের কালি তৈরি করা হত। পুথির পত্রগুলো মাঝখানে ছিদ্র করে সুতা দিয়ে বেঁধে উপরে-নীচে কাঠের তক্তা দিয়ে আটকে রাখা হত। এই কাঠের তক্তা এবং পুথির পত্রে অনেক সময় নানা ধরনের চিত্র অঙ্কিত হত। অখণ্ড বঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশে যে পুথিগুলো পাওয়া গেছে তার প্রায় সবই প্রাচীন বাংলা লিপিতে লিখিত। এগুলোর ভাষা সংস্কৃত ও বাংলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী সংগ্রহশালা, জাতীয় জাদুঘর, কুমিল্লা রামমালা গ্রন্থাগার, দিনাজপুর মহারাজা লাইব্রেরি, সিলেট ধীনবন্ধু লাইব্রেরি, রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামসহ দেশের অন্যান্য গ্রন্থাগার এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহে ন্যূনপক্ষে ষাট হাজার পুথি সংগৃহীত আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথি গাছের বাকলে লিখিত সারদাতিলক (১৪৩৯ খ্রি.)।

পুষ্পিকা

প্রাচীন পুথিতে লেখক বা লিপিকরের আত্মবিবরণীমূলক রচনাংশ 'পুষ্পিকা' নামে পরিচিত। এর অবস্থান সাধারণত পুথির প্রথম পত্রে, অধ্যায় বা অঙ্ক শেষে কিংবা একেবারে শেষ পত্রে। এখানে লেখক বা লিপিকরের পরিচয়সহ পুথির নাম, রচনাকাল/লিপিকাল, কার নির্দেশে এবং কার উদ্দেশ্যে পুথিটি রচিত/লিপিকৃত হল এসব তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে। প্রথম পত্র এবং অধ্যায় বা অঙ্কশেষের পুষ্পিকায় থাকে সাধারণত লেখকের নাম-পরিচয় এবং গ্রন্থের নাম। যথা : বিদ্যানিধিতনুজেন ন্যায়বাগীশধীমতা। গুণালঙ্কারদোষাখ্যা ক্রিয়তে কাব্যচন্দ্রিকা ॥ (ঢা, বি. ৩০২৩) [বিদ্যানিধির পুত্র ন্যায়বাগীশ গুণালঙ্কারদোষ নামক কাব্যচন্দ্রিকা রচনা করেছেন] শেষপত্রের পুষ্পিকায় থাকে লেখক, লিপিকর ও গ্রন্থের নাম এবং রচনা/লিপিকাল।

যথা : যুগ্মপৃথ্বীরসেন্দৌ চ শাকে সংগণিতে স্বয়ম্। লিলেখ জ্যোতিষাং তত্ত্বং গঙ্গেশঃ শ্রীযুতঃ সুধীঃ ॥ অলেখি চ আত্মপাঠায় শ্রীযুতগঙ্গেশশর্মণা ॥ এখানে প্রথম পংক্তিতে আছে রচনাকাল (যুগ্ম = ২, পৃথ্বী = ১, রস = ৬, ইন্দু = ১; ১৬১২ শকাব্দ), দ্বিতীয় পংক্তিতে গ্রন্থনাম—জ্যোতিষতত্ত্ব ও লেখকের নাম—গঙ্গেশ এবং তৃতীয় পংক্তিতে লিপিকরের নাম—গঙ্গেশ শর্মা। বাংলা পুথিতে 'ভণিতা' নামে একটি বিষয় আছে। তা পুষ্পিকারই নামান্তর। এখানেও অধ্যায় শেষে গ্রন্থনাম এবং লেখকের নাম পাওয়া যায়। যথা : মহাভারতের কথা অমৃতসমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

সংখ্যাবাচকশব্দ

সংখ্যা নির্দেশক শব্দ। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো শব্দ আছে যে-গুলো তাত্ত্বিকভাবে একেকটি সংখ্যা নির্দেশ করে। এগুলোকেই সংখ্যাবাচক শব্দ বলে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কাল নির্ণয়ে, ছন্দ-অলঙ্কারে যতি ও গণ নির্দেশে, জ্যোতিষে তিথি গণনায় সরাসরি সংখ্যা ব্যবহার না করে এই শব্দগুলির মাধ্যমে উদ্দিষ্ট গাণিতিক অর্থ বোঝানো হত। সংস্কৃত ও বাংলায় প্রাচীন পুথিতে কালাঙ্ক নির্ণয়ের দুটি উদাহরণ : হরিপদমধুধারাং বেদযুগ্মাব্ধিচন্দ্রে। মিলিতগণিতশাকে পূর্ণতাং যাতি পীত্বা ॥ (ঢা. বি. ২৩৬০) [বেদ = ৪, যুগ্ম = ২, অব্ধি (সমুদ্র) = ৭, চন্দ্র = ১; অতএব সনটি ১৭২৪ শকাব্দ বা ১৮০২ খ্রিস্টাব্দ] মুনি রস বেদ শশী শকে রহে সন। শেখ ফয়জুল্লাভনে ভাবি দেখ মন ॥ (ঢা. বি. ৪২) [মুনি = ৭, রস = ৬, বেদ = ৪, শশী = ১; অতএব সনটি ১৪৬৭ শকাব্দ বা ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ] ছন্দে যতি নির্দেশে : মন্দাক্রান্তাম্বুধিরসনগৈর্মো ভনৌ গৌ যযুগ্মম্। [মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রথমে চার (অম্বুধি/সমুদ্র = ৪), পরে ছয় (রস = ৬) এবং শেষে সাত (নগ/পর্বত = ৭) অক্ষরে যতি পড়ে]। এভাবে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করে শ্লোকাকারে কাল নির্ণয়ের পদ্ধতিকে হেঁয়ালিও বলা হয়।

লিপিকর

পুথি লিপিকারী এক শ্রেণীর পেশাজীবী মানুষ। প্রাচীনকালে যখন মুদ্রণযন্ত্র ছিল না তখন এরা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে হস্তলিখিত পুথি নকল করত। মূল পুথি কিংবা তার কোন অনুলিপি দেখে পুনরায় কপি করা হত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এদের পদবি হত 'শর্মা', অন্যান্য পদবিও ছিল। লিপিকরদের কেউ কেউ পুথির শেষে শ্লোকাকারে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিত; কেউ কেউ পুথির লিপিকালও লিখে রাখত। যেমন : (সংস্কৃত পুথি) ইতি রত্নাকরং পুস্তং রামলোচনশর্মণা। লিখিতং বহুযত্নেন বর্ণাশুদ্ধং ত্যজেদ্বুধঃ ॥ (কৌতুকরত্নাকর) (বাংলা পুথি) আবদুল্লার পুত্র আমি সবা হস্তে হীন। হাওলা গেরাম জান উদ্দেশিয়া চিন ॥ ... যেই মতো দেখি আমি সেই মতো লেখি। অপরাধ ক্ষেম মোর গুণিগণে দেখি ॥ বিংশ আষ্ট মঘী জান আর বারশত। তারিখ আষাড় জান বার দিন হৈল। সেইদিন এই পুস্তক লেখা হৈল ॥ (ঢা. বি. ৬২৪) পুথি যাতে কেউ চুরি না করে

সেজন্য কোন কোন লিপিকর শেষপত্রে অনেক কটূক্তি বা অভিশম্পাত বাক্য লিখে রাখত। যেমন : যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মানবঃ। মাতা চ শূকরী তস্য পিতা গর্দভঃ ॥ পুথি কিভাবে রক্ষা করতে হয় সে সম্পর্কেও শেষপত্রে নানা উপদেশবাক্য লেখা থাকত। যথা : (সংস্কৃত পুথি) যস্য হস্তগতং ভূয়াদেত্তস্মৈ নিবেদয়ে। প্রাণতুল্যমিদং রক্ষ্যং পণ্ডিতস্যৈব পুস্তকম্ ॥ (বাংলা পুথি) পুথিকে পুত্রের ন্যায় পালবে, শত্রুর ন্যায় বাঁধবে। সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষার পুথিই এই লিপিকরদের মাধ্যমে লিপিকৃত হয়ে শিক্ষার্থী এবং সাধারণ পাঠকের হাতে পৌঁছে যেত। মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই পেশার বিলুপ্তি ঘটে। তার আগে পর্যন্ত বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

শকাব্দ

বর্ষগণনার একটি পদ্ধতি। বঙ্গাব্দের ৫১৫ বছর পূর্বে ৭৮ খ্রিস্টাব্দে এর প্রচলন হয়। শকাব্দের প্রচলন নিয়ে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে শকরাজা শালিবাহনের মৃত্যুর দিন থেকে এই বর্ষগণনা শুরু হয়। আল-বিরুনির মতে রাজা বিক্রমাদিত্য জনৈক শকরাজাকে পরাজিত করে এই অব্দের প্রচলন করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কুষাণ রাজবংশ শকজাতীয় হিসেবে পরিচিত ছিল এবং এই বংশের রাজা কনিষ্ক শকাব্দের প্রচলন করেন। তাঁর প্রবর্তিত একটি অব্দ নেপাল ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রচলিত ছিল।

শকাব্দ চান্দ্র ও সৌর উভয় বর্ষরূপে গণিত হয়। পশ্চিম ভারতে চান্দ্রমাসে এবং দ্রাবিড় অঞ্চল ও পূর্ব ভারতে সৌরমাসে গণিত হয়। যেখানে চান্দ্রমাস সেখানে চৈত্রমাস থেকে বর্ষ শুরু হয়, আর সৌরমাস শুরু হয় মেষাদি থেকে। পশ্চিম ভারতের নর্মদা নদীর উত্তরে চান্দ্র বর্ষীয় শকাব্দ মাস পূর্ণিমায় শেষ হয় বলে তাকে বলা হয় 'পূর্ণিমান্ত', আর দক্ষিণে অমাবস্যায় শেষ হয় বলে বলা হয় 'অমান্ত'।

প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারতে এখনও শকাব্দের বিশেষ প্রচলন আছে এবং বঙ্গদেশে আধুনিক কাল পর্যন্ত এ অব্দের ব্যাপক প্রচলন ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত ও বাংলা পুথিতে শকাব্দে রচনাকাল ও লিপিকাল লেখা হতো। তা শক, শাক, শকাঙ্ক বা কবি শকাঙ্ক নামে পরিচিত। শকাব্দ থেকে ৫১৫ বিয়োগ করলে বঙ্গাব্দ এবং শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়।

গ. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. (শ্রী) অতুল সুর—বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৮৫।
২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য—বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬৯।
৩. আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ—বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩২০।
৪. (মোহাম্মদ) আবদুল কাইউম—পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠসমালোচনা, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, মে ১৯৮৬।
৫. (মৌলবী) আলী আহমদ—বাংলা কলমী পুথির বিবরণ, ১ম ভাগ, ত্রিপুরা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।
৬. আশুতোষ দেব—নূতন বাঙ্গালা অভিধান, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, জানুয়ারী ১৯৭৬।
৭. আহমদ শরীফ সম্পাদিত—পুথি পরিচিতি, ১ম মুদ্রণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।
৮. কল্পনা ভৌমিক : সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যভহার, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, : কীবন্দ্র মহাভারত, লিপিতাত্ত্বিক-ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে তুলনা, প্রথম প্রকাশ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯।
৯. (শ্রী) কৃষ্ণকবি, মন্দারমরন্দচম্পূঃ, সম্পা-পণ্ডিত কেদারনাথ ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পন্‌সীকার, নির্ণয় সাগর, ১৯২৪।
১০. কেশব মিশ্র—অলঙ্কার শেখর, সম্পা-অনন্তরাম শাস্ত্রী-বেতাল, বারানসী, ১৯২৭।
১১. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী—প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৮২।
১২. (শ্রী) জাহ্নবীচরণ ভৌমিক—সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৮২।
১৩. জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, কলিকাতা, চৈত্র ১৩২৩।
১৪. তারাপদ মুখোপাধ্যায়—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কলিকাতা, ১৯৭১।
১৫. (শ্রী) তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত—বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।
১৬. দেবেশ্বর—কবিকল্পলতা, সম্পা—পণ্ডিত রামগোপাল কবিরত্ন, কলিকাতা, ১৯০০।
১৭. (শ্রী) নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত বিশ্বকোষ, সপ্তদশ ভাগ, কলিকাতা, ১৩১৩।
১৮. (শ্রী) নীলকমল বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য—শুদ্ধি-দীপিকা, ২য় সংস্করণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।
১৯. নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রাথমিক জ্যোতিষতত্ত্ব, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩৪৩।
২০. (শ্রী) পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত—মহাভারত, কলিকাতা, ১৮৩০ শকাব্দ।

২১. (শ্রী) পঞ্চানন মণ্ডল—পুঁথি-পরিচয়, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৫৮।
২২. ফিস্তদর করোভকিন—পৃথিবীর ইতিহাস : প্রাচীন যুগ, মস্কো, ১৯৮৩।
২৩. (ডঃ) বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য—সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা, ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৭২।
২৪. (শ্রী) ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৭।
২৫. মাহবুবুল আলম—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ, ঢাকা, ১৯৭৬।
২৬. (শ্রী) যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয়, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭৮।
২৭. (ডঃ) যোগীরাজ বসু—বেদের পরিচয়, ২য় সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৯৮০।
২৮. রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর—সংস্কৃত বর্ণমালার ইতিহাস, ১ম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৭৮।
২৯. (ডঃ মুহম্মদ) শহীদুল্লাহ্—বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত, ৩য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৩।
৩০. (শ্রী) শিবরতন মিত্র সম্পাদিত—বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩২৬।
৩১. (শ্রী) সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৮।
৩২. (শ্রী) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, শ্রাবণ ১৩৭০।
৩৩. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ, ১ম ও ২য় খণ্ড, ১ম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৩৯।
৩৪. D.B. Diskalkar—Selection from Sanskrit Inscriptions, February, New Delhi, ১৯৭৭.
৩৫. R.D. Banerji—The Origin of the Bengali Script, First Edition, Calcutta, ১৯১৯.
৩৬. S.M. Katre—Introduction to Indian Textual Criticism, Second Edition, Poona. ১৯৫৪.

ঘ. গ্রন্থে ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিসমূহের সংখ্যানুক্রমিক তালিকা

(১) ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
পাণ্ডুলিপি সংখ্যা

এক

১৪
১৫৩
১৯২
১১৬৬
১২৩২
১৭৫৩
১৯৭৮
১৯৮৮
১২১৫৫

দুই

২৪
২৯
২১৫
২৩৭
২৯৫
২৯৯
২০৯৭
২১৯৫
২২০৬
২২০৯
২২২২
২২৩৩
২৩৬০
২৩৯৭
২৪৭০
২৫৯৮
২৮০৩
২৮৩১
২৮৮২
২৯৯১
২৯০০৮
২৯০৫৬
২৯০৭২
২৯০৭৫
২৯৫২৭
২৯৫৫২
২৯৫৫৪

তিন

৩৩
৩৫
৩২৩
৩২৫
৩২৭
৩৫৩
৩৫৯
৩৬৭
৩৯৪
৩৯৬
৩০০০
৩০০৯
৩১১৫
৩১১৬
৩২৭০
৩২৭১
৩২৭৩
৩২৭৪
৩২৭৫
৩২৭৬
৩৬৭০
৩৭৬৩
৩৯৪৬
৩৯৪৮
৩০০০২
৩০০২০
৩০০২৩
৩০০২৩ক
৩০০৩০
৩০০৩২
৩০০৩৬
৩০০৪৪
৩০০৮৫
৩০১৩০
৩০১৩৬

চার

৪৯৫
৪১৭৯
৪৪৩৫
৪৪৫০ ঈ
৪৫১৮
৪৫২৩
৪৬০৫
৪৬০৮
৪৬৬৭

পাঁচ

৫
৫৯ঈ
৫০০ ই
৫২৫ ঈ
৫৩১
৫০৮৩
৫৬৩৯
৫৬৭৫
৫৬৯৭
৫৭১৭
৫৭৩৬

৫৮২৩
৫৮৪২
৫৮৫৬
৫৮৮১
৫৮৮৬
৫৮৮৮
৫৯৯৩

ছয়

৬০
৬৩
৬৭
৬০১৮
৬০২১
৬০৫৩
৬১০২
৬১২৫
৬১৮২
৬৩৩২
৬৩৫২
৬৩৫৮
৬৩৬৪
৬৩৭৩
৬৪০৫
৬৪০৭
৬৪৩৩
৬৫৮৩
৬৬১২

সাত

৭০৯
৭৫২

আট

৮৫

নয়

৯৫ ঈ
৯২৫
৯২৫৫
৯২৫৬

(ii) রামমালা
পাণ্ডুলিপি সংখ্যা

এক

১৯৪
১৯৯
১০৬৭
১০৬৯
১০৭৬
১০৮০
১০৮২
১০৮৫
১০৮৭
১০৯৯
১১০৫
১১০৮
১১০৯
১১৬৫
১১৬৯
১২১৬
১২১৭
১৩৪১
১৭০০
১৭৪০

দুই

২০০
২০১
২০২
২০৩
২০৪
২০৫
২২১
২২৯
২৬০
২৮০
২০২৯
২৩৯৭
২৪৯২

তিন

৩০২
৩৯১
৩০৩২
৩২০৯
৩২১৭
৩২১৮
৩২৩১
৩২৩২
৩২৩৮
৩২৪১
৩২৪৭
৩৭১২
৩৭১৮
৩৭২২
৩০০৮৯
৩০১২২

চার

৪০৯০
৪৪৭০
৪৯৪৪
৪৯৪৫

পাঁচ

৫৭২৩
৫৭২৭
৫৭৩৫
৫৭৬৩
৫৮১০

ছয়

৬১৬৭
৬৭৩৯

সাত

৭০৯
৭২৪
৭৪৪
৭৬৯
৭৯৮

(iii) আব্দুল করিম
সাহিত্য-বিশারদ
সংখ্যা

এক

১১৭
১১৯
১৫২

দুই

২৩৪
৩৩৭
২৪৯
২৫২
২৬০
২৯২

তিন

৩৪০
৩৫৩
৩৬৭
৩৬৯
৩৮৭

চার

৫৩১
৫৫৪
৫৫৭

পাঁচ

৬৫
৬২৪

(iv) বাংলা
একাডেমী পাণ্ডুলিপি
সংখ্যা

এক

২৭৬

নির্ঘণ্ট

ঙ. গ্রন্থে উল্লিখিত লেখকদের বর্ণানুক্রমিক নাম

অ

অগস্ত্য ৭২
অঙ্গ ৭২
(শ্রী) অতুল সুর ৮০
অত্রি ৭২
অদিতি ৭২
অমরসিংহ ৭৫
অম্ভৃণিবাক্ ৭২, ৭৩
অলবেরুনী ৪৪

আ

আপালা ৭২
আলাওল ৫৮
আহমদ শরীফ ১১৪, ২৩৬

ই

ইন্দ্রাণী ৭২

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র ৯১

উ

উইলিয়ম জোন্‌স্ ৪০
উৎকীল ৭২

ঋ

ঋষভ ৭২
ঋষভদেব ৭৩

ও

ওল্ডেন্‌বার্গ ৪০

ক

কণ্ব ৭২
কবষ ৭২
কবিকর্ণপূর ৭৫
কর্ণানন্দ ৮৬
কাত্যায়ন ৮০
কালিদাস ৭৮, ২৩২
কাশীরাম দাস ৭৮
কুৎস ৭২
কৃত্তিবাস ৭৮
কৃষ্ণদাস ২২৫
(শ্রী) কৃষ্ণবিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য ৯০
(শ্রী) কৃষ্ণ শর্মা ৯৯

গ

গয় ৭২
গর্গ ৭২
গার্গী ৭২
গুণালঙ্কার ন্যায়বাগীশ ৯৯
গৃৎসমদ ৭২
গোতম ৭২

ঘ

ঘনশ্যাম ৯২
ঘোষা ৭২

চ

চণ্ডীদাস ৭২
চন্দ্রমাণিক্য ৭৮
চাণক্য ৭৮

জ

(শ্রী) জয়কৃষ্ণ ৯৯
জামদগ্ন্য ৭২
(শ্রী) জাহ্নবীচরণ ভৌমিক ৮০
জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ ৪০
জ্যাকোবি ৪০

ট

টেলর ৪০

ত

(শ্রী) তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ৮০, ১১২, ১১৩, ১১৪
(শ্রীমান) তার্কিক ৯৮
ত্রিত ৭২
ত্রিশিরা ৭২

দ

দক্ষিণা ৭২

(শ্রী) দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ৭৪
দীর্ঘতমা ৭২
দুর্গাশঙ্কর চক্রবর্তী ৯৩

ন

(শ্রী) নগেন্দ্রনাথ বসু ৪০, ৪২
নর ৭২
নরোত্তম দাস ৯৩
নাভাগ ৭২
নারদ ৭২
নেম ৭২
নৈষধ ৭২

প

পঞ্চানন মণ্ডল ৮০
পতঞ্জলি ৭৮
পাণিনি ৭৮
পিঙ্গল ৭৮
প্রগাথ ৭২
প্রজাপতি ৭২
প্রজাপতি শর্মা ৯০

ফ

ফার্গুসন ৪১

ব

বরাহমিহির ৯১
বসিষ্ঠ ৭২
বাক্‌ ৭২
বাণভট্ট ৮০
বামদেব ৭২
বালগঙ্গাধরতিলক ৯০
বিদ্যালঙ্কার ৮৬, ৯০
বিমদ ৭২
(ডঃ) বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য ৮০
বিশ্ববারা ৭২, ৭৩
বিশ্বামিত্র ৭২
বুহ্‌লার ৪০, ৪৫
বৃহদুক্‌থ ৭২
বেদব্যাস ৭০,৭৯
বেন ৭২
বেবর ৪০
বৈয়শ্ব ৭২

ভ

ভবদেব ৭৮
ভবভূতি ৭৮
ভবানন্দ ৯৯
ভরদ্বাজ ৭২
ভাণ্ডারকর ৭২

ম

মথুরানাথ তর্কবাগীশ ৯৯
মধুচ্ছন্দা ৭২
মনু ৭২
মহাদেব ৯০
মাঘ ৭৮
মাহবুবুল আলম ৩২৬
মীননাথ ৯০
মুকুন্দ ৯২
মেদিনী ৭৫, ৮৬
মেধা ৭২
মেধাতিথি ৭২
মৈত্রেয়ী ৭২

য

(শ্রী) যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১১৪, ১১৫
(ডঃ) যোগীরাজ বসু ৮০

র

(শ্রী) রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ৯০, ৯২
(শ্রী) রমেশচন্দ্র দত্ত ৭৩
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর ৭২, ৮০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৪
রাজকৃষ্ণ বিদ্যানিধি ৯১
রাজর্ষি ভরত ৯২
(শ্রী) রাধাই রায় ৯৪
(শ্রী) রাম গোবিন্দ ৯৩
রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ ৯৪
রাম দাস দ্বিজ ৯৩
(শ্রী) রামরাম বিপ্র ৯৪
রুদ্রনারায়ণ রায় ৯৩
রূপ গোস্বামী ৭৫, ৯৮
রোমশা ৭২

ল

(শ্রী) লক্ষ্মণ দীক্ষিত ৭৪
লক্ষেশ্বর ৯২
(ডঃ) লুডার্স ৭৩
লুষ ৭২
(শ্রী) লোচনানন্দ ৯২
লোপামুদ্রা ৭২
ল্যাংডন ৪০

শ

(শ্রী) শংকর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত ৩৯
শংযু ৭২
(শ্রী) শিবরতন মিত্র ১৩, ১১৪
শুনঃশেপ ৭২
শূলপাণি ৯৯
শেখ ফয়জুল্লা ৯৫
শ্যাবাশ্ব ৭২
শ্রীনিবাস ৯৯

স

সনাতন বিদ্যাবাগীশ ৯৯
সরমা ৭২
সর্পরাজ্ঞী ৭২
সাবিত্রী ৭২
সুহোত্র ৭২
সূর্যা ৭২
(ডঃ) স্টাইন ৭৩

হ

হরিহরাচার্য ৮৬
(ডঃ) হার্নলি ৭৪
হৃদয়ানন্দ শর্মা ৯১

চ. গ্রন্থে উল্লিখিত পাণ্ডুলিপির লিপিকরদের নাম

আ

আজিজুর রহমান ৯৫

ক

(শ্রী) কালিদাস ২৩২
(শ্রী) কালিনাথ শর্মা ৯১
(শ্রী) কৃষ্ণদাস ৯১

গ

(শ্রী) গঙ্গাচরণ শর্মা ৯৩
(শ্রী) গঙ্গাদাস শর্মা ৯১
(শ্রী) গঙ্গেশ শর্মা ৯১, ৯৩
(শ্রী) গুরু প্রসাদ দাস ৯১

চ

(শ্রী) চন্দ্রনাথ দেবশর্মা ৯১
(শ্রী) চন্দ্রনাথ শর্মা ৯২

দ

(শ্রী) দিননাথ ব্রহ্মচারি ৯৩

ব

(শ্রী) বিশ্বম্ভর শর্মা ৯১
বৃন্দাবন ৯২

ভ

(শ্রী) ভুবন চন্দ্র শর্মা ৯১

ম

(শ্রী) মধুসূদন দেবশর্মা ৯১
(শ্রী) মহানন্দ রায় ৯১, ৯৬
(শ্রী) মাধবিন্দু দত্ত ২৩৩
মিচকিন ফাজিল ২৩৩
মোহাম্মদ কাজীল ৯৫

র

(শ্রী) রাজকৃষ্ণ বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য ৮৬, ৯১
(শ্রী) রামগঙ্গা শর্মা ৯১
(শ্রী) রামচন্দ্র দাস ৯৪
(শ্রী) রামজয় দ্বিজ ৯৪
(শ্রী) রাম দাস ৯১
(শ্রী) রাম দাস দ্বিজ ৯৩
(শ্রী) রামদেব শর্মা ৯১, ৯৩
(শ্রী) রামধন ৯৬
(শ্রী) রামলোচন শর্মা ৯৪
(শ্রী) রাম সুন্দর ৯৩
(শ্রী) রোহিণী চন্দ্র শর্মা ৯৬

ল

(শ্রী) লক্ষণ দীক্ষিত ৭৪
(শ্রী) লক্ষীনারায়ণ গোস্বামী ৯৬

শ

(শ্রী) শিবকালি দাস ৯১
(শ্রী) শিবনাথ শর্মা ৯৩
(শ্রী) শিব সুন্দবী ৯৩

হ

(শ্রী) হরিনারায়ণ দত্ত ৯১
হামেদুল্লা ২২৯

ছ. গ্রন্থে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

অ

অঙ্কশাস্ত্র ৯১
অথর্বপ্রাতিশাখ্য ৪২
অথর্ববেদ ৪২
অনেকার্থকোষ ৭৫, ৮৬
অপদেশশতক ৮৫
অভিজ্ঞানশকুন্তল ৮৫
অভিষেকবিধি ৮৫
অমরকোষ ৭৮
অমরার্থচন্দ্রিকা ৮৫
অর্থশাস্ত্র ৪২
অষ্টাধ্যায়ী ৪২

আ

আমীর হামজা ৫৮
আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ৪২

ই

ইউসুফ-জোলেখা ৫৮

উ

উপনিষদ্ ৫৮

ঋ

ঋক্ প্রাতিশাখ্য ৪২
ঋগ্‌বেদ ৪২

ঐ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪২

ও

ওছিয়ৎ নামা ২২৯, ২৩২

ক

কপিদূত ১৩১
কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি ৯৩
কাদম্বরী ২২৭
কাব্যচন্দ্রিকা ৮৮
কারক নির্ণয় ৯৮
কারবালার যুদ্ধ ৫৮
কৃষ্ণকীর্ত্তন ২৯৪

গ

গণিতশাস্ত্র ৪২
গণোদ্দেশদীপিকা ৮৭
গাজীকালু-চম্পাবতী ৫৮
গীতা-মাহাত্ম্য ৪২
গুলে বকাউলি ৫৮

চ

চণ্ডীমঙ্গল ৪২
চৈতন্যচন্দ্রোদয় ৭৫
চৈতন্যচরিতামৃত ৮৫, ৯৪
চৈতন্যভাগবত ৮৬
চৈতন্যমঙ্গল ৯৪

ছ

ছন্দঃশাস্ত্র ৪১
ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪২

জ

জগন্নাথচরিত্র ৯৬
জঙ্গনামা ৫৮
জাতকনির্ণয় ৮৫
জাতকপ্রকরণ ৯১
জাতদীপপ্রকাশ ৯২
জ্যোতিরাকর ৮৭
জ্যোতিঃশাস্ত্র ৯০
জ্যোতিস্তত্ত্ব ৪৩, ৯০

ত

তন্ত্রসার ৬২
তিথিতত্ত্ব ৯১
তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৪১
তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ৪১
তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪২

দ

দানকেলিকৌমুদী ৭৫
দুর্গোৎসববিবেক ৭৫
দুল্লামজলিস ৮৮
দেবপ্রতিষ্ঠা-প্রয়োগতত্ত্ব ৯৯
দেবীমাহাত্ম্য ৮৫

ধ

ধর্মমঙ্গল ৮৫

ন

নটনন্দিনীরহস্য ৮৮, ৯৬
নারদসংবাদ ৮৮
নারদস্মৃতি ৪৫
নীতিশতক ৮৫
নৈমিত্তিক বিধি ৮৬

প

পঞ্চপক্ষিশকুন ৯০
পদাবলী ৮৫
পদ্মাবতী ৮৫
পল্লবদীপিকা ৯০
পুঁথি পরিচয় ৮০
পুথি পরিচিতি ৮০
প্রজ্ঞাপনাসূত্র ৩৮, ৭৪
প্রত্যক্ষমণিফক্কিকা ৭৫
প্রশ্নবিদ্যা ৮৭
প্রাকৃতকামধেনুকা ৮৮
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৮৮

ব

বাংলা পুথির তালিকা সমন্বয় ৫৮
বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর ৮০
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ৫৮
বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৮০
বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান ৭৪
বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য ৪৪
বারাহী তন্ত্র ৩৪
বিশ্বকোষ ৪৫
বিষ্ণুপুরাণ ৭৫
বৃক্ষরোপণাদি ব্যবস্থা ৮৭
বেণীসংহার ৮০
বেদের পরিচয় ৮০
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ৭৮

ভ

ভাগবত ৪৫
ভারতীয় লিপিতত্ত্ব ৪০

ম

মকুলহোচন ৯৫
মঙ্গল কাব্য ৭৪
মঠ প্রতিষ্ঠা ৮৫
মনসামঙ্গল ৭৫
মহাভারত ৫৮, ৬২, ৭৫, ৭৬
মহাভারত (কর্ণপর্ব) ৮৪
মহাভারত (বনপর্ব) ৭৫
মহাভারত (বিরাটপর্ব) ৮৫
মহাভারত (শান্তিপর্ব) ৪৩
মহাভারত (স্বর্গারোহণপর্ব) ৮৬
মহেঞ্জোদাড়ো ও সিন্ধুসভ্যতা ৩৭
মুক্তাচরিত ৮৬
মুগ্ধবোধ ৭৬
মেঘদূত ৮৬

য

যজুর্বেদ ৮৩
যজুঃসংহিতা ৪১
যাত্রানির্ণয় ৮৫
যোনিতন্ত্র ৮৬

র

রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা ১১০
রামায়ণ ৭৬

ল

লায়লী-মজনু ৫৮

শ

শনিচক্র ৮৬
শতপথব্রাহ্মণ
শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ৮৫
শুদ্ধিদীপিকা ৮৭
শ্রাদ্ধতত্ত্ব ৮৫

স

সংক্ষেপ কেরালী ৮৬
সংযুক্তাগম ৭৮
সংস্কৃত বর্ণমালার ইতিহাস ৪০
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ৮০
সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ৮০
সতীময়না-লোরচন্দ্রানী ৫৮, ৮৫
সত্যকলিবিবাদ ৮৫
সত্যপীরের পাঁচালী ৫৮
সন্দেহচ্ছেদন ৮৬
সমবায়াঙ্গ সূত্র ৪৭
সময়প্রদীপ ৮০
সয়ফুলমুলকবদিউজ্জামাল ৫৮
সল্প কেরালী ৮২

সামবিধান ব্রাহ্মণ ৮০
সামবেদ ৪৪
সারদাতিলক ৮০
সাবমঞ্জরী ৮২
সারসংগ্রহ ৮৬, ৮৭, ৯০
সোনাডাল ৫৮
স্কন্দপুরাণ ৮৫
স্তবমালা ৯১
স্বরদীপিকা ৯০
স্মৃতিতত্ত্ব ৮৬

হ

হংসদূত ৮৫
হরপার্বতীসংবাদ ৮৫
হর্ষচরিত ৮৫, ২২৭
হোরাষট্‌পঞ্চাশিকা ৮৬

অ

Indian Palacography ৪৫
New Catalogu
Catalogorum ৩২৬

জ. গ্রন্থে উল্লিখিত লিপির বর্ণানুক্রমিক তালিকা

অ

অগথোকলস্‌ মুদ্রালিপি ৪৫
অঙ্গলিপি ৩৪
অঙ্গুরীয় লিপি ৩৫
অধ্যাহারিণী লিপি ৩৪
অনুদ্রুত লিপি ৩৪
অনুলোম লিপি ৩৪
অন্তরীক্ষদেব লিপি ৩৪
অপরগৌড় লিপি ৩৪, ৩৯
অয়ৌরা লিপি ৩৪
অর্ধধনু লিপি ৩৪
অর্বাচীন মৌর্য লিপি ৪৪
অশোক লিপি ৩৪, ৩৯
অসুর লিপি ৩৪

আ

আসামী লিপি ৩৯

উ

উগ্রলিপি ৩৪
উৎক্ষেপ লিপি ৩৪
উৎক্ষেপাবর্ত লিপি ৩৪
উত্তর কুরুদ্বীপ লিপি ৩৪
উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় লিপি ৩৯, ৪৫
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লিপি ৪৫
উত্তব মধ্যাঞ্চলীয় লিপি ৪৫
উত্তরী লিপি ৪৪, ৪৬
উদয়গিরি লিপি ৪৬
উড়িয়া লিপি ৩৯

ঋ

ঋষিতপস্তপ্তা লিপি ৩৪

ও

ওঝা লিপি ৩৯

ক

কণাড়ী লিপি ৩৯
করওাতা লিপি ৪৬
করাট়ী লিপি ৩৯
কলিঙ্গ লিপি ৪৭
কায়থী লিপি ৩৯
কালসির শিলা লিপি ৪৫
কিন্নর লিপি ৩৪
কিনারি লিপি ৩৪
কুটিল লিপি ৩৪, ৩৯
কুড়ার লিপি ৪৬
কুষাণ লিপি ৩৪,৩৯

খ

খরোষ্ঠী লিপি ৩৪
খাস্য লিপি ৩৪

গ

গণনাবর্ত লিপি ৩৪
গন্ধর্ব লিপি ৩৪
গরুড় লিপি ৩৪
গুজরাটি লিপি ৩৯
গুণ্ডিকা লিপি ৩৪
গুপ্ত লিপি ৩৪, ৩৯
গুরুমুখী লিপি ৩৯
গুহা লিপি ৪৫
গ্রন্থম লিপি ৪৫
গ্রন্থি লিপি ৩৪
গ্রীক লিপি ৪০

ঘ

ঘুণাক্ষব লিপি ৩৪

চ

চক্র লিপি ৩৪
চিত্র লিপি ৩৫, ৩৬
চীন লিপি ৩৪

ত

তামিল লিপি ৩৯
তাম্র লিপি ৩৪
তিব্বত লিপি ৩৯
তুলু লিপি ৩৯

থ

থল লিপি ৩৯

দ

দক্ষিণ লিপি ৩৪
দক্ষিণী লিপি ৪৫
দরদ লিপি ৩৪
দশোত্তরপদসন্ধি লিপি ৩৪
দাক্ষিণাত্য লিপি ৩৪
দ্বিরুত্তরপদসন্ধি লিপি ৩৪
দেবনাগরী লিপি ৩৯
দেব লিপি ৩৪
দোগরী লিপি ৩৯
দ্রাবিড়ী লিপি ৩৪

ন

নন্দীনগরী লিপি ৪৬
নাগ লিপি ৩৪
নাগার্জুনী গুহা লিপি ৪৫

নানাঘাট লিপি ৪৫
নিক্ষেপ লিপি ৩৪
নিক্ষেপাবর্ত লিপি ৩৪
নিমারী লিপি ৩৯
নেপালী লিপি ৩৯

প

পভোস লিপি ৪৫
পরাচী লিপি ৩৯
পশ্চিমী লিপি ৪৬
পাদলিখিত লিপি ৩৪
পাহাড়ী লিপি ৩৯
পিপ্রাবার লিপি ৪৩
পুষ্করশারী লিপি ৩৪
পুষ্প লিপি ৩৪
পূর্ববিদেহ্ লিপি ৩৪
প্রক্ষেপ লিপি ৩৪
প্রস্তর লিপি ৩৪
প্রাচীন উত্তরী লিপি ৪৭
প্রাচীন মৌর্য লিপি ৪৭

ফ

ফিনিশীয় লিপি ৪৫

ব

বঙ্গ লিপি ৩৪
বজ্র লিপি ৩৪
বট্টেলত্তু লিপি ৪৬
বনিয়া লিপি ৩৯
বর্ণ লিপি ৩৫
বড়িয়া লিপি ৩৯
বহ্বলপুরী লিপি ৩৯
বায়ুরুদ্দম লিপি ৩৪
বিক্ষেপ লিপি ৩৪
বিদ্যানুলোমা লিপি ৩৪
বিমিশ্রিত লিপি ৩৪
বিলশদ লিপি ৪৬
বিশাতি লিপি ৩৯
বৈদিক লিপি ৩৪
ব্রহ্মাবলী লিপি ৩৫
ব্রাহ্মী লিপি ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৯

ভ

ভাব লিপি ৩৫
ভৌমদেব লিপি ৩৪

ম

মগধ লিপি ৩৪
মণিপুরী লিপি ৩৯
মথিয়া লিপি ৩৯,৪৫
মধ্যপ্রদেশী লিপি ৪৫
মধ্যাক্ষর বিস্তর লিপি ৩৪
মনুষ্য লিপি ৩৪
মহোরগ লিপি ৩৪
মাঙ্গল্য লিপি ৩৪
মারবাড়ী লিপি ৩৯
মারাঠী লিপি ৩৯
মালয়ালম লিপি ৩৯
মিহরোলী লিপি ৪৬
মিসরীয় লিপি ৩৭
মুদ্রা লিপি ৩৪
মুলতানী লিপি ৩৯
মৃগচক্র লিপি ৩৪
মৈথিলী লিপি ৩৯
মোড়ী লিপি ৩৯
মৌর্য লিপি ৩৪

য

যক্ষ লিপি ৩৪

র

রাধিয়া লিপি ৪৫
রামপুরবা লিপি ৪৫
রোচমানাধরণী প্রেক্ষণ লিপি ৩৪
রোরী লিপি ৩৯
রৌপ্য লিপি ৩৪

ল

লন্টলিয়ন মুদ্রা লিপি ৪৬
লাট লিপি ৪৭
লামাবাসী লিপি ৩৯
লুণ্ডী লিপি ৩৯
লেখনী-সম্ভবা লিপি ৩৪
লেখ-প্রতিলেখ লিপি ৩৪

শ

শক লিপি ৩৯
শব্দ লিপি ৩৯
শাস্ত্রাবার্তা লিপি ৩৪
শিকারপুরী লিপি ৩৯
শিকারী লিপি ৩৪
শিলা লিপি ৩৪
শিল্প লিপি ৩৪
শ্রাবকী লিপি ৩৯

স

সংখ্যা লিপি ৩৪
সইসী লিপি ৩৪, ৩৯
সর্বভূতরুত গ্রহণী লিপি ৩৪
সর্বরুত সংগ্রহণী লিপি ৩৪
সর্বসার সংগ্রহণী লিপি ৩৪
সর্বৌষধিনিষ্যন্দা লিপি ৩৪
সাগর লিপি ৩৪
সারনাথ অনুশাসন লিপি ৪৫
সারিকা লিপি ৩৯
সিংহলী লিপি ৩৯
সিন্ধী লিপি ৪৬
সিন্ধু লিপি ৪৬
সুমেরীয় লিপি ৩৭
সেমিটিক লিপি ৩৭
স্তম্ভ লিপি ৪৫
স্বর লিপি ৩৬
স্বর্ণ লিপি ৩৪

হ

হাতীগুম্ফা লিপি ৪৫
হূন লিপি ৩৪